[কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মানব জীবনের অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর তিনশরও অধিক প্রশ্নের সমাধান সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরে ইসলামী আক্বীদার এক অনন্য সংকলন]

কিতাবুল আক্বাঈদ

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক : মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
খতীব : হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিস : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।
সাবেক শাইখুল হাদীস : জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩

মারকাজুল উলূম প্রকাশনা বিভাগ

মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯১৭৯১৯৯৩৫, ০১৯৩৭৭২১৮৩৩
www.markajululom.com

কিতাবুল আক্বাঈদ

সংকলনে-

ইবনু আবেদীন

সহযোগিতায়ঃ

মুফতী মুহাঃ ইখতিয়ার হুসাইন,
মুফতী মুহাঃ রহমতুল্লাহ ও
মুফতী মুহাঃ সুলতান মাহমুদ

প্রচ্ছদঃ

ইয়াসীন আরাফাত
০১৭১৬৪২৬০৯৩

প্রকাশনায়ঃ

মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া ঢাকা
01917919935, 01937721833
http://jumuarkhutba.wordpress.com
www.markajululom.com
sultan_computer@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১১ ইং

মূল্য ঃ ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

Kitabul Aqaid
Shaikh Mufti Jashimuddin Rahmani
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka
Price : 250.00 Tk. US.$ 5.00

উপহার

❖ যারা সত্য গ্রহণে ও মিথ্যা বর্জনে আপোষহীন।

❖ যারা সত্য প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার মূলোৎপাটনের সংগ্রামে সদা তৎপর।

❖ যারা গভীর রজনীতে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মহান রবের দরবারে হিদায়েত এর জন্য আবেদনে মগ্ন।

❖ যারা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও পীরতন্ত্রের অন্ধ অনুসরনের বেড়াজালে আবদ্ধ।

❖ যারা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে বহু ইলাহ ও বহু রবের এবাদতে লিপ্ত।

❖ যারা নবীওয়ালা কাজের নামে জিহাদ বিমুখ দাওয়াতী কাজে জান-মাল ব্যায়ে ব্যাস্ত।

তাদের জন্য এই কিতাবটি একটি সামান্য উপহার।

প্রকাশকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وبعد:

মুসলিম জাতী আজ অনৈক্যের বেড়াজালে আবদ্ধ। দল-উপদল, ফেরকাবন্দী, মনগড়া তরিক্বা ইত্যাদি সহ নানাবিধ কারণে ইসলামের সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তারা। ইসলাম, মুসলিম, ইলাহ্, রব, ঈমান, ইহসান, কুফর, জুলম, নিফাক, ফিস্ক, রিদ্দাহ সহ যাবতীয় মৌলিক পরিভাষাগুলোর মনগড়া ব্যাখ্যা করছে তারা। শির্ক-বিদ'আতের সয়লাবে হারিয়ে গেছে ইসলামের তাহজীব-তামাদ্দুন ও সঠিক পরিচয়। কবর পূজা, মাজার পূজা, পীর পূজা ইত্যাদি আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতকেও হার মানিয়েছে। অপরদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে বহু ইলাহ্ ও বহু রবের এবাদতের রাস্তা খোলা হয়েছে। মন্ত্রী-এমপি ও শাসকদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, আইনদাতা-বিধানদাতা, আইন প্রণয়ন করা ও প্রয়োজনে আল্লাহর আইন বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরী করার ক্ষমতা দিয়ে তাদেরকে ফেরাউনের মত আল্লাহর আসনে বসিয়েছে। ইসলামের সঠিক শিক্ষার অবর্তমানে সৃষ্ট এই নারকীয় পরিস্থিতি হতে মুক্তি পেতে হলে সকল প্রকার তন্ত্র-মন্ত্র ত্যাগ করে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে কুরআন-সুন্নাহর দিকে।

মুসলিম জাতিকে কুরআন সুন্নাহের দিকে ফিরে আনার জন্যই আমাদের এই সিরিজ প্রকাশনা। ইতিপূর্বে "কিতাবুল ঈমান" ও "কিতাবুত তাওহীদ" নামে দুটি কিতাব আমরা প্রকাশ করেছি। যা পাঠক সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এটি আমাদের তৃতীয় প্রকাশনা যা "কিতাবুল আক্বাঈদ" নামে তিনশরও বেশী মুসলিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর সম্বলিত। শীঘ্রই বের হতে যাচ্ছে "দ্বীন ক্বায়েমের সঠিক পথ" ও আত্মশুদ্ধি মূলক কিতাব "কিতাবুত তাযকিয়া" সহ আরো কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ। আশা করি এ কিতাবগুলো মুসলিম জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সচেতন পাঠক মহলে "শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন রাহমানী" সাহেবের পরিচয় নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়না। আর যারা নতুন তারা এ কিতাব পড়লেই তার সম্পর্কে ধারণা পাবেন। শায়খের সীমাহীন ব্যাস্ততা আর ধারাবাহিক সফরের মধ্যে খুবই স্বল্পতম সময়ে এই কিতাব বের করায় এতে স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশীই বানান ও শব্দ বিভ্রাট থেকে যেতে পারে। তবে আক্বীদা ও কুরআন সুন্নাহর খেলাফ কোন বিষয় আশা করি এতে নেই। উক্ত কিতাবে কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা লেখকের নয়, বরং প্রকাশকের বলে গ্রহণ করার ও সে ব্যাপারে আমাদেরকে অবগত করার অনুরোধ রইলো। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন - আমীন।

- মারকাজুল উলূম প্রকাশনা বিভাগ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই সাহায্য কামনা করি। তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই। আমাদের নফ্‌সের সকল অনিষ্টতা এবং আমাদের সকল কর্মের ভুল-ভ্রান্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। আর যাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেন, কেউ তাকে হেদায়েত দান করতে পারে না। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লার বানীঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران/١٠٢]

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (আল-ইমরান ৩ঃ ১০২)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء/١]

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফ্‌স থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।" (আন-নিসা ৪ঃ১)

আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب/٧٠، ٧١]

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" (আল-আহযাব ৩৩ঃ ৭০ -৭১)

إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (سنن النسائي - (ج كتاب صلاة العيدين / ص كيف الخطبة رقم الحـــديث١٥٧٨ ابن ماجة ٤٥)

অতঃপর রাসূল (সঃ) এর বানীঃ "নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বানী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হচ্ছে নবীর (সঃ) পথ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হল দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়, প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হল জাহান্নাম"। *(সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ)*

যুগে যুগে নবী-রাসূলরা মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন- আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগুতকে বর্জন কর। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦]

"আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য।" *(সূরা, নাহল ১৬ঃ৩৬)*

তাদের মূল দাওয়াত ছিল তাওহীদের দাওয়াত, এবং এটিই সমস্ত মূলের মূল। বান্দার প্রতি সর্বপ্রথম ওয়াজিব এই তাওহীদকে মেনে নেয়া, আল্লাহ বান্দাদের যা নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে সর্ব প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই তাওহীদ। অথচ এই তাওহীদ বিষয়ে অন্ধকারে রয়েছে আজকের উম্মাহর অধিকাংশ মানুষেরা, যার জন্য আজকে পুরো দুনিয়া শিরক, কুফর, নিফাক, জাহিলিয়্যাতে ছেয়ে গেছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। তাদের প্রতি লাঞ্ছনার অন্যতম কারণ হচ্ছে সঠিক আক্বীদাহ থেকে পথভ্রষ্টতা। উম্মাহর এই অবস্থা দেখে বহুদিন যাবত মনের মধ্যে একটি সংকল্প ছিল এমন একটি সংকলন করার, যেখানে তাওহীদ-ঈমান- ইসলামের মূল প্রায় সকল বিষয়ের সমাধান থাকবে। এরই অংশ হিসেবে আমাদের এই সংকলন।

আমরা "কিতাবুল আক্বাঈদ" সংকলনে নবী-রাসূলরা যে আহ্বান নিয়ে এ যমীনে এসেছিলেন সে প্রকৃত আহ্বান তুলে ধরেছি সে সব সত্যের অনুসন্ধানীদের জন্য যারা সিরাত্বাল মুস্তাক্বিম বা সঠিক পথের অনুসরণে সফলতা এবং মুক্তি লাভ করতে চান, যারা আল্লাহ ছাড়া যত বাতিল ইলাহ (মা'বুদ) আছে

তাদের দাসত্বকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে চান। প্রশ্ন ও উত্তর আকারে এটি আমরা এমন এক চমৎকার ধারায় সংকলন করেছি যেন যে কেউ এটা অধ্যয়ন করলে তাওহীদ, ঈমান এবং ইসলাম সম্পর্কে সহজে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে পারে।

এটি সংকলনের সময় আমরা কোন ব্যক্তি বা দলের অন্ধ অনুসরণ করিনি কারণ একমাত্র আল্লাহর রাসূল ছাড়া এ সৃষ্টি জগতে কারো অন্ধ অনুসরণ বৈধ নয়। আমাদের একমাত্র মানদন্ড হচ্ছে কুরআন এবং সুন্নাহ। আমরা এ সংকলনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বিখ্যাত কিতাব গুলো থেকে কুরআন এবং সুন্নাহের আলোকে তাওহীদ-ঈমান এবং ইসলাম বিষয়ে প্রায় তিনশর অধিক প্রশ্নের সমাধান দিয়েছি, যা সমসাময়িক অনেক সমস্যার সমাধানে ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হবে। আল্লাহর কসম! এর সংকলনের পেছনে কোন স্বার্থপরতা জড়িত নেই শুধু একথা ছাড়াঃ

وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ [هود/٢٩]

“আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্র জিম্মায় রয়েছে।” (সূরা, হুদ ১১ঃ২৯)

এ সংকলনের পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য একটাই মানবতার কল্যান, যেন মানুষেরা অন্য সব কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফিরে আসে। হে আল্লাহর বান্দা আল্লাহ্ আপনাকে সত্য পথের দিশা দান করুন! এ সংকলনটি আপনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে পাঠ করুন, আমরা আশাবাদী আল্লাহ্ হয়তো আপনাকে এর মাধ্যমে হেদায়েত দান করবেন। কারণ আল্লাহতো আপনাকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টির অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, আপনি তো ভাল-মন্দ বুঝতে পারেন।

আল্লাহর কাছে শুধু এই কামনা করি তিনি যেন এই সংকলনটি শুধু তাঁর সন্তুষ্টির জন্য গ্রহণ করুন, তিনি এর দ্বারা উম্মাহকে বেনিফিট করুন, মানুষকে আলোর পথে নিয়ে আসুন। আরও কামনা করি তিনি যেন আমাকে ইসলামের উপর দৃঢ় রাখেন মৃত্যু পর্যন্ত, মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে মিলিত করে দিন। এর মধ্যে ভাল যা কিছু আছে আল্লাহর তরফ থেকে, মন্দ কিছু থাকলে তা একান্তই আমার দূর্বলতার জন্য। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যার নিয়ামতে সমস্ত ভাল কাজ সংঘঠিত হয়ে থাকে।

-ইবনু আবেদীন

সূচীপত্র

বি: দ্র:- বিস্তারিত সূচীর বিবরণ ৩৬৫ পৃ: থেকে ৩৭৭ পৃ: পর্যন্ত দেওয়া আছে।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও কর্তব্য

❖ প্রশ্ন-১। আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় কি বলেছিলেন?

উত্তরঃ- মানবজাতিকে (অর্থাৎ সর্বপ্রথম মানব আদম ও তাঁর স্ত্রীকে) এ দুনিয়ায় পাঠানোর সময় আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়াতায়ালা) বলেছিলেনঃ

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত হবে।" (সূরা, বাকারা ২ঃ ৩৮)

আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মানবজাতির নিকট পাঠাবেন হিদায়াত, আর যারা সে হিদায়াতের অনুসরন করবে তাদের কোন চিন্তা থাকবে না বরং তারা সফলকামদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

❖ প্রশ্ন- ২। আমাদের কি এমনি এমনি কোন উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে?

উত্তরঃ- আল্লাহ্ (সুবঃ) এমনি এমনিই কোন উদ্দেশ্য ছাড়া আমাদেরকে সৃষ্টি করেননি, বরং আমাদের সৃষ্টির পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেনঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

"তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?" (সূরা, মু'মিনুন ২৩ঃ১১৫)

❖ প্রশ্ন-৩। মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ- মানুষ সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুবঃ) তায়ালা বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থাৎ "আমি মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য"। *(যারিয়াত ৫১ঃ৫৬)*

আয়াতের لِيَعْبُدُونِ 'লি'য়াবুদু-ন' এর ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেন 'লিওয়াহ্হিদুন' অর্থাৎ আমার (আল্লাহর) একত্বকে মেনে নেয়ার জন্যই আমি তাদের সৃষ্টি করেছি। সুতরাং তাওহীদকে মেনে নিয়ে এককভাবে শুধু আলাহর ইবাদত করার জন্যই আল্লাহ (সুবঃ) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

❖ প্রশ্ন-৪ । মানুষের প্রতি আল্লাহর হক্ব কি?

উত্তরঃ- মানুষের প্রতি আল্লাহর হক্ব হচ্ছে কোন প্রকার শরীক না করে আল্লাহর ইবাদত করা । রাসূল (সল্লাল্লাহ্হ 'আলাইহি ওয়াস সালাম) বলেছেন-

أَنْ يُعْبَدَ اللّٰهُ وَلاَ يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ (صحيح مسلم)

"বান্দার প্রতি আল্লাহর হক্ হচ্ছে তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না ।" (মুসলিম, ইফাবা/৫০)

❖ প্রশ্ন-৫ । প্রত্যেক মানুষের উপর কোন চারটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা অবশ্য কর্তব্য তথা ফরজ?

উত্তরঃ- শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন, হে (পাঠক)! আল্লাহ্ তোমার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন! অবহিত হও যে, চারটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য (ফরজ)ঃ

- (এক) জ্ঞানঃ এমন জ্ঞান যার সাহায্যে দলীল প্রমাণ সহ আল্লাহ, তাঁর নাবী এবং দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করা যায় ।
- (দুই) ঐ জ্ঞানের বাস্তব রুপায়ণ ।
- (তিন) তার দিকে (মানুষকে) আহবান করা ।
- (চার) এই কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ । উপরোক্ত কথার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণীঃ

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"আবহমান কালের শপথ সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত । কিন্তু (শুধুমাত্র তারা ছাড়া) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজগুলি সম্পাদন করেছে, আর যারা পরস্পরকে সত্য-নিষ্ঠা ও ধৈর্য ধারণের (নিরন্তর) উপদেশ দিয়ে থাকে ।" (সূরা আল-আসর্) [সালাসাতুল উসুল ওয়া আদিল্লাতুহা]

❖ প্রশ্ন-৬ । কোন তিনটি মৌলনীতি সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের জানা ওয়াজিব?

উত্তরঃ- শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন, যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনটি মৌল নীতি কি যা প্রত্যেক মানূষেরই জানা অবশ্য কর্তব্য? তুমি উত্তর দেবে বিষয় তিনটি হলঃ

১) প্রত্যেক মানুষকে তার রব (প্রতিপালক) সম্পর্কে জানা, ২) তাঁর দ্বীন বা জীবন বিধান সম্পর্কে জানা, এবং ৩) তাঁর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে জানা ।[সালাসাতুল উসুল ওয়া আদিল্লাতুহা]

❖ প্রশ্ন-৭। বান্দার প্রতি সর্বপ্রথম ওয়াজিব কি?

উত্তরঃ- ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেনঃ "আদম সন্তানের ওপর আল্লাহ তাআ'লা সর্বপ্রথম যে ফরজটি চাপিয়ে দিয়েছেন তা হচ্ছে, ত্বাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।" এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে এ মর্মে রাসুল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিবার জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আর ত্বাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকো।" (নাহলঃ ৩৬)

❖ প্রশ্ন-৮। মানুষ মূলতঃ কয় ভাগে বিভক্ত? তাদের মাঝে শত্রুতার শুরু হয় কিভাবে?

উত্তরঃ- আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টি মু'মিন আর কাফির এই দু'টি ভাগে বিভক্ত। যেমন আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফের এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয় মু'মিন।" (সূরা তাগাবুন ৬৪ঃ ২)

মু'মিন ও কাফিরের এই পৃথকীকরণের মাধ্যমেই তাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا [النساء/١٠١]

"নিশ্চয়ই কাফেরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা নিসা ৪ঃ ১০১)

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

"আমি এভাবেই প্রত্যেক নাবীর শত্রু করেছিলাম অপরাধীদের মধ্য থেকে।" (সূরা ফুরকান ২৫ঃ ৩১)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ

"আমি অবশ্যই সামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম এই আদেশসহঃ 'তোমরা আলাহ্‌র ইবাদত কর'। কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো।" (সূরা নামল ২৭ঃ ৪৫)

ইসলাম

❖ প্রশ্ন-১ ।‘ ইসলাম’ কি?

উত্তরঃ- ইসলাম একটি আরবী শব্দ। ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, নিজেকে সঁপে দেয়া, আত্মসমর্পন করা। ইসলাম মানে আল্লাহর কাছে পরিপূর্ন আত্মসমর্পণ, নিজেকে সঁপে দেয়া এবং পরির্পূর্ন তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়া, সকল প্রকার শির্ক ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা। ইসলামিক পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দ্বীনের নাম, যা মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মাধ্যমে পরিপূর্নতা লাভ করেছে ।

ইসলাম অর্থ ইসতিসলাম, আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া, আত্মসমর্পন করা, আত্মসমর্পনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা, এবং রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর অনুসরন করা এবং শিরক থেকে পবিত্র হওয়া এবং শিরকের লোকদের থেকে মুক্ত হওয়া। (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ১/১২৯)

❖ প্রশ্ন-২। মুসলিম কে?

উত্তরঃ- আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা হাক্ ও পরিপূর্ন দ্বীন ইসলাম। আল্লাহর কাছে যে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেয়, আত্ম সমর্পণ করে, আনুগত্য করে, এককভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদত করে, সমস্ত শিরক থেকে মুক্ত হয়, শিরকের লোকদের থেকে মুক্ত হয়, এবং তার জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মেনে নেয় রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) অনুসরনে সেই মুসলিম।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, ‘সুতরাং ইসলাম মানে- একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পন করা, তিনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে নয়। শুধু তাঁরই ইবাদত করা, কাউকে তাঁর শরীক না করে। তাঁর প্রতি নিজেকে পূর্ন সঁপে দেয়া, তাঁর কাছেই আশা করা এবং তাঁকেই একমাত্র ভয় করা। তাঁকেই ভালবাসা, যথার্থ এবং পরিপূর্ন ভালবাসা, সৃষ্টির কাউকেই এমন ভাল না বাসা। সুতরাং যে অপছন্দ করে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে, তাহলে সে মুসলিম নয় এবং যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাহ করে বা তাঁর পাশাপাশি তাহলেও সে মুসলিম নয়।” (কিতাব আন নুবুওয়্যাত, ১২৭)

❖ প্রশ্ন-৩। ইসলাম অর্থ শান্তি কেন করা হয়ে থাকে?

উত্তরঃ- ইসলাম অর্থ শান্তি এ কথা কোন নির্ভরযোগ্য অভিধানে নেই। অনেক মুসলিমগন অজ্ঞতার ভিত্তিতে ইসলাম মানে শান্তি করে থাকে। আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে জিহাদ এবং বাতিলের সাথে ইসলামের অনিবার্য দ্বন্দ ও সংঘাতকে

এড়ানোর জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামের অর্থ শান্তি করে থাকে। অথচ 'হানসভে' নামে একজন খ্রিষ্টান তার বিখ্যাত আরবী-ইংরেজী অভিধানে ইসলামের অর্থ করেছে- Submission, resignation to the will of God. A Dictionary of Mordern Written Arabic এ ইসলাম মানে করা হয়েছে- আল্লাহর ইচ্ছার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা ও সমর্পণ করা।

তবে এটা সত্য ইসলাম পরিপূর্নভাবে মানলে অবশ্যই শান্তি আসবে।

❖ প্রশ্ন-৪। 'ইসলাম পরিপূর্ন দ্বীন' তার প্রমান কি?

উত্তরঃ- ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ন একটি দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা, তার প্রমান হচ্ছে আল্লাহর বানীঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ন করলাম। আমার নিয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্নতা দিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সূরা, মায়িদাহ ৫ঃ৩)

❖ প্রশ্ন-৫। 'ইসলামই একমাত্র গ্রহনযোগ্য দ্বীন, অন্য কোন দ্বীন গ্রহনযোগ্য নয়' তার প্রমান কি?

উত্তরঃ- ইসলাম আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য একমাত্র দ্বীন। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য নয়। এর প্রমান হল কুরআনে আল্লাহ সুবঃ বলেছেনঃ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হল ইসলাম।" (সূরা, আলে ইমরান ৩ঃ১৯)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায় তা কখনো গ্রহনযোগ্য হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (সূরা, আলে ইমরান ৩ঃ৮৫)

❖ প্রশ্ন-৬। ইসলামের ব্যাপারে আমাদের প্রতি নির্দেশ কি?

উত্তরঃ- ইসলামের ব্যাপারে আমাদের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে ইসলামকে নিজের পরিপূর্ন দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহন করা, পরিপূর্নভাবে ইসলামে দাখিল হওয়া, অনুসরন করা, মানা। ইসলামের কিছু মানা কিছু বর্জন করা চলবে না এবং আমরন ইসলামের উপর টিকে থাকা। এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً "হে ঈমানদারগন! পরিপূর্নভাবে ইসালামে দাখিল হও।" (সূরা বাক্বারাহ :২০৮)

وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ "আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"(সূরা আলে ইমরান :১০২)

❖ প্রশ্ন-৭। যে ব্যক্তি ইসলামের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ মানবে না তাদের ব্যাপারে কি বলা হয়েছে?

উত্তরঃ- যে ব্যক্তি ইসলামের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে সে কাফির, তার পরিনতি ভয়াবহ, দুনিয়াতে তার জন্য রয়েছে লাঞ্চনা এবং আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ সুবঃ বলেন-

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।" (সূরা, বাক্বারাহ ২ঃ৮৫)

❖ প্রশ্ন-৮। ইসলামের মূল উৎস কি?

উত্তরঃ- ইসলামের মূল উৎস দু'টি। কুরআন ও রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। এ ব্যাপারে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলেছিলেনঃ

تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض(جامع الأحاديث لجلال الدين السيوطي - (ج ١١ / ص ٢٥٢)

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। তোমরা যতক্ষন এগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব, আরেকটি হলো আমার সুন্নাহ।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

❖ প্রশ্ন-৯। ইসলামের ভিত্তি কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ- ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি।

১] এ বিষয়ে স্বাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

২] সলাত কায়েম করা। ৩] যাকাত আদায় করা। ৪] আল্লাহর ঘরে হজ্জ আদায় করা। ৫] রমাদানে সিয়াম পালন করা।

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان)

ইবনে উমার (রা) থেকে বর্নিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। এ বিষয়ে স্বাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইবাদত যোগ্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসুল। সলাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, (আল্লাহর) ঘরের হাজ্জ আদায় করা এবং রমাদানে সিয়াম পালন করা। (বুখারী ও মুসলিম)

❖ প্রশ্ন-১০। ইসলামের স্তর বা সোপান কয়টি?

উত্তরঃ- ইসলামের তিনটি স্তর বা সোপান রয়েছে, এগুলো হচ্ছে-

১. মুসলিম হওয়া, ২. ঈমান লাভ করা এবং ৩. ইহসান বা ঈমানের পূর্নতা লাভ করা।

❖ প্রশ্ন-১১। কতক্ষন পর্যন্ত একজন ব্যক্তি তার জান-মালের নিরাপত্তা পাবে না।

উত্তরঃ- আল্লাহ সুবঃ বলেন,

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة/٥]

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সলাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা. তাওবাহ ৯ঃ৫) তিনি আরও বলেন,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [التوبة/١١]

"অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্যে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি।" (সূরা, তাওবাহ ৯ঃ১১) রাসুল (সাঃ) বলেন,

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله

"আমি আদিষ্ট হয়েছি লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষন না তারা স্বাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রাসুল, সলাত প্রতিষ্ঠিত করে এবং যাকাত আদায় করে। যদি তারা এগুলো করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপত্তা পাবে ইসলামের বৈধ আইন ব্যতীত, এবং (এরূপ করলে) তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রথম খলিফা আবু বকর (রা) বনু হানিফা গেত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন যখন তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে, যদিও তারা শাহাদাহ উচ্চরন করত, সলাত পড়ত এবং ইসলামের অন্যান্য হুকুম মানত।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, কুফফারদেরকে হত্যা করার জন্য, তাদেরকে রেইড দেয়ার জন্য, তাঁদের জন্য প্রত্যেক ঘাটিতে ওঁৎ পেতে থাকার জন্য যতক্ষন না তারা শিরক থেকে তাওবাহ করে, সলাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে। সকল সালফে সালেহীনগন এবং সকল মাযহাব (এর ইমামগন এবং ফুকাহাদের) এই ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে । (ফাতওয়া আল আইম্মাহ আল নাজদিয়্যাহ ২/৪৭২)

সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে একজন ব্যক্তি ততক্ষন পর্যন্ত তার জান মালের নিরাপত্তা পাবে না যতক্ষন না সে শাহাদাহ উচ্চারন করবে এবং এর দাবী অনুযায়ী কাজ করবে (যেমন এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, সমস্ত শিরক থেকে মুক্ত থাকবে, সব বাতিল মা'বুদ তথা ত্বাগুতদের ও তার অনুসারী মুশরিকদের সাথে বারাআহ ঘোষনা করবে, তাদের সাথে শত্রুতা করবে, ঘৃনা করবে,তাদেরকে তাকফীর করবে ইত্যাদিসহ এই সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় মেনে নিবে ও সেই অনুযায়ী কাজ করবে), সলাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত আদায় করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة: ٤]

অর্থ:- ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের- তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। (সুরা মুমতাহিনা: ৪)

ঈমান

❖ প্রশ্ন-১। ঈমান কি?

উত্তরঃ- ঈমান শব্দের শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ, নাবী-রাসুলগন, আখিরাত, ফিরিশতাগন ইত্যাদি কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকে ঈমান বলে। ঈমান হচ্ছে তাছদীক বিল জিনান বা অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, ইক্বরার বিল লিসান বা মুখের স্বীকৃতি এবং আমাল বিল আরকান বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজ করা।

❖ প্রশ্ন-২। মুমিন কে?

উত্তরঃ- কুরআন ও সাহীহ সুন্নাহতে উল্লেখিত ছয়টি রুকন এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের প্রতি যে যথার্থ ঈমান আনে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে তাকে মু'মিন বলা হয়। প্রকৃত মু'মিনদের পরিচয়ে আল্লাহ (সুব) বলেনঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ [الحجرات/١٥]

"তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।" (সূরা, হুজরাত ৪৯ঃ১৫)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"মু'মিনতো তারাই, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ার দেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। সে সমস্ত লোক যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হল সত্যিকার মু'মিন! তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুযী।" (সূরা, আনফাল ৮ঃ২-৪)

❖ প্রশ্ন-৩। ঈমান কি বাড়ে কমে?

উত্তরঃ- হ্যা, ঈমানের কম বৃদ্ধি রয়েছে। আল্লাহর আনুগত্যের কিছু কথা ও কাজে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং অবাধ্যতার কথা ও কাজে ঈমান কমে যায়।

যেমন আল্লাহ সুবঃ বলেনঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

"প্রকৃত মু'মিন তারাই যখন তাদের নিকটে আল্লাহর নাম স্বরণীত হয় তখন তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। আর যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াত পঠিত হয় তখন তাদের ঈমান বর্ধিত হয়।" *(সূরা আল-আনফাল, ৮ঃ-২)*

لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ ব্যাভিচারী পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়না, চোর পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় চুরি করেনা, এবং মদ্যপায়ী পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় মদ পান করেনা (অর্থাৎ উক্ত সময়ে তাদের ঈমান অপূর্ণ ও দুর্বল হয়ে যায়)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

❖ প্রশ্ন-৪। ঈমানের আরাকান বা মৌলিক বিষয় কয়টি ও কি কি?
উত্তরঃ- ঈমানের আরাকান বা মৌলিক বিষয় ছয়টি।
১। আল্লাহর প্রতি ঈমান,
২। ফিরিশতাগনের প্রতি ঈমান,
৩। কিতাবের প্রতি ঈমান,
৪। রাসুলগনের প্রতি ঈমান,
৫। পরকালের প্রতি ঈমান,
৬। তাকদীর বা ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান।
এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

অর্থঃ বরং প্রকৃত পক্ষে সৎকাজ হল-যে ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফিরিশ্তাদের উপর, এবং সমস্ত নাবী রাসূলগণের উপর। (সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-১৭৭)

তিনি আরো বলেনঃ

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

অর্থঃ সবাই বিশ্বাস রাখে, আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্তাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, এবং তাঁর নাবীদের প্রতি, তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। (সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-১৮৫)

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

ما الإيمان ؟ قال (أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالعبث

অর্থঃ ঈমান হলঃ তুমি আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ ও শেষ দিবসের (আখিরাতের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। আরো বিশ্বাস রাখবে ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি। *(মুসলিম শরীফ)*

❖ প্রশ্ন-৫। ঈমানের কয়টি শাখা-প্রশাখা রয়েছে, ঈমানের সর্বোত্তম শাখা কি?

উত্তরঃ- ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে, এর সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ (صحيح مسلم)

"ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা আছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা। সর্বনিম্ন হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো।" (বুখারী ও মুসলিম)

❖ প্রশ্ন-৬। প্রকৃতপক্ষে কালিমা কয়টি, একে কি বলা হয়? আল্লাহ এই কালিমাকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

উত্তরঃ- আল্লাহ ঈমানের কালিমাকে উৎকৃষ্ট বৃক্ষের সাথে তুলনা করে বলেছেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ - تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"তুমি কি জাননা আল্লাহ কি ধরনের উদাহরণ পেশ করেছেন, কালিমা তাইয়্যেবা বা পবিত্র কালিমা একটি উৎকৃষ্ট গাছের ন্যায়, যার মূল খুবই দৃঢ় আর শাখা প্রশাখা উর্ধ্বাকাশের দিকে প্রসারিত। সে তার রবের নির্দেশে অহরহ ফলদান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহন করতে পারে।" (সূরা, ইবরাহীম ১৪ঃ২৪-২৫)

প্রকৃতপক্ষে ঈমানের কালিমা একটি। আর তা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া ইবাদত যোগ্য কোন ইলাহ নেই)। এক কালিমা তাইয়্যেবা বা কালিমাতুত তাওহীদ বলে। আল্লাহ এক উৎকৃষ্ট গাছের সাথে তুলনা করেছেন। এছাড়া কালিমায়ে তামজীদ, রাদ্দে কুফর এসবের অস্তিত্ব কুরআন হাদীসে কোথাও নেই।

❖ প্রশ্ন-৭। কে ঈমানের স্বাদ লাভ করে?

উত্তরঃ- প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি ঈমানের মজা ও স্বাদ লাভ করে। সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে এ স্বাদকে। তাদের ব্যাপারে রাসুল (সা:) বলেন,

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار

"যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে সে ঈমানের স্বাদ ও মজা পাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছুর চেয়ে প্রিয় হবে। সে কাউকে ভালবাসবে তো শুধু আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে। আল্লাহ তাকে কুফর থেকে মুক্তি দেয়ার পর সে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে এতটাই অপছন্দ করবে যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, "যে আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রাসুল হিসেবে স্বীকার করে ও মেনে সন্তুষ্ট সে ঈমানের স্বাদ ও মজা আস্বাদন করে।

❖ প্রশ্ন-৮। ঈমানের আলামত কি?

উত্তরঃ- একজন ঈমানদারকে যখন ভাল কাজ আনন্দ দেয় এবং মন্দ কাজ তার কাছে খারাপ মনে হয় তখন সে বুঝবে তার ঈমান আছে। উসামা (রা) বর্ননা করেন, এক ব্যক্তি এসে রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কি? ঈমানের আলামত কি? উত্তরে রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ (مسند أحمد)

'তোমার ভাল কাজ তোমাকে আনন্দ দিলে আর খারাপ কাজ তোমার কাছে খারাপ লাগলে তুমি মু'মিন।' (আহমাদ)

দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত দু'টি বিষয়ঃ ইছবাত ও নাফি

❖ প্রশ্ন-১। দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত দু'টি বিষয় কি কি?

উত্তরঃ- দ্বীনের ভিত্তি ও মূলনীতি হচ্ছে "একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং ত্বাগুতকে বর্জন করা।"

দ্বীনের ভিত্তি ও মূলনীতি ইছবাত (হ্যা বোধক) ও নাফি (না বোধক) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শাইখ আলী আল খুদাইর তাওহীদ প্রসংগে বলেন, ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব সাব্যস্তকরন দুটি জিনিসকে ওয়াজিব করে:

১। নাফি, সমস্ত ব্যক্তি এবং বস্তুর ইবাদাকে অস্বীকার করা (লা ইলাহা- কোন কিছুরই ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা নেই)

২। ইছবাত, আল্লাহর জন্য পরিপূর্নভাবে তা (ইবাদতকে) সাব্যস্ত করা (ইল্লা আল্লাহ- আল্লাহ ব্যতীত) ['আত্ তাওহীদ ওয়া তাতিম্মাত' গ্রন্থে]

ইমাম মুহাম্মদ বিন আঃ ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন, দ্বীনের মূলনীতি দু'টি বিষয়ঃ

প্রথমত ঃ ক] একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দেয়া যার কোন অংশীদার নেই। খ] এ বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত করা। গ} এ নীতির ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা। ঘ] এটির বর্জনকারীকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা।

দ্বিতীয়ত ঃ ক] শিরককে পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহর ইবাদতে শিরকের বিষয়ে ভয় প্রদর্শন করা। খ] এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা। গ] এ নীতির ভিত্তিতে বৈরীতা স্থাপন করা। ঘ] যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা। (আদ দুরার আসসানিয়্যাহ ২/২২)

[

❖ প্রশ্ন-২। দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো দালীল প্রমানসহ আলোচনা করুন?

উত্তরঃ- মূলনীতি ও ভিত্তির অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো দ্বীনের ভিত্তি ও মূলনীতি ইছবাত (হ্যা বোধক) ও নাফি (না বোধক) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম মূলনীতিগুলো হচ্ছে হ্যা বাচক এবং দ্বিতীয় মূলনীতিগুলো না বোধক। হ্যা বাচক এবং না বাচক দু'টি বিষয়ের প্রত্যেকটির রয়েছে চারটি করে প্রয়োজনীয় দিক। গুরুত্ব ও জরুরতের দিক থেকে প্রথমটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন, অত:পর দ্বিতীয়টি, অত:পর তৃতীয়টি অত:পর চতুর্থটি গুরুত্বপূর্ন।

ইমাম আব্দুর রহমান ইবন হাসান আল শাইখ রহ. বলেন, "এই মূলনীতি ও ভিত্তি সমূহের দালীল কুরআনে এতই বেশী যে তার সংখ্যা নিরূপন করা যাবে না।" (আদ দুরার আসসানিয়্যাহ ২/২০৩)

ইছবাত বা হ্যা বাচক মূলনীতিঃ এর রয়েছে ৪ টি প্রয়েজিনীয় দিক, প্রথম দু'টি স্বয়ং তাওহীদের বিষয়ে আর শেষ দু'টি তাওহীদের লোকদের বিষয়ে ।

ক] একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দেয়া যার কোন অংশীদার নেই

আল্লাহ সুবঃ নির্দেশ দিয়েছেন,

قُلْ يٰأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلَمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ ٱللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"বলুন: 'হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না ।' তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক আমরা তো মুসলিম ।" (সূরা, আলে ইমরান ৩ঃ৬৪)

তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না ।" (সূরা, বানী ইসরাঈল ১৭ঃ২৩)

এবং " আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই । তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না । এটাই সরল পথ । কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না ।" (সূরা, ইউসুফ ১২ঃ৪০)

প্রয়োজনীয় এ প্রথম বিষয়টি হ্যা-বাচক মূলনীতির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ।

খ] এ বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত করা ।

আল্লাহ সুবঃ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً

"তার চাইতে উত্তম দ্বীন কার? যে আল্লাহ্‌র নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করে,যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন ।" (সূরা নিসা: ১২৫)

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ

يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٢) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [القصص/٧١-٧٣]

" তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। ইহকাল ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে, তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে ? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না ? তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা, কাসাস ২৮ঃ ৭০-৭৩)

রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সীরাত থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট যে তিনি কুরবানীর স্থানে, বাজারে, লোকসমাগমে যেতেন এবং লোকদেরকে তাওহীদকে আকড়ে ধরতে আহ্বান জানাতেন, লোকদেরকে এই জন্য উৎসাহিত করতেন এই বলে, 'ইয়া আইয়্যুহান নাসু কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তুফলিহুন। অর্থাৎ 'হে লোকসকল বল, আল্লাহ ছাড়া কোন ইবাদতযোগ্য ইলাহ নেই, তোমরা সফলকাম হবে।' (ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে বর্ননা করেন)।

প্রয়োজনীয় এ বিষয়টি হ্যা বাচক মূলনীতির প্রথম বিষয়টির পরেই এর সরাসরি গুরুত্ব।

গ) এ নীতির ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা। এই বিষয়টি সুস্পষ্ট আল্লাহর কথা থেকে। আল্লাহ বলেন, وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ "আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের আউলিয়া।" (সূরা, তাওবাহ ৯ঃ৭১) তিনি আরও বলেন,

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমুহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার। (সূরা, আলে ইমরান ৩ঃ১০৩)

রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

মুমিনদের একে অপরের উদাহরন যেন একটি বিল্ডিং এর মত, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। (বুখারী) রাসুল (সাঃ) আরও বলেন,

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (صحيح البخاري)

তোমাদের কেউ ততক্ষন ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষন সে অপরের জন্য তাই ভাল না বসে যা সে তার নিজের জন্য ভালবাসে। (বুখারী এবং মুসলিম)

হ্যা বাচক মূলনীতির তৃতীয় এ বিষয়টির গুরত্ব সরাসরি দ্বিতীয় মূলনীতির পরে।

ঘ] এটির বর্জনকারীকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নির্দেশ দেন-

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ- لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

“বলুন, হে কাফেরগন! আমি ইবাদত করিনা, তোমরা যার ইবাদত কর।” (সূরা কাফিরুনঃ ১-২) তিনি আরও বলেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

"ইব্‌রাহীম ও যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের জাতিকে বলল, তোমাদের ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। আমরা তোমাদেরকে মানি না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শক্রতা ও ঘৃণা বোধের সূচনা হল যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর।" (মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)

ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে হাসান (রহ) বলেন, একজন ব্যক্তি কখনই মুওয়াহহিদ হতে পারবে না, শিরককে পুরোপুরি বর্জন করা ব্যতীত, এটা থেকে পুরোপুরি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং যে এটা করে তাকে কাফের ঘোষনা না করা পর্যন্ত। (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ২/২০৪)

তিনি আরো বলেন, একজনের তাওহীদ পূর্ন হবে না যতক্ষন না মুশরিকদের থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে না নেবে, তাদের সাথে শক্রতা না করবে এবং তাদেরকে কাফের বলে ঘোষনা না দিবে। (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ১১/৪৩৪) হ্যা বাচক এই চতুর্থ দিকটির গুরুত্ব সরাসরি তৃতীয়টির পরে।

২) না বোধক মূলনীতিঃ এর চারটি প্রয়োজনীয় দিক রয়েছে। প্রথম দু'টি শিরকের ব্যাপারে এবং শেষ দু'টি শিরকের লোকদের ব্যাপারে।

ক] শিরককে পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহর ইবাদতে শিরকের বিষয়ে ভয় প্রদর্শন করা। আল্লাহ সুবঃ তাঁর নাবী (সাঃ) কে নির্দেশ দিয়েছেন,

قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ إِلَيْهِ أَدْعُوا۟ وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ

"বলুন, আমাকে এরূপ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি। এবং তাঁর সাথে অংশীদার না করি। আমি তাঁর দিকেই দাওয়াত দেই এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন।" (সূরা, রাদ ১৩ঃ৩৬)

আরও বলেছেন,

إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ- أَن لَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ

"নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারো ইবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি।" (সূরা, হুদ ১১ঃ২৫-২৬)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রাসুল সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি?" রাসুল (সঃ) বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা, অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" *(সহীহ বুখারী, মুসলিম)* না বাচক দিকের প্রথম এই বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন।

খ] এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন,

فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

"মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক।" (সূরা, তাওবাহ ৯ঃ৫)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা (শিরক) অবশিষ্ট থাকে; এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (সূরা, আনফান ৮ঃ৩৯)

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله

রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে যতক্ষন না তারা স্বাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (বুখারী) আল্লাহ ঈমানদারদের নির্দেশ দিয়েছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: ١٢٣]

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক্ আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা, তাওবাহ ৯ঃ১২৩)

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, কুফফারদেরকে হত্যা করার জন্য, তাদেরকে রেইড দেয়ার জন্য, তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাটিতে ওঁৎ পেতে থাকার জন্য যতক্ষন না তারা শিরক থেকে তাওবাহ করে, সলাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে। সকল সালফে সালেহীন গন এবং সকল মাযহাব (এর ইমামগন এবং ফুকাহদের) এই ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে । (ফাতওয়া আল আইম্মাহ আল নাজদিয়্যাহ ২/৪৭২)

এবং ইমাম (রহ) আরও বলেন, 'ত্বাগুতকে বর্জন করা'র অর্থ ও দাবী হচ্ছে আপনি নিজেকে সেসব কাফেরদের থেকে মুক্ত করবেন যারা আল্লাহকে বাদ

দিয়ে জ্বিন, গাছ, পাথর এবং অন্য যেকোন কিছুর ইবাদত করে এবং আপনি তাদেরকে কাফের বলে ঘোষনা দিবেন, তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে ঘোষনা দিবেন, তাদেরকে ঘৃনা করবেন, এমনকি যদিও তারা আপনার বাবা বা ভাই হয় তবুও। (আদ দুরার আস সনিয়্যাহ ২/১১১-১১২)

না-বাচক মূলনীতির এই দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় দিকটির গুরুত্ব প্রথম বিষয়ের পরে।

গ] এ নীতির ভিত্তিতে বৈরীতা স্থাপন করা। ইবরাহীম (আ) বলেন,

قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَا كُنْتُم تَعْبُدُونَ - أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ - فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلا رَبَّ الْعَالَمِينَ

"ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা ? বিশ্বপালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু।" (সূরা, শুয়ারা ২৬ঃ৭৫-৭৭)

ইবরাহীম (আ) আরও বলেছিলেন,

{وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا} [مريم: ٤٨]

"আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর তাদেরকে।" (সূরা, মারইয়াম ১৯ঃ৪৮)

আল্লাহ আমাদের হুকুম করেছেন,

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا

তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না। (সূরা, আন নিসা ৪ঃ৮৯)

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ "যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ্ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন।" (সূরা, তাওবাহ ৯ঃ১৪)

শাইখ আলী আল খুদাইর বলেন, শত্রুতার ধরনগুলো হচ্ছে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে ঘোষনা দেয়া, তাদেরকে পরিত্যাগ করা, অভিশাপ দেয়া, উপহাস করা, হত্যা করা, বন্দী করা, বহিষ্কার করা ইত্যাদি।

শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহ) বলেন, আপনাদের যাদেরকে আল্লাহ ইসলাম দ্বারা রহমত করেছেন, যারা বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদতের যোগ্যতা নেই, এটা ভেবো না যে যদি তুমি বল, 'এই তাওহীদ সত্য এবং আমি শিরককে পরিত্যাগ করেছি, কিন্তু আমি মুশরিকিনদের বিরোধিতা

করি না, তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলি না" তাহলে তুমি ইসলামের মধ্যে থাকবে। বরং তুমি বাধ্য তাদেরকে ঘৃনা করতে, তাদেরকে যারা পছন্দ করে তাদেরকেও ঘৃনা করতে, তাদেরকে উপহাস করতে এবং তাদের সাথে শত্রুতা রাখতে, যেমন তোমার পিতা ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর সাথীরা বলেছিলেন,

"তোমাদের ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। আমরা তোমাদেরকে মানি না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা বোধের সূচনা হল যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর।" (মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪) (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ২/১০৯)

তৃতীয় এই বিষয়টির গুরুত্ব দ্বিতীয় বিষয়টির পরে।

ঘ] যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা।

আল্লাহ নির্দেশ করেছেন তাকফীরের, قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ "বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।" (সূরা, যুমার ৩৯ঃ৮)

{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ} [آل عمران: ١٢]

"কাফেরদিগকে বলে দিন, খুব শিগগীরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে-সেটা কতই না নিকৃষ্টতম অবস্থান।"(সূরা আলি ইমরান: ১২)

ইবরাহীম (আ) তাঁর জাতির লোকদের তাকফীর করেছিলেন,

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}

" ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের- তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। তবে স্বীয় পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তিটি ব্যতিক্রম: 'আমি অবশ্যই তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না।' হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার

ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে।" (মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪) (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ২/১০৯)

রাসুল (সা:) কে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন, বলুন, হে কাফেরকূল, আমি ইবাদত করিনা, তোমরা যার ইবাদত কর। এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা কর। তোমরা ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে। (সূরা কাফিরুন)

ইমাম আব্দুর রহমান বিন হাসান (রহ) বলেছেন, আল্লাহ অগনিত আয়াতে শিরকের লোকদের 'কাফির' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং কাফেরদের তাকফীর করা ওয়াজিব, যেহেতু কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর এটি একটি অন্যতম দিক। (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ২/২০৫)

ইমাম সুলাইমান ইবন আব্দিল্লাহ আন নাজদী (রহ) যে ব্যক্তি সেই মুশরিকিনদের তাকফীর করতে অস্বীকার করে যারা কালিমা উচ্চারন করে তাদের ব্যাপারে বলেন, যে বলে 'তারা কাফের নয় বরং অন্য কিছু', তাহলে এটা তার থেকে বর্নিত হল যে সে মুসলিম, কারণ কুফরী এবং ইসলামের মধ্যবর্তী কিছু নেই। সুতরাং যদি তারা কাফের না হয় তবে তারা মুসলিম, আর যে ব্যক্তি কুফর কে ইসলাম বলে অথবা কাফের কে মুসলিম বলে সে কাফের হয়ে যায়। (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ৮/১৬১)

এবং না বোধক মূলনীতির এই চতুর্থ বিষয়টির গুরুত্ব তৃতীয় বিষয়টির পরে। সুতরাং এই ইছবাত (ইতিবাচক) এবং নাফি (নেতিবাচক) বিষয়গুলোকে একত্রে দ্বীনের ভিত্তি এবং মূলনীতি বলা হয়, যাকে মিল্লাতে ইবরাহীম ও বলা হয়।

❖ প্রশ্ন-৩। দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্গত এই বিষয়গুলো কিভাবে জানা গেল?

উত্তরঃ এই মূলনীতি গুলো জানা গিয়েছে নাবী রাসুলদের দাওয়ার মাধ্যম, এবং তাদের সবার এই একই দাওয়াত ছিল। আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦]

"আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য।" *(সূরা, নাহল ১৬ঃ৩৬)*

সুতরাং সমস্ত নাবী এবং রাসুলরাই তাদের জাতিকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন, "আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর"। আল্লাহ আরও বলেছেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة/٢٥٦]

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়"। (আল-বাক্বারাহ ২ঃ ২৫৬)

উপরোক্ত আয়াতে নেতিবাচক দিক হচ্ছে- فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِএর মধ্যে রয়েছে "কারোরই ইবাদতের যোগ্যতা নেই"

ইতিবাচক দিক হচ্ছে, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ এর মধ্যে রয়েছে "একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত"। আর এটাই মূলতঃ তাওহীদের কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা বোঝায়। সুতরাং প্রত্যেক নাবী এবং রাসুল নাফি (কারোরই ইবাদত যোগ্যতা নেই) এবং ইছবাত (একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত) নিয়ে আগমন করেছেন। এবং এটিই হচ্ছে তাওহীদের কালিমা, যা হচ্ছে এই কথার সমান- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগুতকে বর্জন কর। এবং এটিই হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি। এবং এটাই ছিল নাবী মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) অন্যতম লক্ষ্য, যার ব্যাপারে তিনি বলেন,

عن ابي هريرة ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

"আমি আদিষ্ট হয়েছি লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষন না তারা স্বাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রাসুল, সলাত প্রতিষ্ঠিত করে এবং যাকাত আদায় করে। যদি তারা এগুলো করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপত্তা পাবে ইসরামের বৈধ আইন ব্যতীত, এবং (এরূপ করলে) তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট। (বুখারী ও মুসলিম)

তাওহীদ

❖ প্রশ্ন-১। তাওহীদ কি?

উত্তরঃ- তাওহীদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ একীকরণ (কোন কিছু এক করা) অথবা দৃঢ়ভাবে এককত্ব ঘোষণা করা এবং এটার উৎপত্তি আরবী 'ওয়াহহাদা' শব্দ হতে যার অর্থ এক করা, ঐক্যবদ্ধ করা অথবা সংহত হওয়া।

কিন্তু যখন তাওহীদ শব্দটি আল্লাহর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন আল্লাহ সম্পর্কিত মানুষের সকল পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কর্মকান্ডে আল্লাহর এককত্ব উপলব্ধি করা ও তা নিরবচ্ছিন্নভাবে অক্ষুন্ন রাখা বুঝায়। সালফে সালেহীনগন তাওহীদকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন-

- তাওহীদ হল- কায়মনোবাক্যে এ সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষন করা যে, সকল বিষয়েই আল্লাহ এক ও একক, অদ্বিতীয়, নিরুপম, সমকক্ষহীন, তুলনাহীন। তিনি ব্যক্তিসত্ত্বা, কর্মরাজি, সুন্দর নামসমূহ ও গুনাবলী এবং ইবাদতের সার্বভৌম অধিকারে সম্পূর্ন এক ও একক। তেমনিভাবে তিনি একত্বের অধিকারী সৃষ্টিকর্মে ও নির্দেশদানে। (শরহুল আক্বিদাহ আত্ তাহাবিয়্যাহ)
- তাওহীদ হচ্ছে- আল্লাহর লেশমাত্র দোষহীন পরিপূর্ন গুনরাজিতে আল্লাহর একত্বের হৃদয়গত ইলম ও বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। (কিতাবুত তাওহীদ, মুঃ বিন আঃ ওয়াহহাব)
- তাওহীদ হচ্ছে- একমাত্র সত্য মা'বুদের জন্যে একমাত্র সত্য দ্বীন ও ঈমানের পথে একাভিমুখী বান্দাহ হয়ে যাওয়া। (মাজমুওত তাওহীদ, ইবনিল কায়্যিম রহঃ)

❖ প্রশ্ন-২। তাওহীদ শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে?

উত্তরঃ- প্রকৃতপক্ষে তৌহিদ শব্দটি কোরআনে অথবা রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীর (হাদীস) কোথাও সরাসরি উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও, নবম হিজরী সনে রাসূল (সঃ) যখন মুআয ইবনে যাবাল রা. কে ইয়েমেনে গভর্ণর করে পাঠালেন তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি খৃষ্টান ও ইহুদী (আহল আল কিতাব)দের কাছে যাবে, কাজেই তুমি প্রথমেই তাদের কাছে আল্লাহ এর এককত্ব দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করবে (ইউওয়াহহিদু আল্লাহ) (ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্নিত এবং আল বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত)

এই হাদীসে নবী (সঃ) যে ক্রিয়ার বর্তমান কাল রূপ ব্যবহার করেছেন, সেই ক্রিয়ার বিশেষ্য হতে তাওহীদ শব্দটির উৎপত্তি।

❖ প্রশ্ন-৩। কালিমাতুত তাওহীদ তথা' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর গুরুত্ব ও মর্যাদা কি?

উত্তরঃ- لا اله الا الله এর গুরুত্ব যে কত অপরিসীম, এর মর্যাদা যে কত উচ্চ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা এ কালেমার গুরুত্ব এবং মর্যাদা তুলে ধরছি।

☞ لا اله الا الله এটি ইসলামের মূল কালেমা। এর স্বাক্ষ্য দানই ইসলামে প্রবেশের একমাত্র রাস্তা। এ হচ্ছে এমন এক কালেমা যা মানুষের ঈমান এবং কুফরীর মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

☞ নাবী-রাসুলদের মূল দাওয়াতই ছিল لا اله الا الله এর দিকে আহ্বান করা, যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা মানব জাতির হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

☞ কালেমা لا اله الا الله ইসলামের মূল ভিত্তি। ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে শাহাদাতাইন বা দুটি বিষয়ে স্বাক্ষ্য দেয়া। প্রথম যে বিষয়ে স্বাক্ষ্য দিতে হয় তা হচ্ছে لا اله الا الله ।

☞ কালেমা لا اله الا الله হচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা।

☞ কালেমা لا اله الا الله কে মেনে নেয়া এবং সে অনুযায়ী কাজ করা, বান্দার প্রতি আল্লাহর হাক্ব।

☞ এ কালেমার দাবী অনুযায়ী কাজ করার জন্য আল্লহতায়ালা মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ কালেমার স্বীকৃতির মাধ্যমে বান্দাহ্ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্বকে মেনে নেয়।

☞ لا اله الا الله এমন এক মহান কালেমা যার স্বাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহতায়ালা, ফেরেশতা এবং যারা জ্ঞানবান তারা দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা বলেছেনঃ "আল্লাহ্ স্বাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন হক্ ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানবান লোকেরা সততা ও ইনসাফের সাথে এ স্বাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহা পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞানী ছাড়া কেহই ইলাহ হতে পারে না।" *(আল ইমরানঃ ১৮)*

☞ لا اله الا الله এমন এক কালেমা যে, আসমান-যমীন এবং এবং এর মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা যদি এক পাল্লায় তোলা হয় আর لا اله الا الله কে

অপর পাল্লায় তোলা হয় তবে لا اله الا الله এ পাল্লাই ভারী হবে। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– আল্লাহ নাযিল করলেন, "হে মুসা! আমি ছাড়া সাত আকাশ এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু আছে এবং সাত যমীন যদি পাল্লার এক দিকে স্থাপন করা হয় এবং অপর দিকে لا اله الا الله কে স্থাপন করা হয় তবে দ্বিতীয় অংশটি ভারী হয়ে যাবে।' (ইবনে হিব্বানঃ২৩২৩, আল-হাকিম ১/৫২৮)

☞ এ কালেমার স্বীকৃতি দেওয়া না দেওয়ার উপরই নির্ভর করে বান্দার সফলতা ব্যর্থতা। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ "যে ব্যক্তি لا اله الا الله এর নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (*মুসলিম, ইফাবা/২৩)* রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন, "আল্লাহতায়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের আগুন হারাম করে দিয়েছেন যে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য- لا اله الا الله উচ্চারণ করেছে।" (*বুখারী, মুসলিম)*

❖ প্রশ্ন-৪। তাওহীদের উপকারিতা কি?

উত্তরঃ- মানুষের একক ও সমষ্টিগত জীবনে لا اله الا الله 'র স্বাক্ষ্য দানের মাধ্যমে যখন সত্যিকার তাওহীদ আসবে তখন অতীব সুন্দর ফল পাওয়া যাবে। তাওহীদের উপকারিতা অনেক, তার মধ্যে আছেঃ

- তাওহীদ মানুষকে অপরের দাসত্ব এবং গোলামী থেকে মুক্ত করে প্রকৃত বিনিময়দাতা ও একমাত্র লাভ-ক্ষতির মালিক আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনে।
- তাওহীদ সঠিক ব্যক্তিত্ব গড়তে সহায়তা করে। মানুষ এতে সঠিকভাবে জীবন গঠন করতে পারে এবং সত্যিকারের দিক নির্দেশনা পায়। তার লক্ষ্য বস্তুকে নির্দিষ্ট করে দেয়। কারণ সে বুঝে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপায় নাই।
- তাওহীদ হচ্ছে মানুষের জীবনে নিরাপত্তার ভিত্তি। কারণ, এর দ্বারাই সে নিরাপত্তা ও শান্তি পায়। সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।
- তাওহীদ হচ্ছে মানুষের মনের শক্তির উৎস। তা তাকে মানসিক শক্তি যোগায়। ফলে তার অন্তর আল্লাহ্ হতে প্রাপ্তির আশায় ভরে যায়।
- তাওহীদ হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব এবং একতার বন্ধনের মূল।

❖ প্রশ্ন- ৫। তাওহীদ তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ফাযীলাত কি?

উত্তরঃ- لا اله الا الله এর স্বাক্ষ্য যে ব্যক্তি দেয় তিনি মুসলিম, সর্বোত্তম জিনিস ঈমান লাভ করে لا اله الا الله তথা তাওহীদ এর অনেক ফযীলত। সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে কিছু ফযীলতের কথা আমরা তুলে ধরছি-

- তাওহীদের এ কালেমা জান্নাতে প্রবেশ করায়। আল্লাহর রাসুল বলেন,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি মারা গেল এ অবস্থায় যে সে জানে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ হক্ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম হা/২৬)*

- لا اله الا الله এমন মহান কালেমা যে তা জাহান্নামকে হারাম করে দেয়। আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেন-

يَقُولُ « مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ

যে কেউ অন্তর হতে সত্য সহকারে এ কালেমার স্বাক্ষ্য প্রদান করবে যে, (আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ ইলাহ নেই) এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর রাসুল আল্লাহ তাঁর উপর জাহান্নমের আগুন কে হারাম করে দিবেন।" *(বুখারী, মুসলিম)*

- কিয়ামতের কঠিন এবং ভয়াবহ মূহুর্তে তাওহীদের এ কালিমার স্বাক্ষ্যদানকারীর জন্য নবী (সঃ) সুপারিশ করবেন। প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেন- "আমার শাফায়াত পেয়ে সর্বাধিক সাফল্য লাভ করবে ঐ ব্যক্তি যে তার অন্তর থেকে খালেসভাবে বলবে- لا اله الا الله (বুখারী)
- এ কালেমার যিকির সর্বোত্তম যিকির। নবী (সঃ) বলেন- "সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে- لا اله الا الله। *(সহীহ সুনানে তিরমিজি লিল আলবানী ৩/২৬৯৪)*
- এ কালেমা যে স্বীকার করে নেবে এবং শিরক মুক্ত থাকবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। প্রিয় নবী (সঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি বলে لا اله الا الله আর আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় তা সবই অস্বীকার (বর্জন) করে তার সম্পদ এবং রক্ত হারাম। আর তার হিসাব আল্লাহর উপর।" *(মুসলিম)*
- لا اله الا الله আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখ দেয় এবং গুনাহ মাফ করায়। নবী (সঃ)-এর হাদীসে এসেছেঃ

  অর্থাৎঃ "যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নাই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত

রাসূল। আর ঈসা (আঃ) আল্লাহর দাস এবং আল্লাহ তা'আলার ঐ কথা যা মরিয়ম (আঃ)- এর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি ঈসা (আঃ) আল্লাহ্ হতে প্রেরিত রূহ, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য- তবে তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে যে কোন আমলই করুক না কেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

হাদীসে কুদসীতে পাওয়া যায় আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "হে আদমের সন্তান, যদি তুমি কোন শির্ক না করে আমার সামনে দুনিয়া ভরতি পাপরাশি সহ হাজির হও, তবে আমি তোমাকে দুনিয়া ভরতি ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব।" *(তিরমিযী)*

এই সমস্ত হাদীসসমূহ তাওহীদের ফযীলত প্রকাশ করছে। মানুষের সুখের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় কাজ। তার গুনাহ মাফের জন্য এবং তার ভুলভ্রান্তি মুছে ফেলার জন্য এটাই সবচেয়ে বড় অছিলা।

তাওহীদের প্রকারভেদ

❖ প্রশ্ন-১। তাওহীদ কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ- তাওহীদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তা হচ্ছে-

১) তাওহীদ আর-রবুবিয়্যাহ (প্রতিপালকের এককত্ব অক্ষুন্ন রাখা)

২) তাওহীদ আল-আছমা ওয়াছ ছিফাত (আল্লাহর নাম ও গুনাবলীর এককত্ব বজায় রাখা)

৩) তাওহীদ আল-ইবাদাহ (আল্লাহর ইবাদতের এককত্ব বজায় রাখা)

❖ প্রশ্ন-২। 'রব' মানে কি?

উত্তরঃ- কুরআনে অনেক জায়গায় রাব্বুল আলামীন বা বিশ্বজাহানের রব বলা হয়েছে। 'রব' এমন একটি শব্দ যা অন্য ভাষায় এক শব্দে যথাযথ অনুবাদ করা সম্ভব নয়। সাধারনভাবে যদিও রব মানে প্রতিপালক করা হয় কিন্তু রব মানে- প্রভু, স্রষ্টা, সত্বাধিকারী. ব্যবস্থাপক, পরিচালক, পরিকল্পনাকারী. পরিচর্যাকারী, নিরাপত্তা দানকারী ইত্যাদি।

❖ প্রশ্ন-৩। তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বলতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ- রুবুবিয়্যাহ বা প্রভূত্বের তাওহীদ ঃ তা হচ্ছে আল্লাহর কার্যাবলী, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় তাকে একক বিশ্বাস করা। যেমন সৃষ্টি, মালিকানা, রিযিকদান, জীবন-মৃত্যু দান, সমগ্র রাজ্য ও বিষয়াদি নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করা, সার্বভৌমত্ব, আইন-বিধান দান, উপকার-অপকারের ক্ষমতা, বিপদ-সংকট থেকে পরিত্রান দেয়া ইত্যাদির অধিকার ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর এ বিশ্বাস করা এবং এসব ক্ষেত্রে তাঁর বিন্দুমাত্র শরীক নেই। রুবুবিয়্যাতের অন্তর্ভূক্ত কিছু বিষয় নীচে কুরআন থেকে উল্লেখ করা হল-

সৃষ্টি ঃ

{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} [الزمر: ٦٢]

"আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা।" *(সূরা যূমার ৬২)*

রিযক্ বা জীবিকাঃ

{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [هود: ٦]

"আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিয়েছেন তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে।" (সূরা, হুদ ১১ঃ৬)

কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব ঃ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।" (সূরা, আলে ইমরান ৩ঃ২৬)

জীবন ও মৃত্যু ঃ

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।" (সূরা মুলক ৬৭ঃ২)

আইন বিধান দান ঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

"আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" (সূরা, ইউসূফ ১২ঃ৪০)

সন্তান প্রদানঃ

{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: ٤٩]

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।

{أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ}

অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।" (সূরা, শূরা ৪২ঃ৪৯-৫০)

কল্যান ও অকল্যানঃ

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"আর আল্লাহ্ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খন্ডাবার মত তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুত; তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।" (সূরা, ইফনুস ১০ঃ১০৭)

প্রভুত্ব/ প্রতিপালনঃ

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাঁর নিজের ব্যাপারে সর্বমোট ৪২ বার রাব্বুল আলামীন বা বিশ্ব জাহানের রাব্ব বলে পরিচয় দিয়েছেন।

❖ প্রশ্ন-৪। তাওহীদ আল আছমা ওয়াস সিফাত বলতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ- তাওহীদ আল আছমা ওয়াস সিফাত অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীর ক্ষেত্রে এককত্ব। তা হচ্ছে এই যে, কোরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহর যে সমস্ত নাম ও গুনাবলী উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোকে কোন বিকৃতি, বিলুপ্তি, ধরণ পদ্ধতি, অপব্যাখ্যা ও তুলনা উপমা ছাড়া বিশ্বাস ও সাব্যস্ত করা। চাই গুণাবলীগুলো আচরণগত হোক চাই সত্ত্বাগত। যেমন আরশে সমুন্নত হওয়া, কথা বলা, ভালবাসা, রাগ করা, হাসা, আল্লাহর হাত, পা, চেহারা, চক্ষু, মুষ্টি, আকার আকৃতি ইত্যাদি। আল্লাহ সুবঃ বলেছেনঃ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

"বল আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো ঔরসে জন্মও নেননি। তার সমতুল্য কেউ নেই।" (সূরা ইখলাছ)

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأعراف/١٨٠]

তিনি আরোও বলেনঃ "আল্লাহর উত্তম নামসমূহ রয়েছে। অতএব, তোমরা তাকে এসব নামের অসীলায় ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তার নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে (বিকৃতি ঘটিয়ে)। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল অবশ্যই পাবে।" (সূরা আ'রাফ ৭ঃ১৮০)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى/١١]

আল্লাহ আরো বলেনঃ "তার মতো কোন কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শূরাঃ ১১)

তাওহীদ আল আছমা ওয়াস সিফাত এর প্রধান কয়েকটি শর্ত রয়েছে-

১) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখার প্রথম শর্ত হ'ল, কোরআন এবং হাদিসে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) আল্লাহর যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে ছাড়া আর কোনভাবে আল্লাাহর নাম এবং গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া যাবে না।

২) তাওহীদ আল্-আছ্মা ওয়াস-সিফাত এর দ্বিতীয় রূপ হ'ল আল্লাহর উপর কোন নতুন নাম ও গুণাবলী আরোপ না করে তিনি নিজেকে যেভাবে উল্লেখ করেছেন সেভাবেই তাঁকে উল্লেখ করা। উদাহরণস্বরূপ, যদিও তিনি বলেছেন যে তিনি রাগ করেন তথাপি তাঁর নাম আল্-গাদিব (রাগী জন) দেয়া যাবে না কারণ আল্লাহ বা তাঁর রাসুল (সাঃ) কেউ এই নাম ব্যবহার করেননি।

৩) তাওহীদ আল্-আছ্মা ওয়াছ-ছিফাত এর তৃতীয় শর্ত অনুযায়ী আল্লাহকে কখনোই তাঁর সৃষ্টির গুণাবলি দেয়া যাবে না।

৪) আল্লাহর গুণাবলী উল্লেখ করতে কোরআনের আয়াতকে মৌলিক নিয়ম হিসাবে অনুসরণ করতে হবে,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ "কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা আশ-শূরা ৪২ঃ ১১) *যেমন*, শ্রবণ ও দর্শন মানুষের গুণাবলী কিন্তু যখন তা স্রষ্টার উপর আরোপিত করা হয় তখন সেগুলি তুলনাবিহীন এবং ক্রটিমুক্ত। যাহোক এই গুণাবলী মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চোখ ও কান অপরিহার্য, যা স্রষ্টার জন্য প্রযোজ্য নয়। স্রষ্টা সম্বন্ধে মানুষ কেবলমাত্র ততটুকুই জ্ঞাত যতটুকু তিনি তাঁর পয়গম্বরদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং, মানুষ এই সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে অবস্থান করতে বাধ্য।

৫) তাওহীদ আল্-আছ্মা ওয়াছ্-ছিফাতের চতুর্থ রূপের জন্য প্রয়োজন মানুষের উপর আল্লাহর গুণাবলী আরোপ না করা।

৬) আল্লাহর নামের এককত্ব বজায় রাখার আরও অর্থ হ'ল যদি নামে আগে আব্দ' (অর্থ ভৃত্য অথবা বান্দা) সংযোজিত না করা হয় তাহলে তার সৃষ্টিকে আল্লাহর কোন নামে নামকরণ করা যাবে না। কিন্তু 'রাউফ' এবং 'রহিম' এর মত কিছু নাম মানুষের নাম হিসাবে অনুমোদিত। কারণ রাসুল (সঃ) কে উল্লেখ করতে যেয়ে আল্লাহ এই ধরনের কিছু নাম ব্যবহার করেছেন।

❖ প্রশ্ন-৫। আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় নিষিদ্ধ?

উত্তরঃ- আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ তা হচ্ছে-

১. تأويل তা'বিলঃ পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত ও সহীহ্‌ হাদীসের বিপরীত কোন আচরণ করাই হচ্ছে তা'বিল। যেমন এসতোয়া (উর্ধ্বে আরোহণ, বসা) ইত্যাদির অর্থ ইসতাওলা করা বা শক্তি প্রয়োগে দখল করা।

২. تعطيل তা'তীলঃ তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র (সুবঃ) কোন সিফাতকে (গুণ) অস্বীকার করা। যেমনঃ আল্লাহ্‌ (সুবঃ) আসমানের উপর আছেন। কিন্তু অনেকেই এটিকে অস্বীকার করে এ ভ্রান্ত ধারণা করে যে আল্লাহ্‌ সর্বত্র বিরাজমান।

৩. تكيف তাকইফঃ তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র (সুবঃ) কোন গুণকে কোন নির্দিষ্ট আকারে চিন্তা করা। যেমনঃ- আল্লাহ্‌ (সুব) যে আরশের উপর আছে তা তার অন্য কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। অথচ তিনি কিভাবে আরশের উপর আছে তা কেউ জানে না।

৪. تمثيل তামছিলঃ তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র (সুব) কোন গুণকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। যেমনঃ- আল্লাহ্‌ (সুব) প্রতি রাত্রে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁর অবতীর্ণ হওয়া ও আমাদের কোন জায়গায় অবতীর্ণ হওয়া এক নয়।

৫. تفبيد তাফবীদঃ আকৃতি দেয়া, সলফে সালেহীনদের মত আল্লাহ্‌র (সুব) আকৃতির ব্যাপারে কোন কথা আসলে তা তারা বলতেন আমরা আকৃতি জানি না কিন্তু যে সমস্ত অঙ্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে তা বুঝি। যেমন আল্লাহর হাত, আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর হাত আছে কিন্তু এর আকৃতি কেমন আমরা জানি না।

استواه ونزوله ويده معلوم وكيفيته مجهول والايمان به واجب والسوال عنه بدعة
ইসতোয়া অর্থাৎ বসা বা উর্ধারোহণ এর অর্থ সবাই বুঝে, কিন্তু কিভাবে, তা কেউ জানে না। এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব, আর এর কৈফিয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বিদা'আত।

❖ প্রশ্ন-৬। তাওহীদ আল উলুহিয়্যাত বলতে কি বোঝায়?

উত্তর- তাওহীদ আল উলুহিয়্যাত হচ্ছে আল্লাহকে একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ হিসেবে গ্রহন করা, আল্লাহর জন্যই সমস্ত আত্মিক, মৌখিক এবং শারিরীক সমস্ত প্রকারের ইবাদত নিবেদন করা। এটি হচ্ছে বান্দার কাজের মাধ্যমে আল্লাহকে এক ও একক বলে মানা। একে তাওহীদ আল ইবাদাহ ও বলা হয়।

তাওহীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল তাওহীদ আল-ইবাদাহ অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে এককত্ব বজায় রাখা। যেহেতু একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত প্রাপ্য এবং মানুষের ইবাদতের ফল হিসাবে একমাত্র তিনিই মঙ্গল মঞ্জুরী করতে পারেন, সেজন্য সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করেই করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

{وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ} [البقرة: ١٦٣]

"এবং তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া ইবাদতযোগ্য আর কোন ইলাহ নেই। তিনি মহা করুনাময়, দয়ালু।" (সূরা, বাক্বারাহ, ২ঃ১৬৩)

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [آل عمران/١٨]

"আল্লাহ্ স্বাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত ইবাদতযোগ্য কোন হক্ ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানবান লোকেরা সততা ও ইনসাফের সাথে এ স্বাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহা পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞানী ছাড়া কেহই ইলাহ হতে পারে না।" (*আল ইমরানঃ ১৮*)

ইবাদতের প্রকার সমূহ যা আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশিত করেছেন তা হচ্ছেঃ ইসলাম, ঈমান, ইহসান, দোয়া, খওফ,আশা-আকাংখা, তাওয়াক্কুল, অনুরাগ, ভয়-ভীতি, খুশু, অমংগলের আশংকা, ইনাবাহ, সাহায্য প্রার্থনা, আশ্রয় প্রার্থনা, বিপদে উদ্ধার চাওয়া, যবাহ, আন নযর ইত্যাদি, শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই এসব ইবাদত নিবেদন করতে হবে, তাঁর সাথে বিন্দুমাত্র কাউকে শরীক না করে।

❖ প্রশ্ন-৭। কেন শুধু আল্লাহকেই একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ হিসেবে গ্রহন করতে হবে?

উত্তরঃ- ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ) তার " কায়েদাতুন জামেয়া ফি তাওহীদিল্লাহ ওয়া ইখলাছিল আমল ওয়াল ওয়াজহে লাহু" নামক পুস্তিকায় তাওহীদুল উলুহিয়্যার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক অনেক তথ্য এবং যুক্তির সমাহার ঘটিয়েছেন। আমরা সে গুলোর কিছুটা সংক্ষিপ্ত সার এখানে তুলে ধরছি।

১. * আল্লাহই মানুষের হৃদয়ের মাকছুদ, হৃদয় শুধু আল্লাহকেই চায়। * এ মাকছুদ তথা আল্লাহকে পেতে তিনিই সাহায্যকারী। * গায়রুল্লাহ হৃদয়ের কাছে অনাকাংখিত। * এ অনাকাংখিত গায়রুল্লাহকে হৃদয় থেকে দূর করতে তিনিই সাহায্যকারী। এই চারটি বিষয় শুধু আল্লাহর সাথে জড়িত। তাই তাঁরই ইবাদত করতে হবে। সাহায্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আর এই হচ্ছে- اياك نعبد واياك نستعين "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়িন" অর্থাৎ আমরা শুধু আপনাইরই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য কামনা করি এই কথার মর্ম।

২. মানুষ আল্লাহর সৃজন ও রুবুবিয়্যাতের প্রতি যতটা মুখাপেক্ষী তার চেয়ে অনেক বেশী মুখাপেক্ষী তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি। কেননা ইবাদতই হচ্ছে তার সৃষ্টি ও জীবনের লক্ষ্য। যা ব্যতীত তার জীবন নিস্ফল ও ব্যর্থ বরং ভয়াবহ শাস্তিযোগ্য।

৩. সৃষ্টির কাছে বান্দার কল্যান ও অকল্যানের, দান ও বঞ্চনার কোন কিছুই নেই। কেউ সন্তুষ্ট হলেই বান্দার উপকার করতে পারবে না যদি আল্লাহ তা মঞ্জুর না করেন, আবার ক্ষতিও করতে পারবে না যদি তিনি তা অনুমোদন না করেন। পক্ষান্তরে তিনি বান্দার কল্যান বা অকল্যান করতে চাইলে তা রুখবার মত কেউ নেই। সুতরাং অক্ষম গায়রুল্লাহর ইবাদত করে কি লাভ।

৪. আল্লাহর ইবাদতের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন, সৃষ্টির সাথে তার চেয়ে অধিক সম্পর্ক রাখা বান্দার জন্য ক্ষতিকর। যেমনিভাবে ক্ষতি করে অতিরিক্ত খাদ্য পানীয়। তাই আল্লাহর দিকেই ধাবিত হওয়া উচিত। এবং সৃষ্টির সাথে ভালবাসা ও সম্পর্ক তাঁর দ্বীনের জন্য এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই হওয়া উচিত।

৫. অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমানিত হয়েছে যে, বান্দা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর ভরসা করলে কিংবা কারো আশা করলে নিরাশা আর ব্যর্থতাই তার পাওনা। তাই সকল আশা-ভরসা আল্লাহর উপরই করতে হবে। এতেই রয়েছে বান্দার কল্যান। এর ব্যতিক্রম করলে অকল্যান ও ধ্বংসই হবে তার প্রাপ্য।

৬. আল্লাহ নিজে অভাবমুক্ত, পরম উদার, বড়ই করুণাময়। কোন প্রয়োজন ছাড়াই তিনি বান্দার উপকার করেন। তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আর বান্দার প্রতি অন্য বান্দার ভালবাসাতো কোন না কোন স্বার্থেই হয়ে থাকে। তাই নিঃস্বার্থ আল্লাহই মানুষের প্রকৃতবন্ধু। তিনি বান্দার উপকারের জন্যই বান্দাকে কাছে নিতে চান। যাতে শুধু বান্দারই উপকার। এ সত্যটি বুঝলে তা আপনাকে মাখলুকের কাছে আশা করা থেকে বিরত রাখবে।

৭. অধিকাংশ মানুষ আপনাকে দিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে চাইবে। যদিও তা আপনার জন্য ক্ষতিকর হয়। কারণ প্রয়োজনগ্রস্থ ব্যক্তি অন্ধ। সে প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।

৮. আপনি কোন ভয়, ক্ষুধা ও রোগে আক্রান্ত হলে সৃষ্টিকুল আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া তা প্রতিহত করতে পারে না। আর তারা নিজের কোন স্বার্থ ছাড়া তা দূর করার ইচ্ছাও করবে না।

৯. সৃষ্টি যেহেতু আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া আপনার কোনই কল্যান অকল্যান করতে পারে না, তাই আপনার আশা-ভরসা আল্লাহর সাথেই সংযুক্ত করুন।

১০. আপনি নিজেই নিজের কল্যান- অকল্যান যথোচিতভাবে বুঝেন না।

তাহলে কিভাবে অপর কোন সৃষ্টি আপনার কল্যান- অকল্যান বুঝবে। আল্লাহ সবই জানেন আর তিনি সক্ষমও বটে। তিনি আপনাকে তাঁর বিরাট অনুগ্রহ দান করতে সক্ষম ।তাই একমাত্র তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্য কারা উচিত নয় কি?

❖ প্রশ্ন-৮। শুধুমাত্র তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাত ও আসমা ওয়াস সিফাতের স্বীকৃতি যথেষ্ট নয় তার প্রমান কি?

উত্তরঃ- ইসলামী মতে তাওহীদকে পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য তৌহিদ আর-রবুবিয়াহ এবং আল্-আছমা ওয়াছ-ছিফাত অবশ্যই এদের পরিপূরক তৌহিদ আল্-ইবাদাহ্-র সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। কোরআনে আল্লাহ রাসুল (সঃ)-কে পৌত্তলিকদের বলতে বলেছেন,

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ [يونس/٣١]

“বল কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত হইতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে? তখন তাহারা বলিবে, আল্লাহ”। (সুরা ইউনুছ ১০ঃ ৩১)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ [العنكبوت/٦٣]

“যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ভুমি মৃত হইবার পর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া কে উহাকে সঞ্জীবিত করে? উহারা অবশ্যই বলিবে, ‘আল্লাহ’।” (সুরা আল-আনকাবুত ২৯ঃ ৬৩)

মক্কাবাসীরে তৌহিদ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি তারা অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে নাস্তিক (কাফের) এবং পৌত্তলিক (মুশরিক) হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। ফলে তৌহিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল তৌহিদ আল-ইবাদাহ অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে এককত্ব বজায় রাখা।

❖ প্রশ্ন-৯। নাবী রাসুলরা কোন তাওহীদের দিকে নিজ নিজ জাতিকে আহ্বান করেছিলেন?

উত্তরঃ- সকল নাবী রাসুলগন নিজ নিজ জাতিকে তাওহীদুল উলুহিয়্যাত তথা আল্লাহকে একক ইলাহ হিসেবে গ্রহন করার জন্য আহবান করেছিলেন।

সে সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

"আমি তোমার পুর্বে এমন কোন রাসূল পাঠাইনি তার কাছে এই ওহী ছাড়া যে আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই সুতরাং আমারই ইবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া:২৫)

সুতরাং সমস্ত নবী-রাসূলগনের আহ্বানের কালিমা ছিল একটাইঃ لا اله الا الله- আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাদের প্রধান দাওয়াত ছিল তাগুত তথা সমস্ত বাতিল উপাস্যের ইবাদতকে বর্জন করে একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ আল্লাহর ইবাদত করা।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦]

"আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য।" (সূরা, নাহল ১৬ঃ৩৬)

তাওহীদের শর্তাবলী

❖ প্রশ্ন-১। শর্ত কাকে বলে?

উত্তরঃ- শর্ত এমন একটি বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্যের অনুপস্থিতি অপরিহার্য এবং যার অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব অপরিহার্য নয়। যেমন- সলাতের একটি শর্ত হচ্ছে ওজু বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল করা। এখন কেউ যদি ওজু না করেই সলাতে দাড়িয়ে যায় তাহলে তার সলাত কবুল হবে না এজন্য যে সে সলাতের অপরিহার্য একটি শর্ত পূরণ করে নাই। শর্ত হচ্ছে কোন জিনিসের বাইরের বিষয় এবং ঐ জিনিসটি শুরূ করার পূর্বেই তা পূরণ করতে হয়।

❖ প্রশ্ন-২। তাওহীদের শর্তাবলী পূরন করা কেন জরূরী?

উত্তরঃ- তাওহীদের বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং তাওহীদের শর্তগুলো পূরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। এটা এজন্য যে, কারো মাঝে তাওহীদের কোনো শর্ত না পাওয়া গেলে তার মধ্যে ঈমান ও ইসলামের মূলই পাওয়া গেলো না বলে বিবেচিত হবে। যেমন সলাত সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে যদি কোনো একটি শর্ত যেমন কেবলামুখী হওয়া অথবা ছতর ঢাকা ইত্যাদি না পাওয়া যায় তাহলে সলাত বাতিল বলে গণ্য হবে। শর্ত যেহেতু বাইরের বিষয় এবং জিনিসটি শুরূ করার পূর্বেই তা পূরণ করতে হয় সেহেতু কোন ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবী করলে তাকে অবশ্যই তাওহীদের শর্তাবলী নিজের মধ্যে পূরণ করতে হবে।

❖ প্রশ্ন-৩। তাওহীদের শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ- তাওহীদের শর্ত সাতটি। এগুলো হচ্ছে-

- **প্রথম ঃ** العلم। আল ইল্‌ম বা জানা- নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিক থেকে তার অর্থ জানা। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেনঃ {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}
“তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।” (মুহাম্মদঃ ১৯)

- **দ্বিতীয় ঃ**اليقين। আল ইয়াক্বীন বা দৃঢ় বিশ্বাস-কালিমাহকে এমন পরিপূর্ণভাবে জানা যাতে সংশয় সন্দেহ না থাকে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ [الحجرات/١٥]

"প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের (সঃ) প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সন্দেহ পোষন করেনি এবং জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ লোক।" (আল-হুজুরাতঃ১৫)

■ **তৃতীয় ঃ** القبول। আল কবুল বা গ্রহন করা- এমনভাবে গ্রহণ করা যা প্রত্যাখ্যানের পরিপন্থী। আল্লাহ বলেছেনঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ [الصافات/٣٥، ٣٦]

"এসব লোকেরা এমন ছিলো যে, তাদেরকে যখন বলা হতোঃ "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই"তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়তো। তারা বলতোঃ আমরা এক পাগল কবির কথায় নিজেদের মাবুদগুলোকে পরিত্যাগ করবো? " (সাফফাতঃ ৩৫-৩৬)

■ **চতুর্থ ঃ** الانقياد। আল ইনকিয়াদ বা সমর্পন করা- এ কালিমার অধিকার সমূহের প্রতি অনুগত হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর জন্যে মনকে নিস্কলূষ করে তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ওয়াজিব কাজসমূহ সম্পন্ন করা। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء/٦٥]

"না, হে মুহাম্মদ, তোমার রবের নামে কসম, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারেনা, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যাই ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং ফয়সালার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করবে।" (আন-নিসাঃ ৬৫)

■ **পঞ্চম ঃ** الصدق। আছ ছিদ্‌ক বা সত্যবাদিতা- এমন সত্যবাদিতা যা মিথ্যর পরিপন্থী, নিফাক-কপটতার প্রতিবন্ধক। রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

من قال لا إله الا الله صادقا بها دخل الجنة(مسند أحمد - جـ ٤ صـ ٤١١)

যে ব্যক্তি সত্যতার সাথে খাঁটি অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আহমদ)

■ **ষষ্ঠ ঃ** الاخلاص। আল ইখলাস বা একনিষ্ঠতা- এমন নিখাদচিত্ত হওয়া যা শিরকের পরিপন্থী। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: ٥]

"তাদেরকে এ ছাড়া কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।" (বাইয়্যিনাহঃ ৫)

■ **সপ্তম ঃ المحبة** আল মুহাব্বাহ বা ভালবাসা- এ কালিমাহ ও তার নির্দেশিত বিষয়কে (আল্লাহ ও তদীয় রসূল এবং তাদের আদেশ ও নিষেধকে) ভালবাসা এবং এতে সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ [البقرة/١٦٥]

"আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি মুহব্বত বা ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা উচিৎ একমাত্র আল্লাহকে। কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী। আর কতইনা ভাল হতো যদি এ জালেমরা পার্থিব কোনো কোনো আযাব প্রত্যক্ষ করে অনুধাবন করে নিতো যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য এবং শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।" (আল বাকারাহঃ ১৬৫)

আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ বলেনঃ ছয়টি অথবা সাতটি বিষয়ে তোমাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এ ছয়টি বিষয়ের সমাবেশ ব্যতীত একজন বান্দা কুফ্‌রী ও মুনাফেকী থেকে মুক্ত থাকতে পারেনা। একজন বান্দার মধ্যে ছয়টি বিষয়ের সমাহার এবং তদানুযায়ী আমল করার মাধ্যমেই সত্যিকারে মুসলিম হওয়া সম্ভব। তাই জ্ঞান, আমল, বিশ্বাস, গ্রহণ, মুহাব্বত ও আনুগত্যের দিক থেকে বান্দার অন্তর ও জবানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।
অতএব একজন মুসলমানের জ্ঞান এমন হতে হবে, যেখানে মুর্খতার অবকাশ নেই। তার ইখলাস হবে শিরক মুক্ত, সত্যতা হবে মিথ্যাচার মুক্ত, তার চরিত্র হতে হবে শিরক এবং নিফাক মুক্ত। তার বিশ্বাস হতে হবে সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত। সে কলেমা উচ্চারণ করবে অথচ তার মনে কালেমা দ্বারা যা বুঝায় তার ব্যাপারে এবং এর দাবীগুলোর ব্যাপারে কোনো প্রকার সংশয় থাকবে না। তার মনে থাকবে সেই ভালবাসা, যার মধ্যে থাকবে না কোনো ঘৃণা, থাকবে

এমন গ্রহণ যোগ্যতা যার মধ্যে থাকবে না কোনো অস্বীকৃতি। সেই আরব মুশরিকদের মতো তার অবস্থা হবে না যারা কলেমার অর্থ বুঝতো অথচ তা গ্রহন করেনি। একজন মুসলিমের মধ্যে থাকা চাই সেই আনুগত্য, যার মধ্যে থাকবে না শিরকের অস্তিত্ব, যে শিরকের উদ্ভব হয়েছে কালেমার দাবী, অপরিহার্য বিষয় ও অধিকার পরিত্যাগ করার কারণে। কলেমার এসব দাবী ও অপরিহার্য বিষয়গুলোর মাধ্যমেই বান্দার ইসলাম ও ঈমান পরিশুদ্ধ হয়।

❖ প্রশ্ন-৪। তাওহীদ সম্পর্কে কেন জানতে হবে? এ ব্যাপারে বর্তমানে অধিকাংশ লোকের কি অবস্থা?

উত্তরঃ- ইসলামে প্রবেশের একটি মাত্র কালেমা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ইহাকে কালেমা তাইয়্যেবা বা কালেমাতুত তাওহীদ বলে। এ কালেমা সম্পর্কে জানার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা নির্দেশঃ [محمد/١٩] فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" (মুহাম্মদ ৪৭ঃ১৯)

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (صحيح مسلم)

রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই"একথা জানা অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (*মুসলিম)*

আল্লামা শাইখ আব্দুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ (রহঃ) বলেছেনঃ "লা ইলাহা ইলালাহর অর্থসহ সেই এলমে ইয়াকীনী বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যা نفى اثبات (কি অস্বীকার করা হয় আর কি সাব্যস্ত করা হয় তা) সহ জানা আল্লাহ্ ওয়াজিব করে দিয়েছেন।" (*আদ দারু সুন্নাহ)*

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেনঃ 'যারা জেনে শুনে সত্যের স্বাক্ষ্য দিবে তাদের কথা ভিন্ন'।

শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেছেন, "অর্থ জানা ব্যতীত এবং কালেমা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর দাবী মোতাবেক কর্ম সম্পাদন ব্যতীত শুধুমাত্র শাব্দিক স্বাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না। বরং এ মৌখিক স্বাক্ষ্য আদম সন্তানের বিরুদ্ধে একটি দলিল হিসেবে বিবেচিত।" তিনি আরও বলেন, "আপনি জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন) যে, নামাজ-রোজা ফরজ কিন্তু এরও আগের ফরজ হচ্ছে لا اله الا الله 'র স্বাক্ষ্য দানের বিষয়টি জেনে নেয়া। অতএব নামাজ-রোজার গবেষণার অপরিহার্যতার চেয়ে বান্দার জন্য অধিকতর অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে لا اله الا الله এর অর্থ নিয়ে গবেষণা করা।

এ কালেমা সম্পর্কে জানা অপরিহার্য এ জন্য যে, "আল্লাহ এক এবং তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য হকদার" এটা না জানলে কোন ব্যক্তির ইসলামে প্রবেশ গ্রহনযোগ্য নয়। এ জন্যই তাওহীদের ইলমকে বান্দার ইসলাম কবুলের শর্তরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ এ কালেমা সম্পর্কে অজ্ঞ, একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তায়ালা যার প্রতি করুনা করেছেন, আর শিরক্ থেকে রক্ষা করেছেন, সে ছাড়া অধিকাংশ লোকের মধ্যেই কতিপয় শিরক্ লুকায়িত আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অধিকাংশ লোকের অবস্থা হচ্ছে তারা জানে না এ কালেমার অর্থ কি, কি এর গুরুত্ব ও মর্যাদা, এ কালেমার দাবীই বা কি, এ কালেমার স্বাক্ষ্য দানের মাধ্যমে কি তারা স্বীকার করে নিয়েছে আর কি অস্বীকার করেছে। তারা দাবী করছে আমরা মুসলিম আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর করো ইবাদত করি না অথচ তারা বাস্তবিকভাবে আল্লাহর পাশাপাশি অন্য অনেক কিছুর ইবাদত করছে। আল্লাহ্র (সুবঃ) বানীঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف/١٠٦]

অর্থাৎ "অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে কিন্তু সাথে সাথে শিরক্ ও করে।" (সূরা, ইউসুফ ১২ঃ১০৬)

বর্তমানে এ আয়াতের বাস্তবতায় দেখছি অধিকাংশ মানুষ মুখে ঈমানের দাবী করা সত্ত্বেও কর্মের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সাথে শিরক্ করছে।

তাওহীদের রুকন

❖ প্রশ্ন-১। রুকন কাকে বলে? তাওহীদের রুকনের গুরুত্ব কি?

উত্তরঃ- রুকন হচ্ছে এমন বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্য একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে উঠে। রুকন অবশ্যই মূল বিষয়টির অন্তর্গত হওয়া চাই। যেহেতু রুকন কোন জিনিসের আভ্যন্তরীণ বা ভেতরের বিষয়, সেহেতু ঐ জিনিসটি শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি এর উপর নির্ভরশীল। অতএব কোন জিনিসের রুকন ব্যতীত তা সহীহ বা শুদ্ধ হয় না।

রুকন কি জিনিস, এটা জানার পর আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, যে তাওহীদ আল্লাহ তায়ালা আপনার ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন, সে তাওহীদেরও সলাতের মতোই রুকন আছে। সলাত যেমন তার রুকন যথা- তাকবীরে তাহরিমা, রুকু, সেজদা, শেষ বৈঠক ইত্যাদি আদায় করা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না, কোনো ব্যক্তি যদি সলাতের কোনো রুকন বাদ দেয় তাহলে তার সলাত যেমন ভাবে বাতিল হয়ে যায়, তেমনি ভাবে কোনো ব্যক্তি যদি তাওহীদের কোনো একটি রুকন বাদ দেয়, তাহলে সে ব্যক্তিও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী (মুওয়াহহিদ) ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার কোনো কাজে আসবে না, সে আর মুসলিম থাকবে না বরং সে কাফেরে পরিণত হয়ে যাবে।

❖ প্রশ্ন-২। তাওহীদের রুকন কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ- তাওহীদের রুকন দু'টি-

(১) الكفر بالطاغوت কুফর বিত ত্বাগুত এবং (২) الايمان بالله ঈমান বিল্লাহ।

এর প্রমাণ হচেছ, আল্লাহ তায়ালার নিম্মোক্ত বানীঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا [البقرة/٢٥٦]

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়"। (আল-বাক্বারাহ ২ঃ ২৫৬)

উপরোক্ত আয়াতের فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ হচেছ ১ম রোকন, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ হচেছ ২য় রোকন এবং بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى শক্ত রজ্জু বলতে কলেমা لا اله الا الله

কে বুঝানো হয়েছে। আর এটাই মূলতঃ তাওহীদের কলেমা। তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হচ্ছে এই দ্বীনের মূল ভিত্তি ও এর প্রধান মৌলনীতি, এ দিকেই সমস্ত নাবী-রাসুলরা আহ্বান করছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦]

“আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য।” (সূরা, নাহল ১৬ঃ৩৬)

❖ প্রশ্ন-৩। তাগুত কি? তাগুতের সংজ্ঞা কি?

উত্তরঃ- ত্বাগুত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সীমালংঘন কারী, আল্লাহদ্রোহী, বিপথে পরিচালনাকারী। ত্বাগুত শব্দটি আরবী **طغيان** তুগইয়ান শব্দ থেকে উৎসারিত, যার অর্থ সীমালংঘন করা, বাড়াবাড়ি করা, স্বেচ্ছাচারিতা। ত্বাগুত শব্দের ক্রিয়ামূল **طغي** ত্বগা।

শরীয়তের পরিভাষায়, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ত্বাগুত যে, আল্লাহদ্রোহী হয়েছে এবং সীমালংঘন করেছে, আর আল্লাহর কোনো হককে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছে এবং এমন বিষয়ে নিজেকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানিয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস।

সুস্পষ্ট ভাবে ত্বাগুত এর অর্থ হচ্ছে, কোন মাখলুক (সৃষ্টি) নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়কে (আল্লাহর স্থলে) নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করাঃ-

- কোন মাখলুক (সৃষ্টি) কর্তৃক আল্লাহতা'য়ালার কার্যাবলীর যে কোন কার্য সম্পাদনের বিষয়টি নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা। যেমন সৃষ্টি করা, রিজিক দান অথবা শরীয়ত (বিধান) রচনা।
- কোন মাখলুক (সৃষ্টি) আল্লাহতা'য়ালার কোন সিফাত বা গুন কে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা। যেমন ইলমে গায়েব জানা।
- যে কোন ইবাদত মাখলুক কর্তৃক (বা সৃষ্টির) এর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা। যেমনঃ দোয়া, মানত, নৈকট্য লাভের জন্য পশু জবাই অথবা বিচার ফায়সালা চাওয়া ইত্যাদি।

ابن جرير الطبرى: والصواب من القول عندى فى الطاغوت، أنه كل ذى طغيان على الله، فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود، أو شيطانا، أو وثنا، أو صنما، أو كائنا ما كان من شى.

ইমাম আত্ তাবারী (রহঃ) বলেন, "আল্লাহর দেয়া সীমালংঘনকারী মাত্রই তাগুত বলে চিহ্নিত, যার অধীনস্থ ব্যক্তিরা চাপের মুখে তার ইবাদত করে বা তাকে তোষামোদ করার জন্য বা তার আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য তার ইবাদত করে। এ (তাগুত) উপাস্যটি মানুষ কিংবা শয়তান বা মূর্তি অথবা অন্য যেকোন বস্তু হতে পারে।" *(তাফসীরে তাবারী, ইফাবা/৫ম খন্ড, ২৫৬ নং আয়াতের তাফসীর)*

আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ তকীউদ্দীন হেলালী ও আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ মুহসিন খান কর্তৃক অনুদিত কুরআন মাজীদের ইংরেজী অনুবাদের সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে উল্লেখিত ত্বাগুত শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

"The word `Taaghoot` covers a wide range of meaning: it means anything worshipped otherthan Allah. i.e. all false deities. It may be satan, devil`s, idols, stones, sun, stars, human beings. অর্থাৎ "তাগুত" শব্দটি বিস্তৃত অর্থ বোঝায়। এটার অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয়"। যেমন সকল মিথ্যা উপাস্য; এটা শয়তান, মৃত ব্যক্তির আত্মা, মুর্তি, পাথর, সূর্য, তারকা, অথবা কোন মানুষও হতে পারে। (The Noble Quran English translation, P.58)

(৯) سيد قطب: والطاغوت صيغة من الطغيان، تفيد كل ما يطغى على الوعى ويجوز على الحق، ويتجاوز الحدود التى رسمها الله للعبادة، ولا يكون له ضابط من العقيدة فى الله، من الشريعة التى يسنها الله، ومنه كل منهج غير مستمد من الله، وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لايستمد من الله.

সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ) বলেন, "তাগুত বলতে সেইসব ব্যক্তি ও ব্যবস্থাকে বোঝায় যেগুলো ঐশী দ্বীন এবং নৈতিক, সামাজিক ও আইন-শৃঙ্খলাকে অবমাননা করে এবং আল্লাহ নির্দেশিত বা তার দেয়া দিক-নির্দেশনা থেকে উদ্ভুত নয় এমন সব মূল্যবোধ ও রীতিনীতির ভিত্তিতে এই জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করে।" (তাফসীরে ফি যিলালিল কোরআন)

ইমাম মালেক (রহঃ) তাগুতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ "এমন প্রত্যেক জিনিসকেই তাগুত বলা হয়, আল্লাহতা'য়ালাকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয়।" (ফতহুল ক্বাদীর, আল্লামা শওক্বানী)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ "তাগুত হল মানুষরুপী এক শয়তান যাদের কাছে মানুষ আসে বিচার পাওয়ার জন্য এবং মানুষরা তাদের অনুসরণ করে।"

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেছেন:"এ কারণে যে কিনা বিচার করে কোরআনের হুকুম ছাড়া তারা তাগুত।" (মাজমু'আল ফাতাওয়া-২৮খন্ড, ২০১পৃঃ)

ابن القيم : الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أويعبدونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى طاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.

ইবন আল কাইয়্যুম বলেছেন: "তাগুত হল সীমাজ্ঞনকারী। যদিও কিনা সে ইবাদত করে, আল্লাহর আদেশ মেনে চলে। তাই সমাজের মধ্যে তাগুত সেই ব্যক্তি যাকে সমাজের লোকেরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) পাশে বিচারক হিসেবে স্থান দেয়, অথবা আল্লাহ ব্যতীত, তার ইবাদত করে অথবা আল্লাহর নির্দেশনা উপেক্ষা করে, তার অনুসরণ করে অথবা জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তার আনুগত্য করে।" (ই'লাম আল-মুওয়াক্বী'য়ীন-প্রথম খন্ড-৫০পৃঃ)

❖ প্রশ্ন-৪। প্রধান প্রধান ত্বাগুত কারা?

উত্তরঃ- ইমাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন, তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে পাঁচ ধরণের তাগুত নেতৃত্বের আসনে রয়েছেঃ

১. শয়তান: গায়রুল্লার ইবাদতের দিকে আহবানকারী শয়তান;

২. শাসক: আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালেম শাসক;

৩. বিচারক: আল্লাহ(সুব:)-র নাযিলকৃত বিধান ছাড়া যে বিচার-ফায়সালা করে;

৪. গনক, জ্যোতিশি: আল্লাহ ব্যতীত যে ব্যক্তি এলমে গায়েব জানে বলে দাবী করে;

৫. পীর-ফকীর, দরবেশ, প্রবৃত্তি, বাপদাদার অন্ধ অনুসরণ: আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয়।

❖ প্রশ্ন-৫। আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালেম শাসকরা কিভাবে ত্বাগুতের অন্তর্ভূক্ত?

উত্তরঃ- আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

"আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়কে ফয়সালার জন্য তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি তাকে (তাগুতকে) অমান্য করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (আন-নিসাঃ ৬০)

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেছেনঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [يوسف/٤٠]

"বিধান দিবার অধিকার আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" (সূরা, ইউসুফ-১২ঃ৪০)

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেছেনঃ [أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ [الأعراف/٥٤

"জেনে রেখো সৃষ্টি এবং বিধান তাঁরই।" (সূরা, আরাফ -৭ঃ৫৪)

সুতরাং আল্লাহর আইন-বিধানদানের এ সার্বভৌম অধিকারের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিই সীমালংঘন করবে সে ত্বাগুতে পরিণত হবে। কারণ সে আল্লাাহর খাস অধিকারের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করেছে। কোরআনে আল্লাহ ফেরাউনকে ত্বাগুত বলেছেন। আল্লাহ ফিরাউনের ব্যাপারে বলেনঃ

{اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} [طه: ٢٤]

অর্থ:- অতঃপর সে তা ফেলে দিল; অমনি তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। (সুরা ত্বা.হা: ২৪) তারপর আল্লাহ বলেন,

فَحَشَرَ فَنَادَى (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى [النازعات/٢٣، ٢٤]

"দেশবাসীকে জড় করে সে ভাষণ দিলো, অতপর সে বললো, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় 'রব'।" (সূরা নাযিয়াত ৭৯: ২৩-২৪)

ফেরাউন নিজেকে 'রব' বলতে কী বুঝিয়েছে? সে কি দাবী করেছিলো যে, সে আসমান যমীন, মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছে? না, এমন দাবী সে কখনো করেনি। সে যদি এমন দাবী করতো তাহলে তার সংগী-সাথীরাই তাকে পাগল

বলে উড়িয়ে দিতো। বরং সে নিজেও বিভিন্ন পূজা-পার্বনে অংশ নিতো, তারও অনেক ধরনের ইলাহ, মাবুদ বা উপাস্য ছিলো। কোরআন থেকেই এর প্রমাণ দেখে নিনঃ

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ [الأعراف/١٢٧]

"ফেরাউনের জাতির নেতারা (ফেরাউনকে) বললো, আপনি কি মূসা ও তার দলবলকে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির সুযোগ দিবেন আর তারা আপনাকে ও আপনার ইলাহদের এভাবে বর্জন করে চলবে?" (সূরা আরাফ ৭: ১২৭)

তাহলে তার 'রব' দাবী বলতে আসলে কী বুঝায়? কোরআনই আমাদেরকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে যে, ফেরাউনের দাবী ছিল সার্বভৌমত্বের দাবী। সারা পৃথিবীতে নয় তার দাবী ছিল কেবল মিশরের শাসন ক্ষমতার উপর নিরংকুশ আধিপত্যের দাবী। তার দাবী ছিলো মিশরের সাধারণ জনগণের জন্যে তার ইচ্ছানুযায়ী যেমন খুশী তেমন আইন-কানুন ও মূল্যবোধ নির্ধারণের ক্ষমতার দাবী।

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ [الزخرف/٥١]

"ফেরাউন তার জাতির উদ্দেশ্যে (এক) ভাষণ দিলো। সে বললো, মিশরের সার্বভৌমত্ব কি আমার নয়? তোমরা কি দেখছো না যে, এই নদীগুলো আমার (রাজত্বের) অধীনেই বয়ে চলছে--------।" (সূরা যুখরুফ ৪৩:৫১)

যেসব শাসকেরা আল্লাহর হালাল-হারামের বিধানকে পরিবর্তন করেছে তারাও তাগুতের অন্তর্ভূক্ত। তারা নিজেদের মিথ্যা রবের আসনে বসিয়েছে, যদিও তারা মুখে বলে না তারা রব। তিরমিযীতে উদ্ধৃত হাদিসে

عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه (سنن الترمذي)

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে এসে দেখলাম তিনি সূরা তওবার এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেনঃ "তারা তাদের সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজক (পীর, নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে) আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে----- ।" (সূরা তওবা ৯:৩১) আদী (রাঃ) বলেন, আহলে কিতাবরা (ইহুদী ও খৃষ্টানরা) তো আলেম/ দরবেশদের (তথা নেতাদের) পূজা উপাসনা করতো না! রাসূল (সঃ) বললেন, তা সত্য। তবে তারা মনমতো কোনো কিছুকে বৈধ কিংবা অবৈধ ঘোষণা করলে জনগণ তা নির্বিচারে মেনে নিতো। এটাই তাদের পূজা-উপাসনা/ ইবাদত।

বর্তমান তাগুতী (সীমালঙ্ঘনকারী) সরকার ব্যবস্থায় এর উদাহরণ দেখুনঃ মদ, জুয়া, লটারী, সুদ, বেপর্দা, নারী নেতৃত্ব, বেশ্যাবৃত্তি (ব্যভিচার) এমন আরো অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা কঠোর ভাবে অবৈধ ঘোষণা করেছেন, পক্ষান্তরে, তারা এগুলোকে বৈধতার সার্টিফিকেট দিয়েছে।

❖ প্রশ্ন-৬। কিভাবে 'কুফর বিত ত্বাগুত' তথা ত্বাগুতকে বর্জন করতে হবে?

উত্তরঃ- ত্বাগুতকে পাঁচভাবে অস্বীকার করতে হবে-

১। তাগুতের ইবাদত বাতিল এ আক্বীদা পোষণের মাধ্যমেঃ

মানুষ যত ধরনের ইবাদতই তাগুতের জন্য নিবেদন করুক তা সবই বাতিল এ আক্বীদা বা বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ [الحج/٦٢]

আর এটা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সমুচ্চ, সুমহান। " (হজ্জঃ ৬২)

২। তাগুতকে পরিত্যাগ ও তাগুত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমেঃ

এর অর্থ হচ্ছে তাগুতের ইবাদত পরিত্যাগ করা, পরিহার করা। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦]

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকো।" (নাহলঃ ৩৬)

৩। দুশমনি বা শত্রুতার মাধ্যমেঃ

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর ঘটনা বর্ণনা করতঃ বলেন-

قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ٥ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ٥ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلا رَبَّ الْعَالَمِينَ

"ইবরাহীম বললোঃ তোমরা এবং তোমাদের অতীত বাপ-দাদারা যে সব জিনিসের ইবাদত করে আসতেছো, সে গুলি কি কখনো তোমরা চোখ মেলে দেখেছো? এরা সবাইতা আমার দুশমন একমাত্র রাব্বুল আলামীন ছাড়া।" (আশ্ শুআরাঃ ৭৫-৭৭)

যে ব্যক্তির ন্যুনতম জ্ঞান আছে এবং দাবী করে যে সে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে সে কখনো তাগুতকে বন্ধু হিসেবে নিতে পারে না। বরং তাগুতের সাথে থাকবে তার দুশমনি বা শত্রুতা।

৪। ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমেঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সংঙ্গীগণের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলোঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা যতক্ষণ না এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, ততক্ষণ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে থাকবে চির শত্রুতা, ক্রোধ ও ঘৃণা।" (আল মুমতাহিনাঃ ৪)

সুতরাং তাগুতকে অস্বীকারের দাবী হচ্ছে তাগুত এবং যে ব্যক্তি তার ইবাদত করে কাফেরে পরিণত হয়েছে উভয়কেই পরিত্যাগ করতে হবে এবং উভয়ের সাথে ঈমানদারদের থাকবে দুশমনি, ঘৃণা-বিদ্বেষ।

৫। অস্বীকার করার মাধ্যমেঃ ত্বাগুতকে অস্বীকার করা। তাগুতের যারা উপাসনা করে এবং নেতৃত্বের আসনে বসায় তাদেরকে অস্বীকার করা এবং যে ব্যক্তি কুফরী মতবাদের প্রবর্তন করে অথবা কুফরীর দিকে আহবান জানায় তাকে অস্বীকার করা।

❖ প্রশ্ন-৭। ত্বাগুতকে অস্বীকার করা কেন অপরিহার্য?

উত্তরঃ- ত্বাগুতকে অস্বীকার করা অপরিহার্য কারন-

■ সালাত, যাকাত বা অন্যান্য ইবাদতের পূর্বে আল্লাহ আদম সন্তানদের আদেশ করেছেন তা হল আল্লাহ তা'য়ালা প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং ত্বাগুত কে পরিত্যাগ ও অস্বীকার করা।

■ ত্বাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হচ্ছে এই দ্বীনের মূল এবং ভিত্তি। সুতরাং তাগুতকে বর্জন না করলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী হবে অর্থহীন।

■ এই বিশ্বাসের অবর্তমানে কোন দাওয়া, জিহাদ, সালাত, সওম, যাকাত বা হজ্জ কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তিকেই জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁনো যাবে না যদি না সে এই ভিত্তির প্রতি ঈমান না এনে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

"যারা ত্বাগুতের ইবাদত হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমূখী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।" *(সূরা-যুমার:১৭)*

■ সমস্ত নাবী রাসুলদের মূল দাওয়াতই ছিল আল্লাহর ইবাদত করা এবং ত্বাগুতকে অস্বীকার করার জন্য।

❖ প্রশ্ন-৮। তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন 'ঈমান বিল্লাহ' বলতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা হচেছ আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এবং তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী (আসমা ও সিফাত) এর ক্ষেত্রে একত্বকে স্বীকার করে নেয়া এবং এমন সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর একত্বকে মেনে নেয়া যা একমাত্র তাঁরই জন্য প্রযোজ্য। (আল্লাহর প্রতি ঈমান এর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা শেষদিকে রয়েছে)

ইবাদাহ

❖ প্রশ্ন-১। ইবাদাতের সংজ্ঞা কি?

উত্তরঃ- ইবাদতের আভিধানিক অর্থ: অনুগত হওয়া, নত হওয়া, অনুসরণকরা। পারিভাষিক অর্থ: ঐ সকল কাজ যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও খুশি হন। তা প্রকাশ্যে করা হোক কিংবা গোপনে, কথায় কিংবা কাজে। অন্যভাবে বলতে গেলে ইবাদত হচ্ছে ঐ বিশ্বাস, অন্তর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের কর্ম যা আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। ইহা ছাড়া কোন কিছু সম্পাদন করা বা বর্জন করা যা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করায় তাও ইবাদাত। ইবাদাত বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে।

১. আন্তরিক ইবাদাতঃ যেমন- ঈমানের ছয়টি রুক্ন, ভয়, আশা, ভরসা, আগ্রহ, ও ভীতি ইত্যাদি।

২. প্রকাশ্য ইবাদাতঃ যেমন- নামায, যাকাত, রোযা ও হাজ্জ।

❖ প্রশ্ন-২। কিভাবে একটি কাজ ইবাদতে পরিণত হয়?

উত্তরঃ- যদি সেখানে দু'টি বিষয় উপস্থিত থাকে তবেই তা ইবাদতে পরিণত হয়ঃ

প্রথমঃ আল্লাহকে পূর্ণ ভালবাসা, যে ভিত্তির উপর ইসলামের ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো আল্লাহর মুহাব্বত। যে ইবাদতে আল্লাহর মুহাব্বত নেই সেই ইবাদতের যেন অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ সুবঃ বলেন,

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

...আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই মুহাব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য.......আর তারাই হলো মুত্তাকী। (সূরা, বাক্বারা ২ঃ১৭৭)

আল্লাহকে ভালবাসার পথ হচ্ছে তাঁর রাসুলের অনুসরণ করা, ইবাদত রাসুল (সঃ) এর অনুসরনে করা। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [آل عمران/٣١]

'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন।' (সূরা, আলে ইমরান ৩ঃ৩১)

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহর নিকট পূর্ণ বিনয়-নম্রতা ও আনুগত্য প্রকাশ করা, আশা ও ভয়ের সাথে ইবাদত করা, পূর্ণ বশ্যতা, বিনয়-নম্রতা, আশা-আকাঙ্খা ও ভয়-ভীতির সাথে পূর্ণ ভালবাসাকে ইবাদাত বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [الأعراف/٥٥]

তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা-অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। *(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত-৫৫)*

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।' (সূরা কাহাফঃ১১০)

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ} [المؤمنون: ٥٧ - ٥٩]

'নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত। যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করেনা। এবং যারা যা দান করবার তা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে যে তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। তারাই দ্রুত কল্যাণ অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী।' (সূরা মু'মিনঃ ৫৭-৫৯)

❖ প্রশ্ন-৩। ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত কি?

উত্তরঃ- ইবাদাত ততক্ষনণ পর্যন্ত গ্রহণ যোগ্য হবে না যতক্ষন না তা দু'টি শর্ত পূরন করবে, তা হচ্ছে-

১। ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করা এবং তার সাথে শির্ক না করা।

২। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে শরীয়াত নিয়ে এসেছেন তার অনুসরনে ইবাদাত করা।

প্রথমঃ সকল ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করা এবং তার সাথে শির্ক না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ [الزمر/٢]

"জেনে রাখ, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাত আল্লাহরই নিমিত্তে।" (সূরা আয্‌যুমার:২)

তিনি আরো বলেনঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة/٥]

আর তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশকরা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে (শির্‌কমুক্ত থেকে) একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে। (সূরা আল-বাইয়্যেনাহ-আয়াত- ৫)

দ্বিতীয়ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে, শরীয়াত নিয়ে এসেছেন তার অনুসরনে ইবাদাত করা।

এর অর্থ নাবী (সা:) যে কাজ যে ভাবে করেছেন সে কাজ সেই নিয়মে করা, কোন প্রকার কম বেশী না করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [آل عمران/٣١]

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভাল বাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন, আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (সূরা আলি-ইমরান, আয়াত-৩১)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر/٧]

তিনি আরো বলেনঃ আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, এবং যা থেকে বারণ করেছেন তা হতে বিরত থাক। *(সূরা আল-হাশর, আয়াত-৭)*

নবী করীম (সাঃ) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (صحيح مسلم)

'কেউ যদি এমন কাজ করে যা আমাদের এই দ্বীনে নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যান হবে।' (সহীহ মুসলিমে বর্ণিত)

❖ প্রশ্ন-৪। ইবাদতে ইহসান কি?

উত্তরঃ- ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহসান হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন আপনি তাকে দেখছেন, এরূপ না হলে অন্তত এরূপ মনে করা যে তিনি আপনাকে দেখছেন।

উমার বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্নিত, "....এরপর আগন্তুক বললেনঃ আমাকে ইহসান সম্পর্কে সংবাদ দিন। উত্তরে নবী (সা) বললেনঃ যখন তুমি ইবাদতে লিপ্ত হবে, তখন তুমি "আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ" একথা মনে মনে চিন্তা করবে, আর যদি এটা সম্ভব না হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে দেখছেন একথা মনে মনে ভাববে।" (বুখারী, মুসলিম)

❖ প্রশ্ন-৫। ইবাদত সমূহ কি কি যা আল্লাহ নির্দেশ করেছেন দলীলসহ উল্লেখ করুন?

উত্তরঃ- ইবাদতের প্রকার সমূহ যা আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশিত করেছেন তা হচ্ছেঃ

(ক) الإسلام (আল- ইসলাম)- আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করা।

(খ) الإيمان (আল-ঈমান)- বিশ্বাস স্থাপন করা।

(গ) الاحسان (আল-ইহসান)- নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন, উপকার সাধন করা।

(ঘ) الدعاء (আদ-দো'য়া) প্রার্থনা, আহবান করা।

(ঙ) الخوف (আল-খাওফ) ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা।

(চ) الرجاء (আর-রাজা) আশা-আকাংখা করা।

(ছ) التوكل (আত্-তাওয়াক্কুল) নির্ভরশীলতা, ভরসা করা।

(জ) الرغبة (আর-রাগ্‌বাহ) অনুরাগ, আগ্রহ।

(ঝ) الرهبة (আর-রাহ্‌বাহ) ভয় ভীতি।

(ঞ) الخشوع (আল-খূশূ') বিনয়-নম্রতা।

(ট) الخشية (আল-খাশিয়াত) অমংগলের আশংকা।

(ঠ) الإنابة (আল- ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা।

(ড) الاستعانة (আল-ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা।

(ঢ) الاستعاذة (আল-ইস্তে-আযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা।

(ণ) الاستغاثة (আল-ইস্তেগাসাহ) নিরুপায় ব্যক্তির বিপদ উদ্ধারের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা।

(ত) الذبح (আয্-যাবাহ) আত্মত্যাগ বা কুরবানী করা।

(থ) النذر (আন্-নযর) মান্নত করা।

এগুলি এবং অন্যান্য যে পদ্ধতি সমূহের আদেশ ও নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন সবকিছুই তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে, ফলতঃ কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোন

একটি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য সম্পাদন করে তবে সে মুশরিক ও কাফের রূপে পরিগণিত হবে।

ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে প্রমাণ হচ্ছে জিব্রীল 'আলায়হিস্ সালাম এর এই সুপ্রসিদ্ধ হাদীসঃ-

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذية وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام قال : " الإسلام : أن تشهد أن لا إلٰه إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا " . قال : صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الإيمان . قال : " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره " . قال صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " . قال : فأخبرني عن الساعة . قال : " ما المسؤول عنها بأعلم من السائل " . قال : فأخبرني عن أماراتها . قال : " أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان " . قال : ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي : " يا عمر أتدري من السائل " ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " . رواه مسلم

হযরত 'ওমর বিন খাত্তাব রাযিআল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ "একদা আমরা নবী (সা) এর নিকট বসেছিলাম এমতাবস্থায় সেখানে মিশমিশে কালকেশ, ধবধবে সাদা পোষাক পরিহিত একজন ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল। ভ্রমণের কোন নিদর্শনই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিলনা, অথচ আমরা কেউ তাকে চিনতে পারছিলামনা। অতঃপর তিনি নবী (সা) এর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর উরুদেশে রাখলেন, এরপর বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করুন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাহ বললেনঃ ১) "সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ

(ইলাহ) নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল। ২) সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ৩) যাকাত প্রদান করা। ৪) রমযানমাসে রোযাব্রত পালন করা এবং ৫) হজ্জ; পথের সম্বল হলে আল্লাহর ঘর (কবা শরীফ) যিয়ারত করা। আগন্তুক বললেনঃ আপনি ঠিক বলেছেন। তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করছেন আবার নিজেই তার সত্যায়ন করছেন এতে আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী (সা) বললেনঃ (তা হলো এই যে,) আল্লাহ, ফিরিশতাকুল, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এরপর আগন্তুক বললেনঃ আমাকে ইহসান সম্পর্কে সংবাদ দিন। উত্তরে নবী (সা) বললেনঃ যখন তুমি ইবাদতে লিপ্ত হবে, তখন তুমি "আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ" একথা মনে মনে চিন্তা করবে, আর যদি এটা সম্ভব না হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে দেখছেন একথা মনে মনে ভাববে। অতঃপর আগন্তুক বললেনঃ "আমাকে রোয কিয়ামত সম্বন্ধে অবহিত করুন" নবী (সা) বললেনঃ- এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা অধিক জানে না। এরপর আগন্তুক রোয কিয়ামতের নিদর্শন সমূহ জানতে চাইলে, নবী (সা) উত্তরে বললেনঃ যখন পরিচারিকা স্বীয় প্রভূর জন্ম দেবে, নগ্নদেহ ও নগ্ন পদ বিশিষ্ট ও জীর্ণ শীর্ণ পোষাক পরিহিত ছাগলের রাখালরা সুউচ্চ অট্টালিকায় বসবাস করবে, তখনরোয কিয়ামতের আগমন ঘটবে"। হাদীস বর্ণনাকারী বলেনঃ 'আগন্তুক পরক্ষণেই প্রস্থান করলেন, এরপর আমরা কিছুক্ষণ নীরব নিস্তদ্ধ থাকলাম। অতঃপর নবী (সা) বললেন, উনি হচ্ছেন জিব্রীল (আ), তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন'। (বুখারী এবং মুসলিম)

দোয়াঃ কেবলমাত্র তাঁর নিকটেই চাইতে হবে, অন্যের কাছে নয়। এর সমর্থনে কুরআন হতে প্রমাণঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [مومن/٦٠]

"আর তোমাদের রব বলেনঃ তোমরা সকলে আমাকেই একক ভাবে ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব, যারা অহমিকার বশে আমার বন্দেগী করা অস্বীকার করে, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায়।" [সূরা মু'মিন ৪০ঃ ৬০] হাদীস হতে প্রমাণঃ

الدعاء مخ العبادة "দো'য়া বা প্রার্থনা হচ্ছে ইবাদতের সারাংশ"। (আবু দাঊদ)

ভয় ঃ এ প্রসংগে কুরআনের ঘোষণাঃ

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [آل عمران/١٧٥]

"অতঃপর তোমরা তাদের ভয় করবে না। বরং আমাকেই ভয় করে চলবে, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন বা বিশ্বাসী হয়ে থাক।" [সূরা আলি ইমরান ৩ঃ ১৭৫]

আশাঃ এর দলীল হিসেবে কুরআনের ঘোষণাঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

"অতএব যে ব্যক্তি রবের সাক্ষাৎ লাভের আশা-আকাঙ্খা করে, সে যেন সৎ কর্মগুলো নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতে থাকে। আর নিজ রবের ইবাদতে অপর কাউকে শরীক না করে।" [সূরা কাহাফ ৫০ঃ ১১০]

নির্ভরশীলতা ঃ এ বিষয়ে কুরআনের ঘোষণাঃ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর কর, যদি তোমরা প্রকৃত পক্ষে মু'মিন হও।" [সূরা মায়িদাহ ৫ঃ ২৩]

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

"আর যে ব্যক্তি সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হয়, তার জন্য তিনিই (আল্লাহ) যথেষ্ট।" [সূরা তালাক ৬৫ঃ ৩]

আগ্রহ ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিনয়ঃ

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

"নিশ্চয়ই এরা সৎকর্মে ত্বরিত ও সদা তৎপর ছিল। আর আশা ও ভয় সহকারে আমাকে আহবান করতো এবং আমার প্রতি এরা বিনয়-নম্র।"[সূরা আম্বিয়াঃ৯০]

অমংগলের আশংকাঃ

এ ব্যাপারে কুরআন থেকে প্রমাণঃ

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [البقرة/١٥٠]

"কখনই তাদের ভয় করবেনা, একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল। যাতে করে তোমাদের প্রতি আমার নে'য়ামত সর্বতোভাবে পূর্ণ করে দিতে পারি,আর যাতে তোমরা (লক্ষ্যে পৌঁছার) সঠিকপথে পরিচালিত হতে পার।" [সূরা আল-বাকারা ২ঃ ১৫০]

নৈকট্যলাভের কামনা এবং কৃত পাপের জন্যে অনুশোচনাঃ

এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ

"আর তোমরা সকলে স্বীয় রবের পানে ফিরে এসো তোমাদের উপর আযাব সমাগত হবার পূর্বেই, এবং তাঁর নিকট পরিপূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ কর, কেননা (আযাব আসার) পর তোমরা আর সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।" [সূরা যুমার ঃ ৫৪]

সাহায্য প্রার্থনা সম্পর্কে প্রমাণঃ

{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: ٦٠]

অর্থ: আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة/٥] "(হে আমাদের রব), আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" [সূরা আল-ফাতেহা ১ঃ ৪] وإذا استعنت فاستعن بالله (سنن الترمذي) আর হাদীস শরীফে এসেছেঃ "যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই তা (বিনম্র ভাবে) চাইবে।" (আহমদ ও তিরমিযী)

আশ্রয় কামানা প্রসংগে কুরআনের ঘোষণাঃ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ [الناس/١، ٢] "বল, আমি বিশ্বমানবের প্রতিপালকের নিকট ও মানব মন্ডলীর অধিপতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" [সূরা আন-নাস ১১৪ঃ ১,২]

বিপন্ন ব্যক্তির আশ্রয় কামনাঃ

এ প্রসংগে কুরআনের ঘোষণাঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

"আরও (স্মরণ কর) যখন তোমরা (বিপন্ন অবস্থায় ছিলে) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিলে, তখন তিনিই তোমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন (উহা কবুল করলেন)।" [সূরা আনফাল ঃ ৯]

আত্মত্যাগ ও কুরবাণীঃ

এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام/١٦٢، ١٦٣]

হে রাসূল) বলে দাওঃ আমার সলাত (নামায), আমার কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মরণ উৎসর্গকৃত বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য, তাঁর কোনই শরীক নেই এবং আমি এ জন্যই আদিষ্ট হয়েছি আর মুসলিমদের (আত্বসমর্পনকারীদের)মধ্যে আমিই প্রথম (অগ্রণী)। [সূরা আন'আম:১৬২-১৬৩]

মান্নতঃ পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণঃ

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان/٧]

"তারা অংগীকার পূরণ করে আর সেদিনকে (কিয়ামত দিবসকে) ভয় করে চলে, যেদিনের বিপদ-আপদ হবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী ।" [সূরা আদ-দাহার/ ইনসান ৭৬ঃ ৭]

আশ্ শিরক

প্রশ্ন-১ । শিরক্ কি?

উত্তরঃ- শির্ক শব্দের আভিধানিক অর্থ- অংশীদারিত্ব, অংশীবাদ, মিলানো, সমকক্ষ করা, অংশীস্থির করা, সমান করা, ভাগাভাগি, সম্পৃক্ত করা ।

ইংরেজীতে Poytheism (একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস), Sharer, Partner, Associate.

শরীয়তের পরিভাষায় "যেসব গুনাবলী কেবল আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত সেসব গুনে অন্য কাউকে গুনান্বিত ভাবা বা এতে অন্য কারো অংশ আছে বলে মনে করাই শিরক্ ।"

শিরক্ হচ্ছে আল্লাহর সাথে এমন বিষয়ে সমকক্ষ স্থির করা যেটা আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য । যেমন- আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা, অন্য কারো নিকট আশা করা, আল্লাহর চাইতে অন্য কাউকে বেশী ভালবাসা, অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের কোন একটি অন্যের দিকে সম্বোধন করাকে শিরক্ বলে । তাওহীদুল্লাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত মানুষের সকল বিশ্বাস, কথা ও কাজে আল্লাহর এককত্বের উপলব্দি ও মেনে চলা । পক্ষান্তরে শিরক্ হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত ।

- ইমাম কুরতুবী বলেন, শিরক্ হল আল্লাহর নিরংকুশ প্রভূত্বে কারো অংশীদারিত্বের আক্বীদা পোষণ করা ।
- আক্বীদার পরিভাষায়, শিরক্ হচ্ছে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কোন বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা ।

শিরকের ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, এতে দু'শরীকের অংশ সমান হওয়া আবশ্যক নয় । বরং শতভাগের একভাগের অংশীদার হলেও তাকে অংশীদার

বলা হয়। তাই আল্লাহতা'য়ালার হক্বের সামান্যতম অংশ অন্যকে দিলেই তা শির্কে পরিণত হবে। এতে আল্লাহর অংশটা যতই বড় রাখা হোক না কেন।

❖ প্রশ্ন-২। শিরকের ভয়াবহতা কি?

উত্তরঃ- শির্কের পরিণাম ভয়াবহ। এটি মানুষের চুড়ান্ত ধ্বংস ডেকে আনে। আল কোরআন ও সহীহ হাদীস থেকে এর ভয়াবহতার স্বরূপ তুলে ধরা হল-

১। শিরক্ সবচেয়ে বড় অপরাধ-বড় গুনাহ।

আল্লাহ বলেছেন-

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان/١٣]

আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম। (সূরা লুক্মান:১৩)

سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الذنب عند الله أكبر ؟ قال (أن تجعل لله ندا وهو خلقك(صحيح البخاري)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রাসুল সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি?" রাসুল (সঃ) বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা, অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" *(সহীহ বুখারী, মুসলিম)*

২। শিরক্বের অপরাধ/ গুনাহ আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا [النساء/٤٨]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। এটি ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং কেহ আল্লাহর শরীক্ করলে সে এক মহাপাপ আরোপ করে।" *(সুরা, নিসা-৪ঃ৪৮)*

إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب قالوا يا رسول الله وما الحجاب قال أن تموت النفس وهي مشركة

জাবির বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেছেন- "বান্দার জন্য সর্বদাই ক্ষমা রয়েছে যতক্ষন পর্যন্ত হিযাব বা পর্দা পতিত না হয়।" বলা হলো, "হে আল্লাহর রাসুল! হিযাব বা পর্দা কি?" তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক্ করা।" (মুসনাদে আহমদ, ইবনু কাছীর ১ম খন্ড ৬৭৮পৃঃ)

৩। শিরক্ করলে জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ [المائدة/٧٢]

"হে বনী ইসরাইল! তোমরা আমার রব এবং তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর। কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।" *(সূরা, মায়েদা-৫ঃ৭২)*

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ (صحيح مسلم)

রাসুল (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক্ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে যাবে।" *(মুসলিম)*

৪। শিরক্ করলে সব আমল বাতিল হয়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الزمر/٦٥]

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই ওহী হয়েছে তুমি আল্লাহর সাথে শরীক্ করলে তোমার আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" *(সূরা যুমার, ৩৯ঃ৬৫)*

সূরা আন'আমের ৮৩-৮৭ আয়াতে আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়লা ১৮ জন নবীর নাম নিয়ে তাদের ব্যাপারে বলেছেন-

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام/٨٨]

"এটি আল্লাহর হেদায়েত, নিজ বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এটি দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। তারা যদি শিরক্ করতো তবে তাদের কৃতকর্ম নিস্ফল হত।" *(সূরা, আন'আম-৬ঃ৮৮)*

৫। শিরক্কারী ধ্বংসে এবং বিপর্যয়ে পতিত হয়।

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ [الحج/٣١]

"যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।" *(সূরা, হাজ্জ ২২ঃ৩১)*

নবী (সঃ) বলেন-

اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال (الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

“আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে বেঁচে থাকবে।” সাহাবাগণ বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল সেগুলো কি?” রাসুল (সঃ) বলেলেন, “আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং যাদু---------- ।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

৬। শিরক্‌কারী মুশরিক, অপবিত্র-তার জন্য দোয়া করা যাবে না, এরা সৃষ্টির অধম। আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [التوبة/٢٨]

“নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র।” (সূরা, তাওবাহ-৯ঃ২৮)

আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة/١١٣]

“আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নাবী ও মু'মিনদের সংগত নয়, এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী।” *(সূরা, তাওবাহ ৯ঃ১১৩)* আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা আরও বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ [البينة/٦]

“আহলে কিতাব ও মুশরিক কাফেররা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।” *(সূরা, বাইয়্যেনাহ ৯৮ঃ৬)*

❖ প্রশ্ন-৩। শিরক্‌ না করতে আমাদের প্রতি নির্দেশ কি?

উত্তরঃ- আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেনঃ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا [النساء/٣٦]

“আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।” *(সূরা, নিসা-৪ঃ৩৬)*

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف/١١٠]

“বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি এই ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।” (সূরা-কাহফ-১৮ঃ১১০)

আল্লাহতা'য়ালা আরও বলেনঃ

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [يونس/١٠٥]

"আর উহা এই যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হইও না।" *(সূরা, ইউনুস ১০ঃ১০৫)*

মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেছেনঃ لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت "আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক্ করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা পুড়িয়ে মারা হয়।" *(মুসনাদে আহমাদ)*

প্রশ্ন-৪। শিরকের ক্ষতিকর দিক ও বিপদসমূহ কি কি?

উত্তরঃ- শির্কে অনেক অনিষ্টকর দিক আছে, ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে তার বিশেষত্বগুলোঃ

- শির্ক মানবতার জন্য অবমাননাকর মানুষের সম্মানকে ধূলায় লুণ্ঠিত করে ও তার সামর্থ্যকে নিচু করে দেয়।
- শির্কের কারণে সমস্ত আজেবাজে কুসংস্কার ও বাতিল মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে ।
- শির্ক সবচেয়ে বড় যুলুম।
- শির্ক হচ্ছে সমস্ত কল্পনা ও ভয়ের মূল কারণ, যার মাথায় কুসংস্কার বাসা বাঁধতে শুরু করে এবং সমস্ত আজেবাজে কথা ও কাজকে গ্রহণ করতে থাকে, ফলে সমস্ত দিক হতেই সে ভয় পেতে শুরু করে।
- শির্কের কারণে নেক আমলগুলো নষ্ট হয়ে যায়।
- শির্ক উম্মতকে টুকরো টুকরো করে দেয়।

❖ প্রশ্ন-৫। শির্ক না করার ফযীলত কি?

উত্তরঃ- আল্লাহ সুবতানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেনঃ

الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।" (সূরা আন'আম: ৮২)

عن معاذ رضي الله عنه قال : كنت ردف النبي صلى الله عليه و سلم على حمار يقال له عفير فقال (يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله) . قلت الله ورسوله أعلم قال (فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا

মুয়ায (রাঃ) থেকে বর্নিত তিনি বলেন- আমি উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে নাবী (সঃ) এর পেছনে বসেছিলাম। নাবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি কি জান বান্দার নিকট আল্লাহর হক্ কি?" আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ "বান্দাহর নিকট আল্লাহর হক্ হল বান্দাহ তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর বান্দাহর নিকট আল্লাহর অধিকার হলো তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদান করবেন না।" (বুখারী হা/২৬৪৬)

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (آتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة) . قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال (وإن زنى وإن سرق

আবু যর (রাঃ) নাবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নাবী (সঃ) বলেন- "জিব্রাঈল এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আল্লাহর সাথে শরীক্ স্থাপন না করে যে ব্যক্তি মারা যায় সে জান্নাত লাভ করবে।" আবু যর বললেন, যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও কি? নাবী (সঃ) বললেন, "হ্যাঁ যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও"। (বুখারী হা/৯৬৯৬, মুসলিম হা/১৮০)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ « مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি নাবী (সঃ) এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, জান্নাত এবং জাহান্নাম ওয়াজিব কারী বস্তু দু'টি কি কি? তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানিয়ে মারা গেল সে জাহান্নামী।" (মুসলিম হা/১৭৭)

عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة

আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) বলেছেন যে- "আল্লাহতা'য়ালা বলেছেন: হে আদম সন্তান তোমরা যদি আমার সাথে অংশীস্থাপন না করে দুনিয়াভরা অপরাধ (গুনাহ) নিয়েও আমার সাথে স্বাক্ষাত কর, তবে আমি দুনিয়া ভরা ক্ষমা নিয়ে তোমাদের নিকট উপস্থিত হব।" (তিরমিজী, মেশকাত, বা'বুল ইস্তেগফার)

❖ প্রশ্ন-৬। শিরকের কারনগুলো কি কি?

উত্তরঃ- কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে আমরা এখানে শির্‌কের ৪ টি কারণ উপস্থাপন করছি, যেন সকলে এগুলো জেনে শির্‌ক থেকে বেঁচে থাকতে পারে-

১। আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা ও খারাপ মনেবৃত্তি পোষণ করাঃ

মন্দ ধারণাই শিরকের নেপথ্য কারণ। যে কোন শিরকের পেছনে আল্লাহ সম্পর্কে কোন না কোন দোষ-ত্রুটি ও মন্দ ধারণা কাজ করে। আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (٨٥) أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (٨٦) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٧ [الصافات/٨٥-٨٧]

"তোমরা কিসের পুজা করছ? তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা অলীক মা'বুদগুলোকে চাও? তাহলে বিশ্ব জাহানের রব সমন্ধে তোমাদের কি ধারণা?" (সূরা- সাফফাত ৩৭ঃ৮৫-৮৭)

২। সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করাঃ আল্লাহর সাথে শিরকের অন্যতম কারণ হচ্ছে, সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করা।

৩। আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা না দেয়াঃ শিরক মানে আল্লাহর সমস্ত মর্যাদাকে অস্বীকার করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [الزمر/٦٧]

"তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমন্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র মহান তিনি। তারা যাকে শরীক করে তিনি তাঁর উর্দ্ধে।" (সূরা যূমার: ৬৭)

৪। আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মুর্খতাঃ শিরকের কারণ সমূহের মধ্যে এটি হল জননী বা মাতৃ কারণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ [الزمر/٦٤]

"বলুন, হে মূর্খরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছ?" (সূরা, যুমার-৩৯ঃ৬৪)

❖ প্রশ্ন-৭ । সাধারন ও বিস্তৃত অর্থে শিরক্ কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ- সাধারন এবং বিস্তৃত অর্থে শিরক্ তিন প্রকারঃ

১ । **শিরক্ ফিররুবুবিয়্যাহঃ** শিরক্ ফিররুবুবিয়্যাহ হচ্ছে আল্লাহর কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্বে কাউকে তার সমকক্ষ করা । এই প্রকারের প্রচলিত শিরকগুলো হচেছ- আল্লাহ ছাড়া কাউকে আইন বিধান দাতা হিসেবে মানা, গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটদানের মাধ্যমে কাউকে আইন বিধানদাতা নির্বাচন করা, যাদু, তাবিজ-কবজ, শুভ-অশুভ সংকেত গ্রহন, কাউকে কল্যান-অকল্যানের মালিক, বিপদ রোগ-শোক থেকে মুক্তিদাতা, সন্তান দিতে পারে বলে মনে করা, আল্লাহর স্ত্রী বা সন্তান আছে বলে মনে করা ইত্যাদি ।

২ । **শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাতঃ** তা হচ্ছে আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীর ক্ষেত্রে শিরক্ করা । আল্লাহর গুনাবলীর সাথে সৃষ্টির গুনাবলীর তুলনা করা , যেমন একথা বলা যে আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মত । তাছাড়া আল্লাহর গুন ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির আছে বলে বিশ্বাস করা । যেমন ভাগ্য গননা, রাশিচক্রে বিশ্বাস, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইলমুল গায়েব বা অদৃশ্য জানে বলে বিশ্বাস করা ।

৩ । **শিরক্ ফিল উলুহিয়্যাহ বা শিরক্ ফিল ইবাদাহঃ** তা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা । যেমন- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দোয়া করা, সিজদা করা, অন্যের নামে নজর মানা, অন্যকে আল্লাহর মত ভয় করা, ভালবাসা, আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনের কাছে বিচার চাওয়া ইত্যাদি ।

❖ প্রশ্ন-৮ । নির্দিষ্ট বা খাছ অর্থে শিরক্ কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ- খাছ বা নির্দিষ্ট অর্থে শিরক্, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে গায়রুল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে শিরক্ করা । কুরআন-সুন্নাহতে এবং সালফে সালেহীনগনও বক্তেব্যের মধ্যে শিরকের এ অর্থটিই উদ্দেশ্য করে থাকেন । শিরক্ বলতে তারা সাধারনত ইবাদতে শিরককেই বুঝান । এই অর্থে শিরক তিন প্রকার-

১ । আশ-শিরক্ আল আকবার বা বড় শির্ক ।

এর অর্থ হল- আল্লাহর কোন সমকক্ষ স্থির করে আল্লাহর মত তার ইবাদত করা ও আনুগত্য করা । এই শিরক্ যে কাউকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বেবর করে দেয় ।

২. **আশ- শিরক্ আল আসগার বা ছোট শিরক্** । আর তা হচ্ছে আমলের কাঠামো ও মুখের কথায় গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ করা । অথবা কথায় ও

কাজে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহর মনতুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা। এই শিরক্ অনেক বড় কবীরাহ গুনাহ, কিন্তু এটি মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না।

৩. আশ্-শিরক্ আল খফী বা গোপন শিরক্। আর তা হচ্ছে- হৃদয়ের এমন গোপন ইচ্ছা ও মুখের এমন অসতর্কমূলক কথা যাতে আল্লাহও গায়রুল্লাহর সমান হয়ে যায়। এটি কখনও বড় শিরক্ আবার কখনও ছোট শিরক্ হতে পারে।

উপরোক্ত তিন প্রকার শিরক্ আবার অনেক প্রকারে বিভক্ত।

❖ প্রশ্ন-৯। শিরক আল আকবার বা বড় শিরক কয় প্রকার ও কি কি? এ ব্যাপারে প্রচলিত শিরকগুলো কি কি?

উত্তরঃ- শিরক আল আকবার বা বড় শির্ক চার প্রকার-

প্রথম প্রকার ঃ الشرك في الدعوة শিরক্ ফিদ্-দাওয়াত বা আহবানে শির্ক ঃ

আল্লাহকে ডাকার মত গায়রুল্লাহকে ডাকা। সে ডাক কোন প্রাপ্তি বা মুক্তির জন্য হোক কিংবা শুধু ইবাদত বা বিনয় প্রকাশার্থে হোক। এ দোয়া তিনটি শর্তে শিরক্ হবে- ক) রূপক কোন অর্থ উদ্দেশ্য না করে বাস্তব অর্থে ডাকলে। খ) প্রার্থিত বিষয়টি আল্লাহ ছাড়া আর কারও অধিকারে না থাকলে। গ) প্রার্থনাকারী প্রার্থিত ব্যক্তির সামনে উপস্থিত না থাকলে অথবা মৃত হলে। যেমন-

* জীবিত পীর, খাজা, গাউস-কুতুবের কাছে সন্তান, রোগ নিরাময়, ব্যবসায় উন্নতি, বিপদ হতে পরিত্রান ও পরলৌকিক সুপারিশ ও মুক্তির প্রার্থনা করা।

* কোন মৃত, কবরস্থ কিংবা অনুপস্থিত পীর দরবেশের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা। এর প্রমান আল্লাহ (সুবঃ) বলেন

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ [العنكبوت/٦٥]

"যখন তারা নৌকায় আরোহন করে তখন একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন, তাদের মুক্তি দিয়ে ডাঙ্গায় নিয়ে যান তখনই তারা শিরক করে ।" (সূরা আন-কাবুত ঃ৬৫)

দ্বিতীয় প্রকার ঃ الشرك في الارادة শিরক্ ফিল ইরাদাহ বা নীয়্যাত, ইচ্ছা ও সংকল্পে শিরক ঃ নিজের আমল দ্বারা সংক্ষেপে ও সবিস্তারে গায়ল্লাহকে উদ্দেশ্য করা। এ শিরক্ আক্বীদাহ বিশ্বাসের মাঝে বিরাজ করে। আল্লামা ইবুনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন- এ শিরক্ হচ্ছে এমন এক সাগর যার কোন কুল কিনারা নেই। অনেক অল্প মানুষই এ থেকে পরিত্রান পেয়ে থাকে। যে ব্যক্তি নিজ

আমলের দ্বারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নৈকট্য কামনা করবে, তার কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করবে অথবা শুধু পার্থিব কল্যানের উদ্দেশ্যেই আমল করবে সে ব্যক্তি ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যেও ক্ষেত্রে শিরকে লিপ্ত হবে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود/١٥، ١٦]

"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদেরকে পুরোপুরিভাবে তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ কারিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হ'ল সেসব লোক আখিরাতে যাদের জন্যে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ হয়ে গেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল সবই বাত্বিল বলে গণ্য।" (সূরা হূদ ঃ ১৫-১৬)

তৃতীয় প্রকার ঃ الشرك في الطاعة শিরক্ আত তা'আ বা আনুগত্যের শিরক ঃ

হুকুম বা বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ বিধান প্রনয়ন বা হুকুম প্রদান করা আল্লাহর হক বা অধিকার সমূহের অন্তর্ভূক্ত। * কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী মানব রচিত আইনের আনুগত্য উপরোক্ত প্রকারের শিরকে আকবারের অন্তর্ভূক্ত। * সুফীবাদের শিরকযুক্ত তরীকাহ সমূহে কুরআন-সুন্নাহর দলীল প্রমান ব্যতীত পীরের সমস্ত কথাকে মেনে নেয়াকে অপরিহার্য করা হয়। এসবগুলোই শিরকের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহর বানীঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ [التوبة/٣١]

"তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার বিরাগী আলেমদিগকে তাদের প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্র সমীহকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল মাত্র একজন উপাস্যের (আল্লাহর) ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তারা যার সাথে তার শরীক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।" (সূরা তাওবাহ ঃ৩১)

চতুর্থ প্রকার ঃ الشرك في المحبة মুহাব্বত বা ভালবাসার শির্ক ঃ

আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে এমনভাবে ভালবাসা যে বান্দাহ গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর) সামনে বিনীত বিগলিত ও তার দাস হয়ে যায়, চাই

সে ভালবাসা আল্লাহর ভালবাসার সমান হোক বা কম বেশী হোক। শিরক্ আল মুহাব্বার উদাহরন হল- * মূর্তিপুজারী সম্প্রদায় কর্তৃক তাদের বিভিন্ন মূর্তির প্রতি ভালবাসা। * কিছু নামধারী মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক গাউস,কুতুব, পীর ফকির, খাজা, দরগাহ- মাজার ইত্যাদির প্রতি ভালবাসা। * অপর কিছু সম্প্রদায় কর্তৃক আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির প্রতি অন্ধ ভালবাসা। * তরুন-তরুণী সম্প্রদায় কর্তৃক গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকা, শিল্পীদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা। * পার্থিব জীবন, বিত্য-বৈভব, ভোগ-বিলাসের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা, যা আল্লাহ ও পরকালকে ভুলিয়ে দেয়। তাও এ শিরকের অন্তর্ভূক্ত। নবী (স) বলেন- "ধ্বংস হোক স্বর্ন মুদ্রার দাস, ধ্বংস হোক রৌপ্য মুদ্রার দাস। আল্লাহ সুবঃ বলেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ [البقرة/١٦٥]

"মানুষের মধ্যে কিছ মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) সমকক্ষ বলে ধারণ করে তারা তাদেরকে আল্লাহর ভালবাসার মতোই ভালবাসে।" (সূরা বাকারাহ ঃ১৬৫)

❖ প্রশ্ন-১০। শিরক্ আল আসগার বা ছোট শিরক কয় প্রকার ও কি কি? এ ব্যাপারে প্রচলিত শিরকগুলো কি কি?

উত্তরঃ- শিরকে আসগার বা ছোট শিরককে নিন্মোক্ত প্রকার সমূহে সীমাবদ্ধ করা যায়।

১. কথাগত ছোট শিরক্। যা মুখের কথার দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে। যেমন- গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর) নামে শপথ করা, আপনি চাইলে আর আল্লাহ চাইলে এ কাজটি হবে, আমি আল্লাহ এবং আপনার উপর ভরসা করছি, আমি আল্লাহ এবং আপনার হেফাজতে রয়েছি, আল্লাহ আর আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, এটি আল্লাহ এবং আপনার দান, আমি আল্লাহ আর আপনার উপর ভরসা করছি, কুকুরটি না হলে আজ ঘরে চোর ঢুকত, মাঝি বড় দক্ষ ছিল তাই আজ জীবন রক্ষা পেল, ড্রাইভারের দক্ষতায় বাসটি রক্ষা পেল, যেমন সার দিয়েছি তেমন ধান হয়েছে ইত্যাদি।

وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمثلان ؟ قل ما شاء الله ثم شئت

সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- "একদা এক ব্যক্তি নবী (স) কে বলল- আল্লাহ যা চেয়েছেন আর আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে), রাসুল (স) তাকে বললেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ করলে? বল! আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে।" (নাসাঈ, হাদীসটি বিশুদ্ধ)

২. কার্যগত ছোট শিরক্‌। অর্থাৎ এমন ছোট শিরক্‌ যা কর্মের দ্বারা সংহঠিত হয়। যেমন-যাত্রাকালে ঘরের দুয়ারে ভিখারী দেখে তাকে কুলক্ষন মনে করা, কাক মাথার উপর উড়ে যাওয়াকে কোন অকল্যানের পূর্বাভাস মনে করা, হুতুম পেঁচার ডাককে কোন বিপদ বা মৃত্যূর দুঃসংবাদ মনে করা, ভাগ্য গননার উদ্দেশ্যে গনকের কাছে যাওয়া, চোর ধরার জন্য বাটি, লাঠি ও বাঁশ চালান দেয়া, হারানো বস্তুর সন্ধান লাভে মাটিতে রেখা অংকন, আয়না ও তৈল পড়াতে বিশ্বাস করা, চোর সনাক্ত করার জন্য রুটি পড়া খাওয়ানো, হারানো বস্তুর সন্ধান লাভের জন্য পীর-ফকির,দরবেশ, জ্বীন ও খনারের কাছে যাওয়া- এ ধরণের আরো অন্যান্য প্রচলিত কার্যাবলী শিরকের অন্তর্ভূক্ত। রাসুল (স) বলেন-

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ) من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته من دبرها فقد كفر مما أنزل على محمد

"যে কুলক্ষন গ্রহন করল সে শিরক্‌ করল।" তিনি আরো বলেন- " যে গনেকের কাছে গিয়ে তার কথায় বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মদ (স) উপর যা অবতীর্ন হয়েছে তার সাথে কুফর করল।" (আহমাদ, মুসলিম)

৩. হৃদয়গত শিরক্‌। যেমন- লৌকিকতা, সুনাম ও যশ লাভের আশা, কোন আমল করে তার দ্বারা শুধু দুনিয়া কামনা করা। যথাঃ- *বুজুর্গী প্রকাশের উদ্দেশ্যে সক্ষম হওয়া সত্বেও দূর্বল ভঙ্গীমায় চলা, লম্বা তাসবীহ সারা দিন হাতে রাখা, তালিওয়ালা ও ছেড়া-ফাড়া পোশাক পরিধান করা। * ক্রেতার কছে বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রমান করার জন্যে দোকানে বসে উচ্চসওে সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ ইত্যাদি ঘন ঘন পাঠ করা। নবী (স) বলেন-

: من صام رياء فقد أشرك، ومن تصدق رياء فقد أشرك، ومن صلى رياء فقد أشرك.الي اخر الحديث

"যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে সলাত পড়ল সে শিরক করল, যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার জন্য সিয়াম পালন করল সে শিরক্‌ করল, আর আল্লাহ আয্‌যা ও জাল্লা বলেন- যে আমার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করেছে আমি তার জন্য সর্বোত্তম শরীক, কেননা তার আমলের স্বল্প বিস্তর সবটাই তার ঐ শরীকের জন্য যাকে সে শরীক করেছে। আমি তার থেকে অভাব মুক্ত। (আহমাদ)

❖ প্রশ্ন-১১। الشرك الخفي আশ্-শিরক্ আল খফী বা গোপন শিরক্ বলতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ- গোপন শিরক হচ্ছে হৃদয়ের এমন ইচ্ছা বা মুখের এমন কথা যাতে আল্লাহ ও গায়রুল্লাহ সমান হয়ে যায়। অথচ সে ইচ্ছা বা কথা এমন সংগোপনে বিরাজ করে যে, তাকে সহজে শিরক্ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। এ শিরক্ কখনো শিরকে আকবার আবার কখনো শিরকে আসগার হয়ে থাকে। গোপনীয়তার কারণে এ শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি সঠিকভাবে তা নির্ণয় করতে পারে না। তাই বড় শিরক্ হওয়া সত্ত্বেও তাকে ছোট শিরক মনে করে। আবার ছোট শিরক্ হওয় সত্ত্বেও তাকে বড় শিরক্ মনে করে।

বস্তুতপক্ষে এ প্রকারটি শিরকে আকবার ও শিরকে আসগারের মধ্যে দোদুল্যমান একটি প্রকার। যা গোপন দুর্বোধ্য, অতি সংগোপনে অতি সন্তপর্নে ইচ্ছা ও কথার মধ্যে মিশে থাকে। এ প্রকারের শিরক্ সম্পর্কে রাসুল (সঃ) বলেছেন- الشرك أخفي من دبيب النمل علي صفاء سوداء 'শিরক্ কঠিন কালো পাথরের উপর কালো পিপড়ার গুটি গুটি পায়ে চলার চেয়েও সুক্ষ্ম ও গোপন।" (আশ্ শিরকু ওয়া মাজাহিরুহু-৬৩)।

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস- তিনি বলেন- রাসুল (স) বের হলেন অতঃপর বললেন-

أيها الناس اتقوا الشرك الخفي الشرك الخفى أن يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل

"হে লোকসকল! তোমরা গোপন শিরক্ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর। তারা বললেন- হে আল্লাহর রাসুল! গোপন শিরক্ কি? তিনি বললেন- কোন ব্যক্তি সলাত আদায় করার জন্য দাড়াল, অতঃপর পরিশ্রম করে সলাতকে সুন্দর করে আদায় করে, কেননা সে দেখেছে মানুষ তার প্রতি লক্ষ্য করছে। এটাই হল গোপন শিরক্।

আর-রিয়াঃ গোপন শিরক্

❖ প্রশ্ন-১ । আর রিয়া কি?

উত্তরঃ- রিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ দেখানো, অবলোকন করানো, দৃশ্যমান করা। শরীয়ার পরভাষায় রিয়া হচ্ছে "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন আমল করার অভিনয় করা অথচ নিয়্যত থাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টি অর্জন করা।" হতে পারে নিয়্যতটি সম্পূর্ণ মিথ্যা নিয়্যত যেথায় যে ব্যক্তি আমলটি করছে তার আল্লাহর (সুবঃ) ব্যপারে কোন চেতনা নাই, অথবা হতে পারে এটা আংশিকভাবে মিথ্যা নিয়্যত, যেথায় ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্ আছে কিন্তু এই সময়ে অন্য মানুষের প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছা করে।এই সংজ্ঞা হতে দেখা যায় রিয়া অন্তরে সৃষ্টি হয়।

❖ প্রশ্ন-২ । আমলের ক্ষেত্রে নিয়্যাতের গুরুত্ব কি?

উত্তরঃ- উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

انماالأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

"সমস্ত কর্মকান্ডই নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকের জন্য তাই হবে, যার সে নিয়্যাত করেছে। " (সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, "ইসলামের ভিত্তি তিনটি হাদীসের উপর দাঁড়িয়ে আছেঃ উমর (রাঃ)-এর হাদীস, "নিয়্যাত অনুযায়ী আমল (উপরে উল্লেখিত): নু'মান ইবন বশীরের হাদীসঃ "হালাল স্পষ্ট এবং হারাম স্পষ্ট----" এবং আয়িশা (রাঃ) হাদিসঃ "যে কেউ আমাদের ব্যাপারে (ইসলাম) নতুন কিছু প্রচলিত করে যা এর সংশ্লিষ্ট নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"

প্রত্যেক ব্যক্তি তাই অর্জন করবে যা সে নিয়্যাত করেছে। তার পুরস্কার অর্জন নির্ভর করে, সে যা নিয়্যাত করেছে তার উপর। এক্ষেত্রে যদি নিয়্যাতটি ভাল কাজের জন্য হয়, কিন্তু একজন গ্রহণযোগ্য ওজরের কারণে কাজটি প্রতিপাদন করতে সমর্থ হলো না, ব্যক্তিটি অবশ্যই কাজটির কল্যাণ অর্জন করবে। অপরদিকে কেউ যদি আমল করে আল্লাহর পাশাপাশি অন্যের সন্তুষ্টি বা প্রশংসা চায় তাহলে সে পুরষ্কারের পরিবর্তে শাস্তিযোগ্য হবে।

❖ প্রশ্ন-৩ । রিয়ার ভয়াবহতার ব্যাপারে রাসুল (সঃ) আমাদেরকে কেমনভাবে সতর্ক করেছন?

উত্তরঃ- রিয়ার ক্ষতি সমূহ অনেক সুতরাং নবী (সাঃ) উম্মাহর প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং উদ্বেগের কারণে, অন্য কিছুর চেয়ে এর ভয়াবহতাকে বেশী ভয় করেছেন। মাহ্‌মুদ ইবন লাবীদ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء

"তোমারেদ জন্য যে বিষয়টিকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাই তা হলো ছোট শিরকঃ রিয়া।" (মুসনাদে আহ্‌মাদ, এবং বর্ণনা করেছেন আল-বাঘাউয়ী তাঁর শরাহ আস সুন্নাহতে এবং সালীম আল-হিলালী বলেন এর রাবীর সূত্র সহীহ)

অন্য হাদীসে নবী (সাঃ) দেখিয়েছেন যে, তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য দাজ্জালের ফিৎনা থেকে রিয়ার ক্ষতিকেই বেশী করেছেন। আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের নিকট অসলেন যখন আমরা দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম এবং বললেন,

ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال الشرك الخفى أن يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل(مسند احمد)

"আমি কি তোমাদেরকে ঐ বিষয়টা জানাব না যাকে আমি তোমাদের জন্য ভয় করি, এমনকি দাজ্জালের ফিৎনা থেকেও অধিক? এটা হলো লুকানো শিরক। এক ব্যক্তি সালাতের জন্য দাঁড়ায় এবং তার সালাত সুন্দর করে কারণ সে মনে করে লোকজন তাকে দেখছে।"

❖ প্রশ্ন-৪। রিয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো কি কি?

উত্তরঃ- রিয়ার কিছু ক্ষতিকর দিকসমূহ আলোচনা করা হলোঃ

১। **ঈমান এবং তাওহীদ দূর্বল করেঃ** রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে, তদবধি সত্যিকারভাবে আল্লাহর (সুবঃ) ইবাদতের পরিবর্তে সে আল্লাহর (সুবঃ) ইবাদতের ভান করে।

২। **ছোট আকারের শির্কঃ** নবী (সাঃ) বলেন,

الشرك الخفى أن يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل(احمد)

"লুক্কায়িত শিরক হলো এক ব্যক্তি সালাতে দাঁড়ায় এবং সে তার সালাতকে সুন্দর করে কারণ সে দেখছে যে লোকজন তাকে লক্ষ্য করছে।" (মুসনাদে আহমদ)

৩। **পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পায়ঃ** কোন সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তিটি যে রিয়া সম্পাদন করে তার অন্তরে রোগ আছে এবং যদি এই রোগ থেকে আরোগ্য না হয়, তাহলে এটা পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করবে।

৪। **কল্যাণ মূলক কাজ থেকে বঞ্চিত হওয়াঃ** আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "গৌরবান্বিত এবং সর্বোৎকৃষ্ট, আল্লাহ্ বলেন,

قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه(مسلم)

"আমি সকল অংশীদার থেকে নিজেই সম্পূর্ণ যথেষ্ট, যদিও আমার কোনও অংশীদারের প্রয়োজন নেই। সেহেতু, সে যে কোন কাজ করে অন্য কারও উদ্দেশ্য, আমার পাশাপাশি, আমি তাকে ত্যাগ করব, যে কেউ আমার সাথে অংশীদারিত্ব করে।"

৫। **আল্লাহ্ কর্তৃক অবমাননা/ লাঞ্চনাঃ**

وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من سمع الناس بعمله سمع الله به أسامع خلقه وحقره وصغره " . رواه البيهقي في " شعب الإيمان

আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি।" যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করে, আল্লাহ্ (সুবঃ) বিচার দিবসে তাঁর সকল সৃষ্টি লোকের সম্মুখে তাকে হীন ও অপদস্থ করবেন।" (বাইহাক্বী)

৬। **জাহান্নামের আগুনে প্রবেশের জন্য প্রথম কারণঃ**

সাহীহ্ হাদীসে বর্নিত হয়েছে কিয়ামতের দিন

إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها ؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها ؟ قال ما تركت من

سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: ক্বিয়ামাতের দিন প্রথম এক শহীদ ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা দেয়া হবে। হাশরের ময়দানে তাকে পেশ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দেয়া তার সকল নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। তার এসব নি'য়ামতের কথা স্মরণ হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বললেন, তুমি এসব নি'য়ামত পাবার পর তার কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কী কী কাজ করেছ? সে উত্তরে বলবে আমি তোমার রাস্তায় (কাফিরদের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছি, এমনকি আমাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি লড়েছো তোমাকে বীর বাহাদুর বলার জন্য। তা বলা হয়েছে (তাই তোমার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে)। তখন তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি যে জ্ঞানার্জন করেছে, অন্যকে জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছে, কুরআন পড়েছে, তাকে উপস্থিত করা হবে। তাকে দেয়া সব নি'য়ামত তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। এসব নি'য়ামত তার স্মরণ হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এসব নি'য়ামতের তুমি কি শোকর আদায় করেছ? সে উত্তরে বল্‌বে আমি 'ইলম অর্জন করেছি, মানুষকে ইলম শিক্ষা দিয়েছি, তোমার জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তোমাকে "আলিম বলা হবে, ক্বারী বলা হবে, তাই তুমি এসব কাজ করেছ"। তোমাকে দুনিয়ায় এসব বলা হয়েছে। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং মুখের উপর উপুড় করে টেনে হেচঁড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন ধরনের মাল দিয়ে সম্পদশালী করেছেন। তাকেও আল্লাহর সামনে আনা হবে। আল্লাহ তাকে দেয়া সব নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। এসব তারও মনে পড়ে যাবে। আল্লাহ তাকে এবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব নি'য়ামতের শুকরিয়া কি আমাল দিয়ে আদায় করেছ? সে ব্যক্তি উত্তরে বলবে, আমি এমন কোন খাতে খরচ করা বাকী রাখিনি যে খাতে খরচ করাকে তুমি পছন্দ কর। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি খরচ করেছ মানুষ তোমাকে দানবীর বলার জন্য । সে খিতাব তুমি পেয়ে গেছো দুনিয়ায়। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এ্বং তাকে উপুড় করে টে্নে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

৭। **আল্লাহকে (সুবঃ) সিজদা করতে অক্ষমঃ** লাঞ্ছনার অন্য একরূপে, যারা লোক দেখানো ইবাদত করে, আল্লাহ (সুবঃ) তাদের তাঁকে সিজদা করা থেকে বিরত রাখবেন যখন তারা তা করতে চাবে। এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ হাদীস আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا (صحيح البخاري)

অর্থ:- তিনি বলেন আমি আল্লাহর নবী (সাঃ) -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যখন তার পেণ্ডুলিকে প্রকাশ করবেন তখন সকল মু'মিন পুরুষ ও মহিলারা আল্লাহকে সিজদা করবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ব্যতিত যে দুনিয়াতে সিজদা করত মানুষদের দেখানোর জন্য। অতপর সে সিজদা করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তার পিঠ শক্ত তখতার ন্যায় হয়ে যাবে। (বুখারী ৪৯১৯)

৮। **অভিশপ্ত কাজঃ**, আল্লাহর (সুবঃ) রাসূল (সাঃ) বলেন-

إذا تزين الرجل لعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السماوات والأرضين

"যে ব্যক্তি পরলৌকিক আমলের ভূষনে ভূষিত হয় অথচ পরলৌকিক কল্যাণ তার অভিষ্ট নয় বা পরকাল সে চায়ও না, আসমানে ও যমীনে তাকে অভিসম্পাদ করা হয়।" (মু'জামূল আউসাতঃ ৪৭৭৬)

❖ প্রশ্ন-৫। রিয়ার কারণ কি?

উত্তরঃ- রিয়ার প্রাথমিক কারণ হলো ঈমানের দূর্বলতা। এই ঈমানের দূর্বলতা একজন ব্যক্তিকে পরকালের কল্যাণ ও পুরস্কারের
প্রতি অজ্ঞ করে তোলে এবং দুনিয়ার যশ ও সম্মান পাওয়ার ইচ্ছাকে বৃদ্ধি করে এই ইচ্ছার কারণে একজন ব্যক্তি রিয়ার পর্যবশিত হয়। তিনটি লক্ষণ দ্বারা রিয়াকে চিহ্নিত করা যায়। এবং এই লক্ষণগুলোকে এড়িয়ে চলা একজন ঈমানদারের জন্য অতীব জরুরী।

১) **প্রশংসার প্রতি ভালবাসাঃ** প্রথম তিন ব্যক্তি যারা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে; ঐ আলেম ব্যক্তি, ঐ শহীদ এবং ঐ ব্যক্তি যে সম্পদ দান করেছে। এই তিন ব্যক্তি সকলেই আল্লাহ (সুবঃ)-র সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের প্রসংশাকে কামনা করেছিল। যে ব্যক্তি মানুষকে প্রসংশা কামনা করে সে অবশ্যই মনে মনে নিজেকে নিয়ে গর্বিত হয়। এই জন্য যে, সে মনে করে সে এই প্রসংশা পাওয়ার যোগ্য।

২) সমালোচনার ভয়ঃ যে ইসলামের আদেশ মান্য করে, আল্লাহর (সুবঃ) জন্য নয়, বরং সমালোচনার ভয়ে। কারণ- সে ভয় পায় লোকজন তাকে লক্ষ্য রাখছে এবং তাকে সমালোচনা করবে যদি সে না করে।

৩) লোকজনের বিত্তবিভবের প্রতি লোভঃ পদবী, অর্থ অথবা ক্ষমতার মালিক হওয়া প্রবলভাবে কামনা করা রিয়ার কারণ হিসেব চিহ্নিত।

❖ প্রশ্ন-৬। রিয়ার ধরনগুলো কি কি?

উত্তরঃ রিয়া সংঘটিত হতে পারে আমলটি করার পূর্বে, করার সময় এবং করার পরে। প্রত্যেক পর্যায়ে, শয়তান সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যে কোন কল্যাণময় নেক আমলকে রিয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করতে।

কৃত আমলের পূর্বেঃ প্রশংসা পাওয়ার জন্য একটি নেক আমল করার মনস্থ করা, নিঃসন্দেহে, এটা রিয়ার সবচেয়ে জঘন্যতম অবস্থা। এই ধরনের নেকআমল আল্লাহর (সুবঃ) কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এবং এটা মুনাফিকির আত্মিক রোগের একটি শক্ত পূর্ব লক্ষন।

যখন আমলটি করা হয়ঃ এমতাবস্থায়, একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শুধু আল্লাহর জন্য আমল শুরু করে কিন্তু যখন সে খেয়াল করে লোকজন তাকে দেখছে তখন সে আমলগুলো আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে, অধিক ধার্মিক হিসেবে প্রমান করার উদ্দেশ্যে। উদাহরণ স্বরুপ- সে মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত করা শুরু করেছে এবং যখন সে জানতে পারল লোকজন তার দিকে মনযোগ দিয়েছে তখন সে তাদের জন্য তার কণ্ঠকে সুন্দর করবে এবং খুবই আবেগ দেখানোর চেষ্টা করে।

আমলটি করার পরঃ সর্বশেষ পর্যায়ে ঘটে যখন একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর (সুবঃ) জন্য ইবাদত করে, তখন লোকজন এটার জন্য তার প্রশংসা করা শুরু করে। সে তখন এই আমলের জন্য গর্ব অনুভব করতে শুরু করে এবং প্রশংসা পেয়ে খুশী হয় যা মানুষদের থেকে পায়। কতিপয় আলেম লিখেছেন–"এটা সম্ভব যে একজন আবেদ রিয়া'কে এড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন অন্যান্য লোকজন তার আমলকে উল্লেখ করে এবং তার প্রশংসা করে, এই ধরনের প্রশংসার ক্ষেত্রে সে অস্বস্তি এবং অপছন্দ সূচক কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়না। বরং, খুশী হয় এবং ভাবে যে এই ধরণের প্রশংসা তার জন্য তার ইবাদতকে সহজ করে দিবে। এই অনুভুতি লুকানো শিরকের খুবই সুক্ষ অভিব্যক্তি ...."

❖ প্রশ্ন-৭। রিয়া থেকে বাঁচার উপায় কি?

উত্তরঃ- আমরা জানতে পেরেছি যে, রিয়া করার মূল কারণ হচ্ছে ঈমানের দূর্বলতা। তাই যে সকল আমলের দ্বারা একজন ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পায়, ঐ সকল আমলের দ্বারাই রিয়ার প্রভাব কমানো সম্ভব। এর মধ্য থেকে কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করা হল রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্যঃ-

১। জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

২। দু'আ,

اللّٰهُمَّ إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه

'হে আল্লাহ্! আমাদের জানা অবস্থায় তোমার সাথে শির্ক থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শির্ক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থণা করছি।'" (আহমেদ, সহীহ আল-জামে)

৩) জান্নাত ও জাহান্নামের উপলব্ধি অন্তরে সৃষ্টি।

৪) ভাল আমল গোপন রাখাঃ

আহলে সুন্নাহর কিছু আলেমগণ বলেছেন, "আমাদের পূর্বের লোকেরা এমনভাবে ইবাদত করতে পছন্দ করতেন যে, তাদের স্ত্রী অথবা ঘনিষ্ট বন্ধুরাও এ বিষয় জানতে পারত না"

৫) নিজের দোষ ত্রুটির ব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়া।

৬) জ্ঞানী বা আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকা।

আল্লাহ (সুব:) বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}

অর্থ:- হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (সুরা তাওবা: ১১৯)

❖ প্রশ্ন: সত্যবাদী কারা?

উত্তর: সত্যবাদীদের পরিচয় আল্লাহ তা'আলা সুরায়ে হুজুরাতের ১৫নং আয়াতে দিচ্ছেন। ইরশাদ হচ্ছে;

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: ١٥]

অর্থ:- মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই হচ্ছে সত্যবাদী।

ارباب ، الهة ، انداد

আরবাব, আলিহা, আনদাদ

❖ প্রশ্ন-১। ارباب আরবাব কি?

উত্তরঃ- আরবাব শব্দটি রুবুবীয়াহ শব্দ থেকে এসেছে, রবের বহুবচন হচ্ছে আরবাব। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের একমাত্র রব। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রুবুবিয়্যার কোন অংশ যদি কেউ দাবী করে তাহলে সে মিথ্যা রুবুবিয়্যাহ দাবী করল, তাকে একজন আরবাব হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। আর তার এ দাবী যদি কেউ মেনে নেয় তাহলে তাকে ঐ ব্যক্তি রব হিসেবে গ্রহন করল।

মূলকথা, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একমাত্র রব, তাঁর কাজগুলো অন্যেরাও করতে পারে বা দিতে পারে এই বিশ্বাসে যাদের কাছে যাওয়া বা চাওয়া হয় অথবা এসবের অংশ যাদেরকে দেওয়া হয় তাদেরকেই আরবাব বলে। আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন আল-কুরআনে বলেনঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ [التوبة/٣١]

"তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পন্ডিত ও দরবেশগণকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।" (সূরা তওবাঃ৩১)

فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عَدِيّ صليب من فضة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: "بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا (٢) لهم الحرام، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم"

আদী বিন হাতিম (তিনি তখনো মুসলিম হননি) জিজ্ঞেস করলেন: হে মুহাম্মাদ! (সঃ) তারা তো পন্ডিত ও দরবেশগণের ইবাদত করে না, তাহলে তাদেরকে কিভাবে রব গ্রহণ করা হলো? মুহাম্মাদ (সঃ) বললেন: 'পন্ডিত ও দরবেশগণ আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম এবং যা হারাম করেছেন তা হালাল করে আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে না? এবং জনগন কি তা অন্ধভাবে মানেনা? আদী বিন হতিম উত্তর দিলেন; জি হ্যাঁ মানে, তখন মুহাম্মাদ (সঃ) বললেন; ইহাই হলো তাদের ইবাদত করা'। (ইবনে কাসীর)।

যারা মানবরচিত সংবিধানের মাধ্যমে আল্লাহর হারাম করা জিনিসগুলোকে হালাল করছে, যেমন- সুদ, জুয়া, মদ, লটারী, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি আল্লাহ হারাম

করেছেন, আর সংবিধানের মাধ্যমে এগুলোকে বৈধ বা হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। আর মানুষ তাদেরকে মেনে নিয়ে আল্লাহর পাশাপাশি আরবাব হিসেবে গ্রহন করছে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেনঃ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"তুমি বল, হে আহলে কিতাবগণ! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে আল্লাহ ব্যতীত রব (আরবাব) হিসেবে গ্রহণ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে লয় তবে বল তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৬৪)।

❖ প্রশ্ন-২। الهة আলিহা কি?

উত্তরঃ- ইলাহ্ শব্দের বহুবচন 'আলিহা'। আল্লাহই আমাদের একমাত্র ইবাদত যোগ্য ইলাহ। এখন কেউ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা আল্লাহর পাশাপাশি কারও ইবাদত করে তাহলে তাকে সে আলিহা বানাল।

সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে আল্লাহর রুবুবিয়্যার ধারণা অনেকটা সঠিক থাকলেও উলুহিয়্যা অর্থাৎ ইবাদাত করার ব্যাপারে সমস্যাটি প্রকট। কেউ কেউ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে রব হিসেবে মানলেও ইবাদাত করার ক্ষেত্রে অন্যান্যকে শরীক করে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বর্তমান সমাজের অনেক ব্যক্তিই মাযারে গিয়ে মান্নত করে, মৃত ব্যক্তির কাছে সন্তান ইত্যাদি চাওয়ার মত শির্কে লিপ্ত হয়।

জাহেলিয়াত যুগের মুশরিক আরবরাসহ প্রাচীন জাতিসমূহের এসব ধারণা খণ্ডন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا

অর্থাৎ "তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব ইলাহ এজন্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা (আলিহারা), তাদের শক্তির কারণ হতে পারে।" (সূরা মারইয়াম: ৮১)

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ [يس/٧٤]

অর্থাৎ "তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব ইলাহ এজন্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।" (সূরা ইয়াসীন: ৭৪)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আলিহা শব্দ দুটো শক্তির কারণ এবং সাহায্যকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মক্কার মুশরিকরা মুর্তিগুলোকে সৃষ্টিকর্তার কাছে সুপারিশকারী হিসেবে মনে করতো। অথচ তারা স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে মানতো।

রুবুবিয়্যার ব্যাপারে অনেকেরই ধারণা থাকলেও সকল সমস্যা দেখা যায় উলুহিয়্যার ব্যাপারে। সুরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াত অনুযায়ী বিধান দেওয়ার মালিক শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় ঈমানের দাবীদার বেশকিছু লোকেরাও জেনে অথবা না জেনে অহরহ মানুষের দেওয়া কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী বিধান মেনে চলছে। এমনকি তারা কতিপয় পীর, অলী, বুজুর্গ, গাউস, কুতুব, দরবেশদাবীদার, এমন কি কবর, মাজার, গাছ-পাথরকে তাদের ভয়, মানত, সেজদা সহ অনেক ইবাদত নিবেদন করে আলিহা রূপে গ্রহন করছে।

মানুষ তার নফসকেও ইলাহরূপে গ্রহন করতে পারে। কারণ মানুষকে গোমরাহ করার মত যত জিনিস আছে তার মধ্যে মানুষের নফসই হচ্ছে তার সর্বপ্রধান পথভ্রষ্টকারী শক্তি। যে ব্যক্তি নিজের খাহেশাতের দাসত্ব করবে, আল্লাহ্র বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কারণ যে কাজে টাকা পাওয়া যাবে, যে কাজ করলে সুনাম ও সম্মান হবে, যে জিনিসে অধিক স্বাদ ও আনন্দ লাভ করা যাবে, কেবল সে কাজই করতে সে প্রাণ-পণ চেষ্টা করবে। সেসব কাজ করতে যদি আল্লাহ্ নিষেধও করে থাকেন, তবুও সে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। এমতাবস্থায় একথা পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, সে আল্লাহ্ তাআলাকে তার ইলাহ রূপে স্বীকার করেনি বরং তার নফসকেই সে তার একমাত্র ইলাহের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। কাজেই এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে আল্লাহ্র হেদায়াত লাভ করতে পারে না।

কুরআন শরীফে একথা অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে।

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا [الفرقان/٤٤]

"(হে নবী!) যে ব্যক্তি নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? তুমি কি এ ধরনের মানুষের পাহারাদারী করতে পার? তুমি কি মনে কর যে, এদের মধ্যে অনেক লোকই (তোমার দাওয়াত) শোনে এবং বুঝে? কখনও নয়। এরা তো একেবারে জন্তু-জানোয়ারের মত বরং তা অপেক্ষাও এরা নিকৃষ্ট।" (আল-ফুরকান ৪৩-৪৪)

❖ প্রশ্ন-৩। انداد আনদাদ কি?

উত্তরঃ- আনদাদ অর্থ সমকক্ষ অথবা আরো সুনির্দিষ্টভাবে এমন কোনকিছু যাতে আল্লাহর সমকক্ষ বানান হয়েছে। এটা যে কোন আকারে হতে পাবে যেমন সম্পদ, পরিবার, সমাজ, নেতৃত্ব ও অন্যান্য। কোনকিছুকে ভালবাসা স্বাভাবিক কিন্তু কেউ যদি এই জিনিসকে আল্লাহর জন্য তার যে ভালবাসা তার সমান অথবা তার চেয়ে বেশী ভালবাসে তাহলে এটা শরীক হয়ে যায়।

আল্লাহ (সুব:) আরও বলেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ [البقرة/١٦٥]

"আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর আনদাদ (সমকক্ষ) সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুন বেশী। আর কতইনা উত্তম হত যদি এ যালেমরা পার্থিব কোন কোন আজাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্দি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর আজাবই সবচেয়ে কঠিনতর।" (সূরা বাক্বারা ২ঃ১৬৫) আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) কুরআনে বলেনঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [التوبة/٢٤]

"হে নবী বলে দাও যে,ঃ যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীরা এবং তোমাদের আত্মীয়-স্বজন তোমাদের সেই ধন-মাল যাহা তোমরা উপার্জন করেছ, সেই ব্যবসায় যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় কর, আর তোমাদের সেই ঘর যাকে তোমরা খুবই পছন্দ কর-তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয়, তা হলে তোমরা অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। আর আল্লাহ তো ফাসেক লোকদের কখনই হেদায়াত করেন না।" (সূরা ৯ আত-তাওবাহ, আয়াত ২৪)

সবকিছুর প্রতি আমাদের ভালবাসা অবশ্যই আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এবং তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি আমাদের ভালবাসার পরে আসতে হবে। এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য সব ধরনের আনদাদ ত্যাগ করতে হবে।

প্রচলিত কতিপয় শিরক্

❖ প্রশ্ন-১। গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাংসদদেরকে মানা, নির্বাচনে ভোট দেয়া শিরক কেন?

উত্তরঃ Democracy এমন একটা পদ্ধতি যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরী করে তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই কাজটি হয় কোন সভা অথবা সংসদে। এবং এই পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে ঐ সকল আইন ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফল ঘটে। মানুষকে মানুষের 'রব' হিসেবে উপস্থাপন করেছে এই গনতন্ত্র। এটি মানুষকে আইন প্রণয়নকারীর স্তরে পৌঁছে দেয়। অথচ একমাত্র আইন প্রণয়নকারী হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

"এবং আল্লাহ্ হুকুম দেন, তাঁর হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।" (সূরা রা'দ ১৩:৪১)। তিনি আরও বলেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"ওদের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি?" (সূরা শূরা ৪২:২১)

মুহাম্মদ আল-আমিন আশ-শানক্বিতি (রহঃ) বলেনঃ 'এবং কুরআনের এই আয়াতগুলো যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রণীত এবং রাসূল (সঃ) এর মুখ নিঃসৃত আইনের পরিবর্তে শয়তান ও তার সাহায্যকারীদের মুখ নিঃসৃত স্বরচিত আইনের আনুগত্য স্পষ্ট কুফর এবং শির্ক। এতে কোন সন্দেহ নেই'। (আদ্বওয়া আল-বাইয়ান, ৪র্থ খন্ড, পৃ:৮২-৮৫)

সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কোন অস্তিত্বই থাকবে না নির্বাচন ব্যতীত। জনগণ যদি নির্বাচন পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। যেহেতু কেউ কোন প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিবে না তাই নির্বাচিত কোন সাংসদ

পাওয়া যাবে না যারা জনগণের পক্ষে আইন প্রণয়ন করবে অথবা সরকারের নীতিমালার বাস্তবায়ন করবে।

শা্ইখ আবু বাসির মুস্তফা হালিমাহ বলেনঃ 'প্রথমতঃ যে নীতির উপর গণতন্ত্র স্থাপিত তা হল জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এই ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, সাধারণ জনগণের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন, যে প্রতিনিধিরা আইন তৈরী ও প্রণয়নের কাজ করবে। অন্য কথায় গণতন্ত্রে যে আইন প্রণয়নকারী এবং যার আনুগত্য করা হয় আসলে সে আল্লাহ্ নয় বরং একজন সাধারণ মানুষ। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আইন প্রণয়ন ও বৈধ-অবৈধ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যার ইবাদত অথবা আনুগত্য করা হয় সেও একজন জনগণ, একজন মানুষ, একজন সৃষ্টি, সে মহান আল্লাহ্ নয়। এটাই হল কুফর, শির্ক এবং পথভ্রষ্টতার মূল অস্তিত্ব এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয় সমূহ ও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। এভাবেই দুর্বল এবং অজ্ঞ লোকেরা শাসন-কর্তৃত্ব ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র একক ইলাহিয়্যাতের সাথে শরীক করে।' (হুকুম আল ইসলাম ফী আদ্-দিমুক্রাতিয়্যাহ আত-তা'দ্দুদিয়্যাহ আল-হিযবিয়্যাহ, পৃ:২৮)

শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আব্দুল আজিজ বলেনঃ 'তাদের নিজেদের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যারা ভোট দেয় তাদেরকে (সাংসদ), তারা অনুসরণ করছে কেননা ভোটাররা বস্তুতঃ তাদের পক্ষে শির্কের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করছে। কারণ এই প্রতিনিধিরাই আল্লাহ্র পাশাপাশি আইন-প্রণয়নের কাজে হাত দেয় এবং এভাবেই ভোটাররা সংসদ সদস্যদেরকে শির্কের বাস্ত বায়নের অধিকার দেয় এবং তাদেরকে আল্লাহ্র পাশাপাশি আইন প্রণয়নকারী প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে।

আমরা যদি একবারের জন্যেও ভোটারদের কার্যকলাপ এবং যখন কোন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় তার কার্যকলাপকে একত্রিত করি তাহলে তাদের উভয়ের দ্বারা কৃত কুফর বা শির্কের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

❖ প্রশ্ন-২। যাদুবিদ্যা শিরক এবং কুফরীর অন্তর্ভূক্ত কিভাবে?

উত্তরঃ- যাদু বিদ্যার মাধ্যমে যাদুকর নিজের এমন মিথ্যা ক্ষমতা প্রদর্শন করে যে ক্ষমতা রব হিসেবে একান্তই আল্লাহর রয়েছে। জাদুমন্ত্র নিজেই মূর্তিপূজার একটি শাখার প্রতিনিধিত্ব করে। জাদু মন্ত্রের মাধ্যমে ভাগ্যের ভাল-মন্দ, কল্যান-অকল্যানের বিষয়টি এর উপর নিহিত করা হয় যে কর্তৃত্ব রয়েছে একমাত্র আল্লাহর। যাদু বিদ্যার মাধ্যমে কোন কোন সময় শয়তান পছন্দ করে এমন সব কুফরী ও শিরকী কাজ করতে হয় যার ফলে সন্তুষ্ট হয়ে শয়তান যাদুকরের জন্য কাজ করে দেয়।

আল্লাহ সুবঃ বলেনঃ

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [البقرة/١٠٢]

"তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহ্র আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।" (সূরা, বাক্বারাহ ২ঃ১০২)

اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال الشرك بالله والسحر

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) বলেন- "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে বেঁচে থাকবে।" সাহাবাগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল সেগুলো কি?" রাসুল (সঃ) বলেলেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং যাদু---।"(বুখারী ও মুসলিম) তিনি (সঃ) আরও বলেনঃ

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه

"যে গিরা দিল অতপর তাতে ফুঁক দিল, সে যেন যাদুই করল। আর যে যাদু করল সে অবশ্যই শিরক করল অর্থাৎ মুশরিক হয়ে গেল। (নাসয়ী)

❖ প্রশ্ন-৩। তাবিজ-কবজ ব্যবহার শিরকের অন্তর্ভূক্ত কিভাবে?

উত্তরঃ- আল্লাহই একমাত্র ভাল ভাগ্য ও মন্দ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক, কল্যান অকল্যানের মালিক, রোগ থেকে মুক্তিদাতা, সন্তানদাতা। তাবিজ কবজ ব্যবহার

করে এসব কিছুর ব্যাপরে আল্লাহ ব্যতীত এগুলোর উপর নির্ভর করা হয়, যা শিরকের অন্তর্ভূক্ত ।

ان النبي صلى الله عليه و سلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر فقال ويحك ما هذه قال من الواهنة قال أما انها لا تزيدك الا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدا

ইমরান ইবনে হুসাইন কর্তৃক বর্ণিত আছে রাসূল (সঃ) একটি লোকের বাহুতে দস্তার বালা দেখে তাকে বললেন, দুর্ভাগ্য তোমার উপর । এটা কি? লোকটি উত্তর দিল যে এটি আল ওয়াহিনাহ নামের একটি অসুখ হতে রক্ষা পাবার জন্য । রাসূল (সঃ) তখন বললেন, এটা ফেলে দাও, কারণ এটা শুধু তোমার অসুস্থতা বৃদ্ধি করবে এবং যদি তুমি এটা পরা অবস্থায় মারা যাও তুমি কখনও কৃতকার্য হবে না । (আহমদ, ইবনে মাযাহ এবং ইবনে হিব্বান কর্তৃক সংগৃহীত)

من تعلق التمائم فقد اشرك উকবাহ বিন আমির আল জুহানী (রা) থেকে বর্নিত, রাসূল (সঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি তাবিজ লটকায়, সে শিরক্ করল ।" (আহমাদ)

إن الرقي والتمائم والتولة شرك আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্নিত. আমি রাসুল (সঃ) বলতে শুনেছি, ঝারফূঁক, যাদুটোনা এবং তাবিজ ব্যবহার করা শিরক । (আবু দাউদ, আহমাদ) আবদুল্লাহ বিন উকাইম থেকে মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে, ومن تعلق شيئا وكل إليـه "যে ব্যক্তি কোন জিনিস [অর্থাৎ তাবিজ-কবজ] লটকায় সে উক্ত জিনিসের দিকেই সমর্পিত হয়" ।[অর্থাৎ এর কুফল তার উপরই বর্তায়] (আহমাদ, তিরমিজি)

যে সব ঝাড়-ফুঁক শিরক মুক্ত তা দলিলের মাধ্যমে খাস করা হয়েছে । তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চোখের দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষের ব্যাপারে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন ।

❖ প্রশ্ন-৪ । বালা মুসীবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, তাগা [সূতা] ইত্যাদি পরিধান করা শিরক তার প্রমান কি?

উত্তরঃ- আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ

[হে রাসূল] "আপনি বলে দিন, তোমরা কি মনে করো, আল্লাহ যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকো, তারা কি তাঁর [নির্ধারিত] ক্ষতি হতে আমাকে রক্ষা করতে পারবে?" (যূমারঃ ৩৮) ।

সাহাবী ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা:) তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

رأى رجلا في يده حلقة من صفر . فقال(ماهذه الحلقة ؟) قال هذه من الواهنة . قال (انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا) وإنك لو مت وأنـت تـرى أنهـا تنفعـك لمت على غير الفطرة

"এটা কি?" লোকটি বললো, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, "এটা খুলে ফেলো। কারণ এটা তোমার দুর্বলতাকেই শুধু বৃদ্ধি করবে। আর এটা তোমার সাথে থাকা অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয়, আর তুমি মনে কর যে, এটা তোমার উপকার করবে তাহলে তুমি অবশ্যই ঈমানহারা হয়ে মরবে।" (আহমাদ)

উকবা বিন আমের রা. হতে একটি "মারফু" হাদীসে বর্ণিত আছে,

سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له

"যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় (পরিধান করে) আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন। যে ব্যক্তি কড়ি, শঙ্খ বা শামুক ঝুলায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন।" অপর একটি বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করলো।" (আহমাদ)

❖ প্রশ্ন-৫। শূভ অশুভ সংকেত গ্রহন শিরক কিভাবে?

উত্তরঃ-শুভ অশুভ সংকেত গ্রহন করা শিরকের অন্তর্ভূক্ত কারন-

১) ইবাদতের প্রক্রিয়া যাকে নির্ভরশীলতা (তাওয়াক্কুল) বলা হয় তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য দিকে পরিচালিত করে, এবং

২) ভাল ও মন্দ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়তি এড়ানোর ক্ষমতা মানুষের অথবা সৃষ্ট জিনিষের উপর অর্পন করে।

হুসাইন (রা) থেকে বর্নিত, রাসুল (সঃ) বলেছেন

"ليس منا من تطير ولا من تطير له أو تكهن أو تكهن له سحر أو سحر له

"যে কেউ তিয়ারা করে অথবা তার নিজের জন্য করেছে, তার নিজের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে অথবা কাউকে সম্মোহিত করেছে, সে আমাদের একজন নয়।" (তিরমিজী)

এখানে "আমাদের" বলতে মুসলিম জনগোষ্ঠী বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তিয়ারা এমন একটি কাজ যার উপর বিশ্বাস একজনকে ইসলামের বহির্ভূত করে দেয়।

মু'য়াবিয়াহ ইবনে আল-হাকিম কর্তৃক বর্ণিত,

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِى الْكُهَّانَ. قَالَ « فَلاَ تَأْتُوا الْكُهَّانَ ». قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ. قَالَ « ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِى نَفْسِهِ فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ »

আমি রাসুলকে (সঃ) বললাম, "আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা পাখির শুভ-অশুভ সংকেত মেনে চলে।" রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন, "এটা তোমরা নিজেরাই তৈরী করেছ, সুতরাং এটা যেন তোমাদেরকে থামিয়ে না দেয়।" (সাহীহ মুসলিম) অর্থাৎ তুমি যা করতে চাও এটা যেন তোমাকে তা করতে বাধা না দেয়। কারণ এ সব সংকেত মানুষের কল্পনাপ্রসূত বানানো গল্প যার কোন বাস্তবতা নেই।

কাঠে টোকা দেয়া, লবণ উল্টে পড়া, আয়না ভাঙ্গা, ভাঙ্গা ঝারু, খালি কলসি,তের নম্বর সংখ্যা ইত্যাদি বাতিল শিরকী আক্বিদা মানুষের মধ্যে প্রচলিত। অথচ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্নিত, আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেন, الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثا যে, "তিয়ারা শির্ক, তিয়ারা শিরক, তিয়ারা শির্ক। (আবু দাউদ' আত্ তিরমিজী এবং ইবনে মা'যা কর্তৃক সংগৃহীত) আবদুলাহ ইবনে্ আমর ইবনে্ আল্-আসও বর্ণনা দিয়েছেন যে রাসুল (সঃ) বলেছেন,

من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك قال تقول اللّٰهُمَّ لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك (أحمد ، والطبرانى ، وابن السنى فى عمل يوم وليلة عن ابن عمر)

"যে কেউ তিয়ারার ('কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের ধারনার) কারণে কিছু করা থেকে বিরত হল, সে শির্ক করল।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "এর প্রায়শ্চিত্ত কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "বলঃ আল্লাহুমা লা' খাইরা ইল্লা খাইরুক, ওয়া লা তাইরা ইল্লা তাইরুক, ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।" অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি প্রদত্ত মঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গল নাই এবং তুমি প্রদত্ত অমঙ্গল ব্যতীত কোন অমঙ্গল নেই এবং তুমি বিনা অন্য কোন ইলাহ নাই।" (আহমদ এবং তিরমিজী কর্তৃক সংগ্রহীত)

❖ প্রশ্ন-৬। 'আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন' বলা শিরক কিভাবে?

উত্তরঃ- কুতাইলা হতে বর্ণিত আছে,

أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : انكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت

একজন ইহুদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর কাছে এসে বললো, ‘আপনারাও আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকেন।’ কারণ আপনারা বলে থাকেন, আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন। আপনারা আরো বলে থাকেন কাবার কসম। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা কসম বা হলফ করতে চায়, তারা যেন বলে ‘কাবার রবের কসম আর যেন আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন’ একথা বলে। (নাসায়ী)

ইবনে আব্বাস রা. হতে আরো একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর উদ্দেশ্যে বললো, [আপনি এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন] তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি কি আল্লাহর সাথে আমাকে শরীক করে ফেলেছো?” আসলে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন, তা একক ভাবেই করেছেন।

আয়েশা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ স. যা ইচ্ছা করেছেন’ একথা বলো না বরং তোমরা বলো, অর্থাৎ ‘একক আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন।”

❖ প্রশ্ন-৭। বাক্যের মধ্যে ‘যদি’ ব্যবহার শিরকের দরজা খুলে দেয় কিভাবে?

উত্তরঃ- রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان

“যে জিনিস তোমার উপকার সাধন করবে, তার ব্যাপারে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, আর কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তবে এ কথা বলো না, ‘যদি আমি এরকম করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন হতো’। বরং তুমি এ কথা বলো, ‘আল্লাহ যা তাকদীরে রেখেছেন এবং যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা ‘যদি’ কথাটি শয়তানের জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়।” (বুখারি)

❖ প্রশ্ন-৮। মিলাদে কি ধরনের শিরক প্রচলিত?

উত্তরঃ- একদল মানুষ নাবী (স) এর নামে মিলাদ নামক বিদ’আত অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে মিলাদের মাঝখানে দাড়িয়ে পড়ে এবং ধারণা করে যে, নাবী (স)

এর রুহ মোবারক মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে থাকে- তাই দাঁড়াতে হয়। একই দিনে একই সাথে হাজার স্থানে মিলাদ হয়ে থাকে, এরূপ ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন- إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
"নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন। (সূরা বাকারা ২ঃ১০৯)
রাসুল (স) কে আল্লাহর মত সকল স্থানে উপস্থিত হতে পারে বলে মনে করলে শিরক্ হবে। আর নাবী (স) তো জানেন না কোথায় কোথায় মিলাদ হচ্ছে। কেননা তিনি গায়েব জানেন না। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে রাসুল (স) দ্বারা ঘোষনা করান-

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل/٦٥]

(হে নবী) বলুন! আসমান ও জমীনে আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েবের ব্যাপারে জানে না। (সূরা নামল ২৭ঃ৬৫)
অতএব গায়েবের ঈলম একমাত্র আল্লাহই জানেন। এ ইলম নবী (স) এর সাথে সম্পৃক্ত করলে আল্লাহর সাথে শিরক্ হবে।

❖ প্রশ্ন-৯। পীর-দরবেশ, ওলী-আউলিয়া এবং কবরে শায়িতদের নিকট দোয়া করা শিরক্ এ বিষয়টির প্রমান কি?
উত্তরঃ- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ [يونس/١٠٦]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, যে তোমার উপকার করতে পারবে না ও অপকারও করতে পারবে না। যদি তুমি অন্যকে ডাক তাহলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (সূরা ইউনুস ১০ঃ১০৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও বলেন-

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুকে ডাকে যে কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? তারা তাদেও ডাকা সম্পর্কে খবরও রাখে না। যখন মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদতের কথা অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ ৪৬ঃ ৫-৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অন্যত্র বলেন-

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ [فاطر/١٣، ١٤]

আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটির মালিকও নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদেও ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমদের শিরকের কথা অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহর ন্যায় তোমাদেরকে কেউ অবহিত করতে পারবে না। (সূরা ফাতিরঃ১৩-১৪)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্নিত নবী (স) বলেনঃ من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকে,আর এ অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (বুখারী)

কবরবাসীরা জীবিতদের ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ [النمل/٨٠]

আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না, বধিরকেও আহ্বান শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (সূরা নামল ২৭ঃ ৮০)

যারা কথা শুনে না তারা কিভাবে অপরকে সাহায্য করবে? অপরকে সান্তনা দিবে, অপরের মাকসুদ পূর্ন করবে? বরং তারা নিজেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত।

❖ প্রশ্ন-১০। কবর-মাযার-দযগায় দান বা ভোগ দেয়া শিরক্ তার প্রমান কি?

উত্তরঃ- তরীক বিন শিহাব হতে বর্ণিত

دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِي ذُبَابٍ ، مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ قَدْ عَكَفُوا عَلَى صَنَمٍ لَهُمْ وَقَالُوا : لاَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الْيَوْمَ أَحَدٌ إِلاَّ قَدَّمَ شَيْئًا ، فَقَالُوا لأَحَدِهِمَا : قَدِّمْ شَيْئًا ، فَأَبَى فَقُتِلَ ، وَقَالُوا : لِلآخَرِ : قَدِّمْ شَيْئًا ، فَقَالُوا : قَدِّمْ وَلَوْ ذُبَابًا ، فَقَالَ : وَأَيْشٍ ذُبَابٌ ، فَقَدَّمَ ذُبَابًا فَدَخَلَ النَّارَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : فَهَذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ ، وَدَخَلَ هَذَا النَّارَ فِي ذُبَابٍ

যে, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জান্নাতে গিয়েছে এবং একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে। সাহাবাগণ বললেন,

হে আল্লাহর রাসুল! এটা কিভাবে? রাসুলুল্লাহ (স) বললেনঃ দু'ব্যক্তি এক গোত্রের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, আর তাদের একটি মূর্তি ছিল, সে মূর্তিকে কিছু না দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে পারত না। অতঃপর তারা (মূতি পুজক-রা) দু'জনের একজনকে বলল ,কিছু দিয়ে যাও। সে বলল,আমার নিকট কিছুই নেই যা আমি পেশ করব। তারা তাকে বললঃ একটি মাছি হলেও দিয়ে যাও। অতঃপর সে একটি মাছি দান করল; আর তারা তার রাস্তা ছেড়ে দিল, অতঃপর সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। (মুর্তির খাদেমরা) দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললঃ তুমি কিছু দিয়ে যাও। লোকটি বলল, আমি মহান আল্লাহ ব্যতীত কাউকে কিছু দান করি না। তারা লোকটিকে হত্যা করল। অতঃপর লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করল। (মুসনাদে আহমাদ, কিতাবুত তাওহীদ ৫২ পৃঃ)

❖ **প্রশ্ন-১১**। মাযারে, ওরসে পীর-ফকিরদের উদ্দেশ্যে যবেহ করা, দান করা শিরক তার প্রমান কি?

উত্তরঃ- আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الأنعام/١٦٢]

"আপনি বলুন, "আমার সালাত, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ [সবই] আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যার কোন শরিক নেই" (আনআম : ১৬২)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣) [الكوثر/١-٣]

আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন, "আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সলাত পড়ুন এবং কোরবানী করুন।" (আল-কাউসার ঃ ২)

আলী (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে, তিনি বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ (صحيح مسلم)

"রাসূল (সঃ) চারটি বিষয়ে আমাকে অবহিত করেছেন, (ক) "যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে (পশু) যবেহ করে তার উপর আল্লাহর লা'নত।" (খ) "যে ব্যক্তি নিজ পিতা- মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত।" (গ) "যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত।" (ঘ) "যে ব্যক্তি জমির সীমানা [চিহ্ন] পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর লা'নত"। (মুসলিম)

আহমাদ থেকে বর্নিত দু'ব্যক্তির হাদীসটি যাদের একজন জাহান্নামে গিয়েছিল মুর্তিকে মাছি দেয়ার কারনে, এটিও একটি দালীল।

❖ প্রশ্ন-১২ । গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক তার প্রমান কি?

উত্তরঃ- আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا [الجن/٦]

"মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জ্বিনের কাছে আশ্রয় চাইতেছিল, এর ফলে তাদের [জ্বিনদের] গর্ব ও আহমিকা আরো বেড়ে গিয়েছিল ।" (জিন . ৬)

খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ (صحيح مسلم)

"আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন মঞ্জিলে অবতীর্ণ হয়ে বললো, "আমি আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ কালামের কাছে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই ।" তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ মঞ্জিল ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না । (মুসলিম)

❖ প্রশ্ন-১৩ । নেককার ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমা লংঘন গাইরুল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায় প্রমান কি?

উত্তরঃ- ইমাম মালেক র. মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছেন ।

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (مؤطأ الإمام مالك)

"হে আল্লাহ আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করো না যার ইবাদত করা হয় । সেই জাতির উপর আল্লাহর কঠিন গজব নাযিল হয়েছে যারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে ।" (মুয়াত্তা মালেক)

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. (سنن أبي داود)

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারত কারিনী (মহিলা) দেরকে এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে আর (কবরে) বাতি জ্বালায় তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন । [আহলুস সুনান' এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

❖ প্রশ্ন-১৪ । বরকত হাসিলের জন্য গাছের নিকট ভোগ দেয়া শিরক্ ।
উত্তরঃ আবু ওয়াকেদ লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত,

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله أجعل لنا ذات أنوط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه و سلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم (سنن الترمذي)

তিনি বলেন, আমরা রাসুল (স) এর সাথে হুনাইনে যাচ্ছিলাম আর আমরা তখনো নতুন মুসিলিম ছিলাম । মুশরিকদের জন্য একটি বড়ই গাছ ছিল তারা গাছটির নিকট অবস্থান করত এবং তাতে অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত । তাকে যাতে আনওয়াত বলা হতো । আমরা একটি বরই গাছের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম । আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের জন্য যাতে আনওয়াত বানিয়ে দিন যেমনভাবে তাদের জন্য যাতে আনওয়াত রয়েছে ।
অতঃপর রাসুল (স) বললেনঃ আল্লাহু আকবার ঐ সত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! এটা এমন একটি নীতি যা তোমরা বললে যেমন বলেছিল বানীসিরাঈলরা মুসা (আ) কে- "আমাদের জন্য আপনি মা'বুদ বানিয়ে দিন যেমন তাদের মা'বুদ রয়েছে । তিনি বললেনঃ তোমরা বড়ই নির্বোধ সম্প্রদায় । তোমরা এমন নীতির অনুকরণ করবে যে নীতির উপর তোমদের পূর্ববর্তীরা ছিল ।" (তিরমিজি ২য় খন্ড ৪১পৃঃ, আহমাদ, মুসনাদে আবদুর রাজ্জাক, ইবনু জারীর, ইবনু মুনযির, ইবনু আবি হাতিম, তাবারানী)

❖ প্রশ্ন-১৫ । আল্লাহ ব্যতীত বাপ-দাদা, মাতা, পীর-দরবেশ কিংবা অন্যকিছুর নামে কসম করা শিরক্ এর প্রমান কি?
উত্তরঃ আবদুর রহমান বিন সামুরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ

لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِى وَلاَ بِآبَائِكُمْ (صحيح مسلم)

তোমরা তাগুতের নামে ও বাপ-দাদার নামে কসম করো না । (*মুসলিম ২য় খন্ড ৪৬ পৃঃ*) আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ

لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ (سنن أبي داود)

তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে,মা-নানীর নামে এবং প্রতিমার নামে কসম করো না এবং আল্লাহর নামে সত্য কসম ব্যতীত কসম করো না। (*আবু দাউদ*) আবদুল্লাহ বিন উমার (রা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ আমি রাসুল (স) কে বলতে শুনেছি, (سنن أبي داود) مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নমে কসম করল সে শিরকই করল। (*তিরমিজি, আবু দাউদ ২য় খন্ড ৪৬৩ পৃঃ*)

❖ **প্রশ্ন-১৬**। নাবী (সাঃ) কে আল্লাহর নূরের তৈরী মনে করা শিরক্ কেন? তিনি যে মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন তার প্রমান কি?

উত্তরঃ- এক শ্রেনীর মানুষ বলে, নাবী (স) কে তৈরী না করলে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না। এ ব্যাপারে তারা যে হাদীসটি বলে তা একটি জাল বা বানোয়াট হাদীস। তারা আরও বলে আল্লাহ নাবী (স) কে তাঁর নিজের নূর দিয়ে তৈরী করেছেন, নাবী (স) নূরের তৈরী। আর নাবী (স) এর নূরে সমস্ত জগত তৈরী। সর্ব প্রথম আল্লাহ নাবী (স) কে তাঁর নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, এভাবে তারা আল্লাহর সাথে শিরক্ করে থাকে। কারণ এতে আল্লাহর সত্বার সাথে সৃষ্টির সংমিশ্রণ ঘটানো হয়া, যা তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে শিরকের অন্তর্ভূক্ত। অথচ সহীহ হাদীসে রয়েছে আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে লিখতে বলেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ

إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما أكتب ؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد (سنن الترمذي)

আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর কলমকে বলেছেনঃ লিখ, কলম বলল কি লিখব? আল্লাহ বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে সব লিখ। (তাবারানী, ইবনু জারীর, ইবনু আসাকির, ইবনু আবি হাতিম, আহমাদ, তিরমিজি) মহান আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف/١١٠]

বলুন! আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওয়াহী আসে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। (সূরা কাহফ ১৮ঃ ১১০)

আলোচ্য আয়াতে মুহাম্মদ (স) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষনা করেছেনঃ আমি মানুষ, তোমাদের মতই একজন মানুষ। তবে পার্থক্য এই যে, আমার নিকট ওয়াহী

আসে। আল্লাহর রাসুল মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন তার কিছু প্রমান আমরা তুলে ধরছি।

প্রথম প্রমানঃ মুহাম্মদ (স) অন্যান্য মানুষের মতই আদম সন্তান ছিলেন। মানুষ যেমন পানাহার করে, তেমনি মুহাম্মদ (স) ও পানাহার করতেন। অন্যান্য মানুষের যেমন সন্তানাদি ছিল, তেমনি রাসুলেরও সন্তাানাদি ছিল, স্ত্রীও ছিল। তিনি বলেছেনঃ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي (صحيح مسلم)

"আমি মানুষ, তোমাদের মত ভূলে যাই। ভূলে গেলে অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেবে।" (সহীহ মুসলিম ১৩০২)

দ্বিতীয় প্রমাণঃ অন্যান্য মানষের মত রাসুলেরও বংশ তালিকা ছিল। একথা সবকলেই জানেন। রাসুল যে মানুষ নবী ছিলেন কোরাইশ বংশে জন্ম গ্রহন তার বিরাট প্রমান।

তৃতীয় প্রমাণঃ মুহাম্মদ (স) অন্যান্য মানুষের মত পানাহার করতেন। রাসুল (স) পানাহার করতেন এজন্য কাফেররা বলত-

ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق (جامع الأحاديث (ص: ١٤٩)

'মুহাম্মদ কেমন রাসুল যে পানাহার করে' এ কথাটি মক্কাবাসী পৌত্তলিকদের। এ প্রশ্নের উত্তর দানে আল্লাহ ওয়াহী পাঠালেন-

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ [الأنبياء/٨]

" আর আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করত না, আর তারা স্থায়ীও ছিল না। (সুরা আম্বিয়া: ৮)

অর্থাৎ যেহেতু সমস্ত নবী খাদ্য গ্রহন করতেন, সেহেতু মুহাম্মদ (স) ও একজন খাদ্য গ্রহনকারী রাসুল ছিলেন। এটা তাঁর মানুষ হবার অন্যতম প্রমাণ।

চতুর্থ প্রমাণঃ রাসুল অন্যান্য নবীদের মত মৃত্যু বরণ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ [الزمر/٣٠]

"নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারা সকলে মৃত্যু বরণ করবে।" (সূরা যুমার ৩৯ঃ৩০)।

রাসুল (স) অতি মানব ছিলেন না যে তিনি মৃত্যু বরণ করবেন না। বরং তিনি ছিলেন মানুষ নবী, তাই তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। উল্লেখিত প্রমাণাদি দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, মুহাম্মদ (স) একজন মানুষ নবী ছিলেন।

একথা কিভাবে গ্রহণ করা যায় যে, তিনি নূরের তৈরী, অথচ যাকে মানব জাতির হেদায়েতের জন্য, অনুসরণীয় একমাত্র আদর্শ হিসেবে আল্লাহ পাঠালেন মাটির মানুষদের কাছে। নূরের তৈরী সৃষ্টির প্রকৃতি,চাল-চলন তো হবে ভিন্ন, তাকে কিভাবে মানুষ পুরোপুরি আদর্শ হিসেবে গ্রহন করে তার যথাযথ অনুসরণ করবে। যাদের বিবেক বুদ্ধি আছে, তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এ ব্যাপারে আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

❖ প্রশ্ন-১৭। ওয়াসীলার নিষিদ্ধ এবং শিরকী দিকগুলো কি কি?

উত্তরঃ মৃতদের মাধ্যমে অসিলা খোঁজাঃ

তাদের কাছে কোন প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়া, সাহায্য চাওয়া যেটা আজ দেখা যাচ্ছে। একে মানুষ অসিলা মনে করে, কিন্তু মূলতঃ তা নয়। কারণ, অসিলার অর্থ হল আল্লাহ্ নিকটবর্তী হওয়া; যা ঈমানের দ্বারা এবং নেক কাজের দ্বারা সম্ভব। অন্যদিকে মৃতদের কাছে দোয়া করা আল্লাহ্ হতে মুখ ফিরানোর নামান্ত র। তা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ [يونس/١٠٦]

"আল্লাহ্ ছাড়া এমন অন্যের কাছে দোয়া কর না যারা না পারে তোমার উপকার করতে, আর না পারে তোমার ক্ষতি করতে। যদি তা কর তবে নিশ্চয়ই তুমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা ইউনুস ১০ঃ ১০৬)

নবী (সঃ) -এর সম্মানের অসিলা খোঁজাঃ

যেমন বলা, হে আমার রব রাসূল (সঃ)-এর অসিলায় আমাকে রোগমুক্ত কর। এটা বেদ'আত। কারণ সাহাবীরা কেউ এটা করেন নাই। কারণ খলীফা ওমর (রাঃ) রাসূল (সঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর অসিলায় দোয়া করেছিলেন তার জীবিত অবস্থায় এবং রাসূল (সঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর অসিলায় বৃষ্টির জন্য দোয়া করেননি।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ (صحيح البخاري: ١٠١٠)

অর্থ:- আনাস বিন মালেক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দিত তখন উমর (রাযিঃ) আব্বাস (রাযিঃ) এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য

দোয়া করাতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ আমরা তোমার নবীর মাধ্যমে ওসীলা করে দোয়া করতাম। অতপর তুমি আমাদের কে বৃষ্টি দিতে। আর এখন আমরা ওসীলা করছি নবীর চাচা আব্বাস (রাযিঃ) এর মাধ্যমে। সুতরাং তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তিনি বলেন, অতপর বৃষ্টি বর্ষিত হল। (বুখারী ১০১০)
আর এই বেদ'আতী অসিলা মানুষকে শির্কে পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় যখন এই ধারণা করা হয় যে, আল্লাহ্ (সুব:) কোন মাধ্যম ছাড়া করতে পারেন না।

❖ প্রশ্ন-১৮। তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার অর্থ তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করা, এটি শিরক এবং কুফরী এর প্রমান কি?

প্রথম প্রমাণঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে, আমরা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে (তার প্রতিও ঈমান এনেছি) তারা বিবাদ পূর্ণ বিষয়কে (মীমাংসার জন্য) তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়; অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাকে (তাগুতকে) মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়।" (আন নিসাঃ ৬০)

শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ আল শাইখ তাঁর তাইসীরুল আজিজিল হামীদ নামক গ্রন্থের ৪১৯ পৃষ্ঠায় বলেনঃ এ আয়াতটির মধ্যে কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে তাগুতের কাছে বিচার ফায়সালা চাওয়ার কাজটি পরিত্যাগ করা ফরজ এবং যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালার জন্য যাবে সে মুমিন তো নয়ই, এমনকি সে মুসলমানও নয়।

আল্লামা জামালউদ্দিন আল-কাসেমী তাঁর বিখ্যাত মাহাসিনুত্তাউইল সুরা নিসার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ "তারা চায় বিচার ফয়সালা তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে, অথচ তাকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ হয়েছে।" তাগুতের নিকট বিচার ফয়সালা চাওয়াকে তাগুতের প্রতি ঈমান পোষন হিসেবে গন্য করা হয়েছে। আর এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তাগুতের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থই আল্লাহকে অস্বীকার করা, ঠিক যেমনটি তাগুতকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল- শাইখ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ [البقرة/٢٥٦]আল্লাহর এ বাণী উল্লেখ করে বলেনঃ তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালার চাওয়ার অর্থই হচ্ছে তাগুতের প্রতি ঈমান আনা। (ফাতহুল মাজিদ)
"শয়তান তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করে গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে চায়।" আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, বিচার ফায়সালা চাওয়ার কাজটি শিরকে আকবার (বড় শিরক), যা জঘণ্যতম গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতা । যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত (বা বিধান) ছাড়া অন্য কোনো বিধানের মধ্যে বিচার ফয়সালা প্রার্থনা করলো, সে মারাত্মক গোমরাহীতে পতিত হলো। কেননা আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে বিচার ফয়সালা চাওয়া বড় শিরকের অন্তর্ভূক্ত ।
দ্বিতীয় প্রমাণঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [يوسف/٤٠]

"বিধান দেয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর । তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করোনা। এটাই সঠিক দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।" (সূরাঃ ইউসুফঃ ৪০)
আল্লাহই একমাত্র রব, তিনিই একমাত্র বিধান দাতা, এ অধিকার শুধুমাত্র তাঁরই। আল্লাহ তায়ালাই বিধান দাতা এ বিশ্বাসের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে, বিচার ফয়সালা চাওয়া নামক ইবাদতও তাঁরই উদ্দেশ্যে করা। এ ইবাদত যদি আল্লাহর আইন ও শরীয়তকে বাদ দিয়ে করা হয়, তাহলেও এটা হবে শিরকে আকবার বা বড় ধরনের শিরক।
শাইখ আবদুর রহমান আস্ সা'দী কিতাবুত্তাওহীদের উপর লেখা তাঁর বই 'কাওলুন সাদীদ' এ'আলাম তারা ইলাল্লাজিনা ইয়াজয়ুমুন' এর ব্যাখা প্রসংগে বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাছুলকে বাদ দিয়ে বিচার ফয়সালা (অন্য কোনো বিধান বা ব্যক্তির কাছে)চায়,তাহলে সে ঐ প্রার্থীত ব্যক্তি বা মতাদর্শকে রব বানিয়ে নিয়েছে এবং তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চেয়েছে।

❖ প্রশ্ন-১৯। নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন আমাল করা শিরক তার প্রমান কি?

উত্তরঃ- আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود/١٥، ١٦]

"যারা শুধু দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদের সব কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি।" (হুদ : ১৫-১৬)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূল (স:) এরশাদ করেছেন,

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع

দীনার ও দেরহাম অর্থাৎ টাকা-পয়সার পূজারীরা ধ্বংস হোক। রেশম পূজারী [পোষাক- বিলাসী] ধ্বংস হোক। তাকে দিতে পারলেই খুশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়। সে ধ্বংস হোক, তার আরো খারাপ হোক, কাঁটা-ফুটলে সে তা খুলতে সক্ষম না হয় [অর্থাৎ সে বিপদ থেকে উদ্ধার না পাক] সে বান্দা সৌভাগ্যের অধিকারী যে আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে, মাথার চুলগুলোকে এলো-মেলো করেছে আর পদযুগলকে করেছে ধূলিমলিন। তাকে পাহারার দায়িত্ব দিলে সে পাহারাতেই লেগে থাকে। সেনাদলের শেষ ভাগে তাকে নিয়োজিত করলে সে শেষ ভাগেই লেগে থাকে। সে অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। তার ব্যাপারে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গৃহীত হয় না। (বুখারী)

❖ প্রশ্ন-২০। "আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান" এ ধারনাটি বাতিল এবং শিরক্ বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন?

উত্তরঃ- আল্লাহ সবত্র বিরাজমান এই বিশ্বাস অতিশয় বিপজ্জনক; মূর্খতা এই কারণে যে, এই বিশ্বাস আল্লাহর সৃষ্টিকে উপসনা করার মত সবচেয়ে বড় পাপকে উৎসাহিত করে, যুক্তিসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করে। এটা তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত বিশ্বাসের বিপরীত শিরকেরও একটি রূপ কারণ এটা স্রষ্টার জন্য এমন এক গুন দাবি করে যা তাঁর নয়। কোরআন অথবা রাসূলের (সঃ) জবাণীতে আল্লাহর এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে কোরআন এবং সুন্নাহ এর বিপরীত নিশ্চিত করে।

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন বরং তিনি আরশে সমাসীন বিষয়টির প্রমান হচ্ছে-

১। মিরাজ থেকে প্রমাণঃ মদীনায় হিজরত করার দুই বৎসর পূর্বে রাসূল (সঃ) মক্কা হতে জেরুজালেমে অলৌকিক রাত্রি ভ্রমণ (ইসরা) করেন এবং সেখান হতে তিনি (সঃ) মিরাজ চড়ে সাত আসমানের সৃষ্টির সর্বোচ্চ সীমায় গমণ করেন।

فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه ؟ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى إذا أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه (صحيح البخاري)

তিনি যাতে সরাসরি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে পারেন এ জন্য তাকে এই অলৌকিক ভ্রমন করান হয়েছিল। সেখানে সপ্তম আসমানের উর্দ্ধে, দিনে পাচবার সালাত (আনুষ্ঠানিত প্রার্থণা) বাধ্যতামূলক করা হয়, আল্লাহ সরাসরি রাসূলের (সঃ) সঙ্গে কথা বলেন এবং সূরা আর বাক্বারার (কোরআনের দ্বিতীয় সূরা) শেষ আয়াত গুলি অবতীর্ণ। (বুখারীতে বিস্তারিতভাবে বর্নিত আছে)

যদি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান হতেন তাহলে রাসূলকে (সঃ) কোথাও যেতে হত না। তিনি নিজের বাড়ীতে সরাসরি আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে পারতেন। সুতরাং এই ঘটনাটি একটি প্রমান যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন, তিনি আরশে সমাসীন।

৩। **কোরআন থেকে প্রমাণঃ** আল্লাহ তার সৃষ্টির উর্ধে কোরআনে বর্ণিত এরূপ প্রচুর আয়াত আছে। এই গুলি কোরআনের প্রায় প্রতি সূরাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ [المعارج/٤]

"ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্দ্ধগামী হয় এমন একদিনে যাহা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। (সূরা আল মা আরিজ ৭০ঃ ৪)

الـرَّحْمَنُ عَلَى الْعَـرْشِ اسْـتَوَى [طـه/٥] "তিনি রহমান, আরশে সমাসীন।" (সূরা ত্বাহা ২০ঃ৫)

সুতরাং যারা গভীরভাবে চিন্তা করে, কোরআন নিজেই তাদের স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তার সৃষ্টির অনেক উর্ধে আরশে সমাসীন এবং কোন ভাবেই এর ভিতরে অথবা এর দ্বারা পরিবেষ্টিত নয়।

৪। **হাদিস থেকে প্রমাণঃ** রাসূলে (সঃ) বিবরণের মধ্যে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যেগুলি পরিস্কার ভাবে প্রতিষ্ঠা করে যে আল্লাহ পৃথিবী অথবা তার সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নয়। আবু হুরায়রাহর বর্ণনায় পাওয়া যায় যেখানে রাসূল (সঃ) বলেছেন,

لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي

"যখন আল্লাহ সৃষ্টি সমাপ্ত করলেন, তিনি তার কাছে তার সিংহাসনের ঊর্দ্ধে রক্ষিত একটি পুস্তক (যা তিনি রেখেছিলেন) লিখেছিলেন, নিশ্চয়ই আমার করুনা আমার ক্ষোভ হতে অগ্রগামী হবে।" (আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত)

একটি উদাহরণ হল রাসূল (সঃ) স্ত্রী জয়নাব বিনতে যাহশ যিনি রাসূলের (সঃ) অন্য স্ত্রীগণের নিকট গর্ব করতেন। যে, যখন আল্লাহ সপ্তম আসমান এর ঊর্দ্ধে হতে তাকে বিবাহ দিলেন তখন তার পরিবার তাকে রাসূলের (সঃ) কাছে সম্প্রদান করলেন। (আনাস রাঃ কর্তৃক বর্ণিত এবং আল্-বুখারী)

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় দুয়ায় (প্রার্থণা) যাদ্বারা রাসূল (সঃ) অসুস্থদের তাদের নিজেদের জন্য প্রার্থণা করতে শিখিয়েছিলেনঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আসমানের উপরে, আপনার নাম পবিত্র হউক.....(আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত) মু'আবিয়াহ ইবনে আল হাকাম বলেন,

قَالَ « مَنْ أَنَا ». قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ « أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ .فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا « أَيْنَ اللَّهُ ». قَالَتْ فِي السَّمَاءِ.

তিনি (সঃ) তখন তাকে (দাসীকে) জিজ্ঞাস করলেন, আল্লাহ কোথায়? এবং সে উত্তর দিল, আসমানের উপরে। তারপর তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে? সে উত্তর দিল, আপনি আল্লাহর রাসূল। সুতরাং তিনি বললেন, তাকে মুক্তি দাও, কারণ নিশ্চয়ই সে একজন সত্যিকার বিশ্বাসী। (মুসলিম)

৫। পূর্বেকার আলেমদের ঐক্যমতঃ একটি উত্তম উদাহরণ মূতী আল বালকীর বর্ণনায় পাওয়া যায় সেখানে তিনি আবু হানিফার কাছে জানতে চান সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে যে জানে না তার প্রতিপালক আসমানে না জমিনের উপর বিদ্যমান। আবু হানিফা উত্তর দিলেন, "সে কুফরী করেছে, কারণ আল্লাহ বলেছেন "দয়াময় আরশে সামসীন" (*সূরা তাহা ২০ঃ৫*) এবং তার সিংহাসন সপ্তম আসমানের ঊর্দ্ধে। অতপরঃ তিনি (আলবালাখী) বললেন, যদি সে বলে যে তিনি (আল্লাহ) সিংহাসনের উপরে কিন্তু সে জানে না যে সিংহাসন আসমানের না জমিনের উপরে, তাহলে কি হবে? তিনি (আবু হানিফা) উত্তর দিলেন, সে কুফরী করেছে এবং তিনি আসমানের ঊর্ধে বিদ্যমান এ কথা সে অস্বীকার করেছে এবং তিনি আসমানের ঊর্ধে এ কথা যে স্বীকার করবে সে কাফের। (আবু ইসমা'য়ীল আল্-আছা'বী কর্তৃক তাঁর al-Faarooq পুস্তকে বর্ণিত এবং al-Aqeedah attahaaweeyah পুস্তকে ২৮৮নং পৃষ্ঠা হতে উদ্ধৃত)

যদিও আবু হানিফার আইন শিক্ষার বহু অনুসারীগণ আজকাল দাবি করে যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, পূর্বের অনুসারীগণ এই দাবির সঙ্গে একমত ছিলেন না।

সুতরাং, ইসলাম এবং এর প্রধান তত্ত্ব তৌহিদ অনুসারে নিরাপদে বলা যায় যেঃ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি হতে সর্ম্পূণ আলাদা। কোন প্রকারেরই সৃষ্টি তাঁকে বেষ্টিত করে নেই অথবা তাঁর উর্ধে বিদ্যমান নেই। আল্লাহ সকল বস্তুর উর্ধে। ইসলামের মূল সূত্র হিসাবে আল্লাহ সম্বন্ধে এটাই হল সঠিক মতবাদ। এটা খুব সহজ এবং দৃঢ়।

❖ প্রশ্ন-২১। ভাগ্য গননা শিরক্ কিভাবে?

উত্তরঃ- মানবজাতির মধ্যে অনেকে আছে যারা অদৃশ্য এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করে। তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন- গণক, ভবিষ্যৎ-বক্তা, পূর্ব-পরিজ্ঞেয়ক, দৈবজ্ঞ, যাদুকর, পূর্বাভাষদাতা, দৈববাণী প্রকাশক, জ্যোতিষী, হস্তরেখা বিশারদ ইত্যাদি। গণকরা বিভিন্ন পদ্ধতি এবং মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্যাদি বের করে আনার দাবী করে, যার মধ্যে রয়েছেঃ চায়ের পাতা পড়া, রেখা অংকন, সংখ্যা লেখা, হস্তরেখা-পড়া, রাশিচক্র পরীক্ষা করা, স্ফটিক বলের প্রতি দৃষ্টিপাত, হাড়গোড় ছড়ি ছোড়া (লাঠি চালনা) ইত্যাদি।

গুপ্ত বিদ্যা পেশাজীবিগণ যারা অদৃশ্য প্রকাশ করতে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম বলে দাবী করে তাদের প্রধানতঃ দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারেঃ

(১) যাদের সত্যিকার কোন জ্ঞান বা গুপ্ত বিষয় জানা নেই। তারা প্রায়ই অনেকগুলি অর্থহীন আচারানুষ্ঠান করে খরিদ্দারদের ধোঁকা দেয় এবং তারপর তারা পরিকল্পিতভাবে সাধারণ অনুমানগুলিই বলে। তাদের কিছু কিছু অনুমান, সাধারণতার কারণে, সচরাচর সত্য হয়ে যায়। বেশীর ভাগ লোকের গুটিকয়েক ভবিষ্যদ্বাণী যা সত্য হয় সেগুলি স্মরণ রাখার প্রবণতা দেখা যায় এবং যেগুলি সত্য হয় না তার বেশীরভাগই তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

(২) দ্বিতীয় দলভুক্ত তারা যাদের জিনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। এই দলটি সবচেয়ে গুরুতর। কারণ এর সঙ্গে সাধারণতঃ শির্‌ক এর মত মারাত্মক গুনাহ জড়িত। যারা এই কাজে জড়িত তাদের তথ্যাদি অতি নির্ভূল হয় এবং এইভাবে মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের মধ্যে একইভাবে সত্যিকার ফিত্‌না (প্রলোভন) সৃষ্টি হয়।

অপবিত্র বিশ্বাস জাড়িত থাকার কারণে ইসলাম ভাগ্য গণনার প্রতি কঠোর দৃষ্টি ভঙ্গি গ্রহণ করেছে। যে কোন প্রকারের গণক দর্শন সম্বন্ধে রাসূল (সঃ)

পরিস্কারভাবে নীতি নিদ্ধারণ করে দিয়েছেন। হাফসা (রাসূলে স্ত্রী) হতে সাফিয়া বর্ণনা দেন যে রাসূল (সঃ) বলেছেন,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (صحيح مسلم)

"যদি কেউ গণকের কাছে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে ৪০ দিন রাত পর্যন্ত তার নামাজ (সালাত) গ্রহীত হবে না।" (মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত) এই হাদিসের বর্ণিত শাস্তি শুধু মাত্র গণকের কাছে যাবার এবং তাকে কৌতুহল বশতঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার করণেই।

আর গণক অদৃশ্য এবং ভবিষ্যতের খবর জানে এই বিশ্বাস নিয়ে যে কেউ গণকের কাছে যায় সে কুফর (অবিশ্বাস) করে। আবু হুরায়রা এবং আল হাসান উভয়ে বর্ণনা দিয়েছেন যে রাসূল (সঃ) বলেছেন

من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر مما أنزل على محمد

"যে গণকের নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে সে মুহাম্মদের উপর (সঃ) উপর যা নাজিল হয়েছিল তা অবিশ্বাস করল। (আহামাদ, বায়হাকী এবং আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত)

এই ধরণের বিশ্বাস আল্লাহ অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে সৃষ্টির উপর আরোপ করে। ফলে এটি তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাতকে ধ্বংস করে এবং তাওহীদের ক্ষেত্রে এক ধরণের শির্ক এর নমুনা। গণকদের লেখা জিনিস (বই, পত্রিকা ইত্যাদি) পড়া এবং তাদের কথা রেডিওতে শোনা অথবা টেলিভিশনে দেখা সাদৃশ্যতার (কিয়াস) কারণে কুফরীর মধ্যে পড়ে। আল্লাহ সুবঃ স্পষ্ট ভাবে কোরআনে উল্লেখ করেছেন যে তিনি ছাড়া অন্য কেউ অদৃশ্য সম্পর্কে জানে না, এমনকি রাসূলও (সঃ) না।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ [الأنعام/٥٩]

আল্লাহ বলেনঃ অদৃশ্যের কুঞ্জি তহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না। (সূরা আন'আম ৬ঃ৫৯)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [الأعراف/١٨٨]

তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাসূল (সঃ) কে বলেন, বল আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজস্ব ভালমন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূর

কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। (সুরা আল-আ'রাফঃ ১৮৮)

❖ প্রশ্ন-২২। রাশিচক্র সম্বন্ধে ইসলামের রায় কি?

উত্তরঃ- জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা শুধু হারামই নয় একজন জ্যোতিষবিদের কাছে যাওয়া এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনা, জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বই কেনা অথবা একজনের কোষ্ঠী যাচাই সম্পূর্ন নিষেধ। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা এই বিদ্যা চর্চা করে তাদের জ্যোতিষী বা গণক বলে গণ্য করা হয়। ফলস্বরূপ, যে তার রাশিচক্র খোঁজে সে রাসূল (সা) প্রদত্ত বিবৃতির রায়ের অধীনে পড়েঃ

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (صحيح مسلم)

"যে গণকের কাছে যায় এবং কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে তার চল্লিশ দিন ও রাত্রির নামাজ গ্রহণযোগ্য হবে না।" (হাফসা কর্তৃক বর্নিত, মুসলিম)

এমনকি জ্যোতিষের বক্তব্যের সত্যতায় সন্দিহান হওয়া সত্ত্বেও একজনের শুধু তার কাছে যাওয়া এবং প্রশ্ন করার শাস্তি এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যদি কেউ জ্যোতিষ-সংক্রান্ত তথ্যাদির সত্য মিথ্যায় সন্দিহান হয়, তবে সে আল্লাহর পাশাপাশি অন্যরাও হয়তো অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানে বলে সন্দেহ পোষণ করে। এটা এক ধরনের শির্ক।

যতই জ্যোতিষ বলুক অথবা যা কিছুই জ্যোতিষশাস্ত্রের বইয়ে থাকুক, কেউ তার রাশিচক্রে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করলে সে সরাসরি কুফরি (অবিশ্বাস) করে। কারণ রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر مما أنزل على محمد

"যে একজন ভবিষ্যতদ্রষ্টা গণকের নিকট গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, মুহাম্মদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছিল সে তা অবিশ্বাস করল।" (আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্নিত এবং আহামাদ ও আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত)

পূর্বে বর্ণিত হাদিসের মত এই হাদিসে শাব্দিকভাবে গণকের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হলেও জ্যোতিষবিদদের জন্যেও সমভাবে প্রযোজ্য। উভয়ই ভবিষ্যতের জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করে। কোন পুরুষ অথবা মহিলা কর্তৃক খবরের কাগজের রাশিচক্রের কলাম পড়া অথবা পড়তে শোনাও সম্পূর্ন নিষেধ।

গনতন্ত্রঃ একটি বাতিল দ্বীন এবং এ ব্যাপারে সংশয় সমূহের জবাব

❖ প্রশ্ন-১। গনতন্ত্রের অর্থ এবং সংজ্ঞা কি?

উত্তরঃ-গণতন্ত্রের ইংরেজী শব্দ হল Democracy. Democracy শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ Demos I Cratus থেকে উদ্ভুত। Demos শব্দের অর্থ হল 'মানুষ/জনগণ' এবং Cratus অর্থ 'পরিচালনা'। Democracy এমন একটা পদ্ধতি যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরী করে তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই কাজটি হয় কোন সভা অথবা সংসদে। এবং এই পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে ঐ সকল আইন ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতিফল ঘটে।

আইনের অধ্যাপক ডক্টর আবদুল হামিদ মিতওয়ালী বলেনঃ শাসন ব্যবস্থায় 'গনতন্ত্র' জাতির প্রভূত্বের (রবের) নীতিতে পরিণত হয়েছে, অধিকন্তু সংজ্ঞানুযায়ী প্রভুত্ব হচ্ছে সেই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যার উপর অন্য কোন কর্তৃত্ব নেই। (Dr. Hamid Mitwali's Ruling System in Devoloping Country সংস্করণ ১৯৮৫, পৃঃ ৬২৫)

পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ যোসেফ ফ্রাংকেল বলেনঃ প্রভূত্বের অর্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যা এর উপরে অন্য কোন কর্তৃত্ব স্বীকার করে না এবং যার পশ্চাতে সিদ্ধান্তসমূহ পূনর্বিবেচনা করার মত কোন বৈধ কর্তৃত্বেও অধিকারী নেই। (যোসেফ ফ্রাংকেলের the International Relationship তুহামা পাবলিশিং, ১৯৮৪, পৃঃ ২৫)

❖ প্রশ্ন-২। গনতন্ত্র শিরকী এবং কুফরী দিকসমূহ কি ?

উত্তরঃ ইসলাম সম্পর্কে যার ন্যূনতম জ্ঞান আছে তিনি বুঝতে পারবেন মানুষকে মানুষের 'রব' হিসেবে উপস্থাপন করেছে এই গনতন্ত্র। কারণ 'গণতন্ত্র' এমন একটা পদ্ধতি যার দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় এবং যা আল্লাহ্‌র ঐ অধিকারের বিপক্ষে আচরণ করতে শেখায় যা একমাত্র আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত। এবং এটা মানুষকে আল্লাহ্‌র পরিশুদ্ধ একটি ইবাদত হতে ফিরিয়ে শির্‌কের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করায়। এটি মানুষকে আইন প্রণয়নকারীর স্তরে পৌঁছে দেয়। অথচ একমাত্র আইন প্রণয়নকারী হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

“এবং আল্লাহ্ হুকুম দেন, তাঁর হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।” (সূরা রা'দ ১৩:৪১)। তিনি আরও বলেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“ওদের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি?” (সূরা শূরা ৪২:২১)

এই সকল আইন প্রণয়নকারী জনপ্রতিনিধিরা যখন জনগণের জন্য আইন নির্ধারণ করে তা দ্বিধাযুক্ত অবস্থায় অথবা নির্দিধায়ে তারা সেটা মানতে বাধ্য থাকে। এভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাসমূহ প্রতিনিধিত্ব পায় আল্লাহ্ প্রদত্ত আদেশ গুলোর উপর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

أَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَٱلأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً

“তুমি কি দেখ না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে? তুমি কি মনে কর যে ওরা অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো পশুরই মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট।” (সূরা ফুরকান ২৫: ৪৩-৪৪)

অতএব মানবাধিকারের নামে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে এবং বিচারের ভার সে মিথ্যা উপাস্যের কাছে অর্পন করে, আর তারাই হল ‘তাগুত’ এই অন্যায় অধিকার বাস্তবায়নের অপর নামই হল আল্লাহ্র বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করা। যে সব মানুষ অথবা পদ্ধতিগুলো আল্লাহ্র নাযিলকৃত আইনের বিরুদ্ধে শাসন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেই ‘তাগুত’ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً

“আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন যারা দাবী করে যে তারা বিশ্বাস করে আপনার উপর এবং আপনার পূর্ববর্তীদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর তারা তাগুতের কাছে তাদের বিবাদপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে এর (তাগুতের সাথে) কুফরী করার আদেশ দেয়া হয়েছিল---।” (সূরা নিসা ৪:৬০)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেনঃ “আল্লাহ্র ইবাদত বাদ দিয়ে অথবা সত্য পথনির্দেশনা বাদ দিয়ে যে ব্যক্তির উপাসনা বা ইবাদত করা হয়; অথবা ঐ ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোনও আদেশ দেয় তাহলে সেই হল ‘তাগুত’। এই কারণে যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত শাসন করে তারাই হল ‘তাগুত’।” (আল-ফাতওয়া, খন্ড-২৮, পৃ:২০০)

মুহাম্মদ আল-আমিন আশ-শানক্বিতি (রহঃ) বলেনঃ ‘এবং কুরআনের এই আয়াতগুলো যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা’আলা প্রণীত এবং রাসূল (সঃ) এর মুখ নিঃসৃত আইনের পরিবর্তে শয়তান ও তার সাহায্যকারীদের মুখ নিঃসৃত স্বরচিত আইনের আনুগত্য স্পষ্ট কুফর এবং শিরক। এতে কোন সন্দেহ নেই’। (আদ্বওয়া আল-বাইয়ান, ৪র্থ খন্ড, পৃ:৮২-৮৫)

এখন সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা জেনে গেছে গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য কি? এর মূল লক্ষ্য হল অধিকাংশের ইচ্ছার ভিত্তিতে জনসাধারণকে শাসন করা যা আল্লাহ্র প্রত্যাদেশের বৈপরিত্যে ঘোষণা করে।

❖ প্রশ্ন-৩। গনতন্ত্র ইসলামিক শূরার মত এই যুক্তিতে যারা এতে অংশগ্রহণ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?

উত্তরঃ- কিছু অজ্ঞ লোকেরা গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের বৈধতা দেয়ার জন্য এক ইসলামিক শূরা বা মজলিসে শূরার সাথে তুলনা দেয়। তারা বলে গনতন্ত্র ইসলামিক শূরার অনুরূপ। আল্লাহর উপর ভরসা করে আমরা এইসব অজ্ঞ লোকদের জবাবে বলতে চাই-

প্রথমত: নামের পরিবর্তনের কারনেই মূল বিষয় পরিবর্তন হয়ে যায় না। মদকে যেরূপ ইসলামিক মদ লেভেল এটে দিলেই তা হালাল হয়ে যায় না, তেমনি বাতিল দ্বীন গনতন্ত্র কখনই ইসলামিক লেভেল এটে দিলে তা জায়েজ হয়ে যায় না। বরং তারা তাদের এসব বাতিল যুক্তির মাধ্যমে লোকদের প্রতারিত করতে চায়, অথচ আল্লাহ বলেন,

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ [البقرة/٩]

“তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।” (সূরা, বাক্বারাহ ২ঃ৯)

দ্বিতীয়ত: গনতন্ত্র ইসলামিক শূরার সামঞ্জস্য অবশ্যই নয়, কারন সবাই জানে যে, সংসদীয় সভা হচ্ছে শিরক্ এবং কুফরীর আড্ডাখানা, যেখানে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে নতুন আইন তৈরী করা হয়, আল্লাহর হালাল হারামকে

পরিবর্তন করা হয়। অথবা আল্লাহর আইনের কোন তোয়াক্কাই করা হয় না। নিজেরাই আইনদাতার রবের আসনে বসে। এ যেন এরূপ উদাহরন যা আল্লাহ আমাদের বলে দিয়েছেন-

"ভিন্ন ভিন্ন অনেক মাবুদ ভাল নাকি এক ইলাহ। তাঁর পাশাপাশি যার ইবাদত তোমরা কর কিছু নাম ব্যতীত কিছুই না যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখেছ, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি।"

সুতরাং গনতন্ত্রকে ইসলামিক শূরার সাথে তুলনা দেয়া হচ্ছে তাওহীদকে শিরকের সাথে, ঈমানকে কুফরীর সাথে তুলনা দেয়ার মত। এটা হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যারোপ। এটা হচ্ছে হক্বের সাথে বাতিলের মিশ্রণ, হেদায়েতের সাথে পথভ্রষ্টতার মিশ্রণ, নুরের সাথে জুলমের মিশ্রন। একজন মুসলিমের অবশ্যই ইসলামিক শূরার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হবে, তাহলে জানতে পারবে এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল ফারাক।

শূরা হচ্ছে শারয়ী পথ ও পদ্ধতি, অপরদিকে গনতন্ত্র হচ্ছে মানুষের নাফস ও খাহেশাতকে পূরন করার জন্য ইয়াহুদী, খ্রিষ্টানদের তৈরীকৃত পদ্ধতি।

আল্লাহ সুবঃ বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الشورى/٢١]

"ওদের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি?" (সূরা শূরা ৪২:২১)

ইসলামিক শূরা হচ্ছে আল্লাহর আইনকে, তার শরীয়াকে বাস্তবায়নের জন্য, অপরদিকে গনতন্ত্র হচ্ছে আল্লাহর শরীয়া ও বিধানকে বাদ দিয়ে মানুষের উপর মানুষের আইনকে বাস্তবায়নের জন্য।

আল্লাহ সুবঃ বলেন,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [يوسف/٤٠]

"বিধান দিবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। তিনি আদেশ দিয়েছেন- তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করার জন্য। ইহাই শ্বাশত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা সম্পর্কে অবগত নহে।" (সূরা ইউসুফ ১২:৪০)

গনতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস, অধিকাংশ জনগন যা চাইবে তাই বাস্তবায়ন হবে, অর্থাৎ গনতন্ত্রে অধিকাংশ জনগন বা তাদের

মনোনীত প্রতিনিধিরাই হচ্ছে রব এবং ইলাহ। কিন্তু ইসলামিক শূরার ব্যক্তিরা আদেশের অধীন, তারা বাধ্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্য করতে এবং কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে আমিরদের আনুগত্য করতে। ইসলামিক নেতারা অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। বরং অধিকাংশ বা সবাই নেতার আনুগত্য করতে বাধ্য যতক্ষন না তিনি আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেন।

গনতন্ত্র এবং এর আহবায়করা আল্লাহর আইন ও ফায়সালার কাছে আত্মসমর্পন করে না। Democracy বা গনতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে কাফেরদের ভূমিতে, এবং বেড়ে চলেছে সেখানে এবং দুনিয়াব্যাপী মানুষদের শিরক, কুফরের দিকে নিয়ে যাচেছ। মদ, জুয়া, সুদ, বেশ্যাবৃত্তি, লটারী, সমকামিতাসহ অনেক অনেক হারাম এবং খারাবীকে অনুমোদন দিয়েছে এই গনতন্ত্র, যেহেতু তা অধিকাংশ জনগন কামনা করে।

সুতরাং যারা এহেন গনতন্ত্রকে ইসলামের সাথে তুলনা দেয়, তাদের লজ্জা করা উচিত, আল্লাহকে ভয় করা উচিত কিসের সাথে তারা কিসের তুলনা দিচ্ছে। নিজেদের খারাবীকে জায়েজ করার জন্য এরূপ বাতিল উপমা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। যার নুন্যতম সাধারন জ্ঞান আছে সে বুঝতে পারবে কত আকাশ-পাতাল পার্থক্য ইসলাম এবং গনতন্ত্রের মাঝে।

❖ প্রশ্ন-৪। মিশরের তৎকালীন রাজসভায় একজন মন্ত্রী হিসেবে ইফসুফ (আঃ) এর যোগদানকে যারা অপব্যাখ্যা করে গনতন্ত্রে যোগদানের দলীল হিসেবে গ্রহণ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?

উত্তরঃ- মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (٥٤) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ [يوسف/٥٤-٥٦]

"রাজা বলল ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস; আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব। অতঃপর রাজা যখন তাঁর সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, আজ তুমি তো আমাদের নিকট মর্যাদাশীল বিশ্বাস ভাজন হলে। ইউসুফ বললেন, 'আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম ও সুবিজ্ঞ রক্ষক।' এইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে সেই দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি। আমি সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিফল নষ্ট করি না।" (সূরা ইউসুফ ১২:৫৪-৫৬)

তাই যারা ইউসুফ (আঃ)-এর উদাহরণ দিতে গিয়ে এই আয়াতটি প্রদর্শন করে দলিল হিসাবে তারা বলতে চায় যেহেতু ইউসুফ (আঃ) একজন অমুসলিম রাজার রাজ্যে মন্ত্রী পরিষদে যোগ দিতে পারেন তাহলে কেন আমাদের পক্ষ হয়ে একজন প্রার্থী সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবে-এটা গ্রহণযোগ্য হবে না?

যারা এই আয়াতগুলোকে তাদের পক্ষে দলিল হিসাবে ব্যবহার করে তারা হয়তো ভুলে গেছে কারাগারে ইউসুফ (আঃ) তাঁর দুই সাথীকে কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [يوسف/٤٠]

"বিধান দিবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। তিনি আদেশ দিয়েছেন- তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করার জন্য। ইহাই শ্বাশত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা সম্পর্কে অবগত নহে।" (সূরা ইউসুফ ১২:৪০)

তাহলে আমরা কিভাবে বলব যে, ইউসুফ (আঃ) ঐ রকম একটা সরকার ব্যবস্থাকে সাহায্য করেছিলেন অথবা তাদের সাথে আপোষ করেছিলেন যারা মানব রচিত আইন প্রণয়ন করেছিল যখন তিনিই অন্যদেরকে এই বিধান/ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আল্লাহ্ সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন এই বলে যেঃ "বিধান দেবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্রই।"

প্রথমতঃ যারা এই (১২:৫৪-৫৬) আয়াতগুলোকে উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করে, দলিলের অভাবে তাদের দাবীকে প্রমাণ করার জন্য যে, তৎকালীন সরকার ব্যবস্থায় প্রচলিত ইউসুফ (আঃ)-এর শরীআহ্ সম্মত নয় এবং এই উদাহরণের দ্বারা আর কিছুই নির্দেশ করার নেই। বরং এই আয়াতগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন রাজা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পনের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন

عن أبي إسحاق الكوفي، عن مجاهد قال: أسلم الملك الذي كان معه يوسف.

ইবনে জারীর আত-তাবারী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ "ইউসুফ (আঃ)-এর সময় যেই রাজা ছিলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন"। (জামি আল-বাইয়ান আত-তাওয়ীল আই আল-কুরআন, ৯/২১৭)

আল-বাঘাবী বলেনঃ "মুজাহিদ (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেছেনঃ ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে অতিবিনয়ের সাথে ইসলামের দিকে ডাকা থেকে ক্ষান্ত হননি যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজা এবং আরও অনেক লোক ইসলামে প্রবেশ করে।"

আরও বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আঃ) নিজে একজন শাসকও ছিলেন বটে কেননা মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্বের পাশাপাশি তাঁর উপর মিশরের শাসন ভারও ন্যস্ত হয়েছিল।

ইবনে জারীর আত-তাবারী, আস-সুদ্দী হতে বর্ণনা করেনঃ রাজা, ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরের উপর নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি কর্তৃপক্ষেও একজন সদস্য ছিলেন এবং তিনি যে কোন কিছু ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতেন এবং ব্যবসা ও অন্যান্য যত বিষয় ছিল তা তদারকি করতেন। এর প্রমাণ সূরা ইউসুফ, ৫৬ আয়াতের শেষ অংশে পাওয়া যায়ঃ

{وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ} [يوسف: ٥٦]

এই ভাবে আমি ইউসুফ (আঃ)-কে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; যে সেই দেশে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত।

"... সেই দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতেন...", এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে জারীর আত-তাবারী, ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, 'মিশরের সকল কর্তৃত্ব ইউসুফের (আঃ) কাছে হস্তান্তর করা হয়ে ছিল এবং যে কোন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চুড়ান্ত।

আল-কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তাঁর বিছানার উপর বসলেন এবং রাজা তার পরিষদবর্গ এবং স্ত্রীগণসহ তাঁর সাথে পরিচয় পর্বের জন্য তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং মিশরের সকল কর্তৃত্ব তাঁর (আঃ) কাছে হস্তান্তর করা হয়।" এ সম্পর্কে আল-কুরতুবী বলেনঃ "যখন রাজা, ইউসুফ (আঃ)-এর উপর দায়িত্ব সমর্পন করলেন তখন তিনি (আঃ) সাধারণ জনগণের উপর উদার প্রকৃতির মনোভাব পোষণ করলেন এবং তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দিকে ডেকেছিলেন যতক্ষন পর্যন্ত না তিনি তাদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাই পুরুষ-মহিলা উভয়ই তাকে ভালোবাসতো। এই একই ধরনের কথা পাওয়া যায় আঃ ওয়াহ্হাব, আস-সুদ্দী এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের বর্ণনায় ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি রাজার উক্তিতে-যখন রাজা, তার পরিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি দেখেছিলেন শাসন কর্তৃত্ব এবং ন্যায়বিচার প্রথা প্রচারের ক্ষেত্রে। রাজা বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমতা দান করলাম, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করতে পারো। এবং আমরা তোমার একনিষ্ঠ অনুসারী এবং আমি তোমার আনুগত্য করব এবং আমি তোমার কোন বিষয়ের সহযোগীর চেয়ে বেশী কিছু নই। (আল-জামী'লি আহকাম আল-কুরআন, খন্ড ৯/২১৫)

তাই এক্ষেত্রে যদি এইরকম কোন সম্ভাবনা থাকে যে, ঐ রাজা ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাহলে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে (১২:৫৪-৫৬) দলিল হিসাবে ব্যবহার করাটা প্রশ্নের সম্মুক্ষীন হবে এবং ভূল হবে। কেননা ইসলামের একটা

নীতি হল, اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال "যদি কোন সম্ভবনা/ সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে তাকে দলিল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না ।

❖ প্রশ্ন-৫ । দুই প্রকারের খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপের পক্ষ অবলম্বন করার নীতিতে যারা গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের দলীল গ্রহণ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?

উত্তরঃ- গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সমর্থকরা ইসলামের এই নীতিকে দুইভাবে ব্যবহার করে থাকেঃ ১) যে প্রার্থীর আদর্শ অপেক্ষাকৃত কম ইসলাম বিরোধী তাকে ভোট দেয়ার মানে হলো কম খারাপের পক্ষ নেয়া; ২) অন্য দিকে, কাউকে যদি ভোট না দেয়া হয় তাহলে বেশী খারাপ প্রার্থীটি নির্বাচিত হতে পারে এই আশংকায় কম খারাপকে ভোট দেয়া;

আসলে ইসলামের বেশীরভাগ নীতি নিয়ে এভাবেই মানুষ মানুষকে বিভ্রান্ত করে । তারা সঠিক নীতিটি সুন্দরভাবে উল্লেখ করে কিন্তু এর প্রয়োগ করে ভুল অথবা এমন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করতে চায় যেখানে ঐ নীতি খাঁটে না ।

বিশেষ করে এই নীতিটির ক্ষেত্রে তাদের ভুল হলো, তারা এর প্রয়োগ বোঝেনি । শুধুমাত্র সেখানেই এটি প্রয়োগ করা যাবে যেখানে, দুটি পথের একটি গ্রহণ না করে উপায় নেই । কিন্তু যদি এগুলো থেকে বেঁচে থাকার উপায় থাকে অর্থাৎ দুটি পথের একটি গ্রহণ করতে যদি বাধ্য করা না হয়- তাহলে সেখানে এই নীতি প্রযোজ্য নয় । অর্থাৎ কাউকে যদি দুটি হারামের একটি গ্রহণে বাধ্য করা হয় তা হলে সে কম গুনাহের কাজটি করতে পারে । কিন্তু এমন ক্ষেত্রে নয়- যেখানে কেউ বাধ্য করছে না সেই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় । ভোটের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগকে এভাবে দেখা যায়ঃ কোন এক ব্যক্তি একজন মুসলিম ভাইকে মদ খাওয়ার দাওয়াত দিল । সেখানে একটি মদে থাকবে ৫০% এলকোহল এবং অন্য একটি মদে ২৫% এলকোহল । সুতরাং সে দাওয়াত গ্রহণ করে ২৫% এলকোহলের মদটি পান করল ।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আমাদের কেউ বাধ্য করছে না; তাই কম খারাপকে সমর্থনের নামে একটি শির্‌ক করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । আমরা ভোট না দিলে যে ক্ষতি হবে তার তুলনায় এই শির্‌ক (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আইন তৈরীর অধিকার দেয়া) অনেক অনেক বেশী ক্ষতিকর ।

❖ প্রশ্ন-৬ । "ক্ষতি অবজ্ঞা করে সুবিধা গ্রহণ করা" এই নীতি গনতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ভূল কিভাবে?

উত্তরঃ- এই এই নীতির দোহাই দিয়ে যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে জায়েয করতে চায় তাদের ভাষ্য হলো, এমন একজন ইসলামপন্থী নেতাকে নির্বাচিত করলে,

যার কর্মপন্থা মুসলিমদের জন্য অন্য নেতাদের থেকে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর এবং একটি ইসলাম বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করলে যতটা লাভ হবে তা এই হারামের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী।

প্রথমেই বলতে হয়, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হলো শির্‌ক। সুতরাং এর সুবিধা আলোচনা করে একে উৎসাহিত করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র তাওহীদকে উপেক্ষা ও অমান্য করে তার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করাকে কি করে সমর্থন করা যায়। সুতরাং উপরোক্ত কথাগুলো বর্জনীয় এবং এর দ্বারা মুসলিমদের ভোট দানে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণরূপে ভুল।

আর যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সত্যিকার অর্থেই কোন সুবিধা থেকে থাকে তাহলে- তার পরেও এটি হালাল হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ [البقرة/٢١٩]

"তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুনঃ এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, তবে মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশী।" (সূরা বাকারা ২:২১৯)

ইবনে কাসির (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, "এসবের লাভগুলো সবই ইহলৌকিক। যেমন, এর ফলে শরীরের কিছু উপকার হয়, খাদ্য হজম হয়, মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায়, একপ্রকারের আনন্দ লাভ হয়, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে এর ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা আছে। একইভাবে জুয়াখেলাতেও বিজয়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এগুলোর উপকারের তুলনায় ক্ষতি বা অপকারই বেশী। কেননা, এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পাওয়ার সাথে সাথে দ্বীনও ধ্বংস হয়ে থাকে।" আর একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا "কিন্তু এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশী।" (সূরা বাকারা:২১৯)

একইভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনেরও কিছু সুবিধা বা লাভ থাকতে পারে, কিন্তু এতে অংশ নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মানুষকে আইনদাতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় নিজ দ্বীনের জন্য যেকোন লাভের চাইতে অনেক অনেক গুন বেশী ক্ষতিকর। আর একথা আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, মদ খাওয়া বা জুয়া খেলার চাইতে অনেক বেশী বড় গুনাহ হলো শির্‌ক আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা এবং এর পরিণতিও অনেক ভয়াবহ।

❖ প্রশ্ন-৭। "আমলসমূহ সর্বোপরী নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল" এই ভিত্তিতে যারা বলে আমরা ভাল নিয়্যাতে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ করি তাদের এ কথা বাতিল কিভাবে?

উত্তরঃ- "আমরা তো এটা মুসলিমদেরকে যুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য করছি; যাতে মুসলিমদের সুবিধা হয়"- এভাবেই অনেকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার পক্ষে অজুহাত দাঁড় করায়। তারা বলতে চান যেহেতু, একটি সৎ উদ্দেশ্যে, ভালো নিয়্যতে এ কাজটি করা হচ্ছে তাই এতে কোন সমস্যা নেই- এটি বরং প্রশংসনীয়।

আসলে এই মারাত্মক ভুলটি তারা শুধু এখানেই করছে তা নয়। প্রথম কথাটি হলো, উত্তম নিয়্যত থাকলেই গুনাহ উত্তম আমল বা সাওয়াবের কাজ হয়ে যায় না। আবু হামিদ আল গাজ্জালী (রহঃ) বলেনঃ "গুনাহ, এগুলোর প্রকৃতি কখনো নিয়্যতের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায় না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাদীস (প্রত্যেক আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল) থেকে অজ্ঞ বা জাহিল লোকেরা এভাবেই সাধারণ অর্থে ভুল বুঝ নেয়, তারা মনে করে যে, নিয়্যতের দ্বারা একটি গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের মনকে খুশী করার জন্য কারো গীবত করে, অথবা ঐ ব্যক্তি যে অন্যের টাকায় অভাবীদের আহার করায়, অথবা কেউ যদি হারামের পয়সায় স্কুল, মসজিদ বা সৈন্যদের ক্যাম্প তৈরী করে দেয় উত্তম নিয়্যতে, তখন তাদের গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়! এসবই জাহেলীয়াত বা মূর্খতা, এই সীমালংঘনের ও অপরাধের উপর এর নিয়্যতের কোন প্রভাব নেই। বরং ভালো উদ্দেশ্যে খারাপ কাজ করার এই নিয়্যত শরীয়তবিরোধী– যা আরেকটি অন্যায়----।"

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) আরও বলেছেনঃ "সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই বাণীঃ "প্রত্যেক আমলই তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল"– তিনটি জিনিসের (ইবাদত, মুবাহ ও গুনাহ) এর মধ্যে শুধুমাত্র আনুগত্য ও মুবাহ (অনুমতি প্রাপ্ত আমল)-এর মধ্যে সীমিত, গুনাহের জন্য নয়। এটা এই কারণে যে, আনুগত্য গুনাহ-তে পরিণত হয় (খারাপ) নিয়্যতের দ্বারা। বিপরীত দিকে, একটি খারাপ কাজকে কখনোই নিয়্যতের দ্বারা আনুগত্যে পরিণত করা যায় না।"

(ইলাহইয়া উলুমুদ্দীন, ৪/৩৮৮-৩৯১)

শেখ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ, অপর শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ এর ফাতওয়ার সমালোচনা করেছেন, যেখানে তিনি (বিন বাজ) সংসদ সদস্য হওয়া এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়াকে অনুমতি দিয়েছেন। শেখ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ বলেনঃ "আমি বলি এই ফাতওয়াটি ভুল। ইমাম

গাজ্জালী (রহঃ)-র যে উদ্বৃতি আমরা দিয়েছি সেই অনুযায়ী, গুনাহ কখনো নিয়্যতের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া কুফর হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহর একটি। আর পার্লামেন্টে অংশ নেয়া হলো কুফর, এটা নিয়্যতের কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটা এই কারণে যে, পার্লামেন্ট হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের একটি মাধ্যম। সুতরাং এতে অংশ নেয়া বা ভোট দেয়ার রায় জানতে হলে গণতন্ত্র সম্পর্কিত রায়ও জানতে হবে, আর এই রায়ও নির্ভর করে এর বাস্তবতা জানার উপর।" (আল-জামি ফি তালাব আল ইলম আশ শারীফ-১/১৪৭-১৪৮)

সুতরাং উত্তম নিয়্যত দিয়ে একটি গুনাহকে অনুমোদন দেয়া যাবে না। আর মুসলিমদের যুল্‌ম থেকে রেহাই দেয়ার নামে কুফর বা শির্‌ক করাতো কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদি তাই হতো তাহলে আমরা বাইবেল আর মূর্তি বিক্রয় করে অভাবী মুসলিমদেরকে সাহায্য করতাম!

❖ প্রশ্ন-৮। "ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করার" নামে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ বাতিল কিভাবে?

উত্তরঃ- গণতন্ত্রের পক্ষে যারা কথা বলে তারা এই নীতিটিও ব্যবহার করে থাকে। যে প্রার্থীর আদর্শ মুসলিমদের জন্য কম ক্ষতিকর বা কিছুটা উপকারী তাকে নির্বাচিত করার সাথে তারা এই নীতিটির তুলনা করে। কারণ, এতে ভালো প্রার্থীর ভালো কাজে সহায়তা করে মন্দ প্রার্থীকে বাঁধা দেয়া হচ্ছে। এক শ্রেণীর লেখকরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকে বৈধ বলেই ক্ষান্ত হয় না - গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য, পবিত্র দ্বায়িত্ব বলে মনে করে (নাউযুবিল্লাহ)। শুধু তাই নয়, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং মানুষদের এটা থেকে বিরত থাকতে বলে তাঁদেরকে এইসব লেখক যালিম বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণই হলো শির্‌ক, আর এটাকেই সর্বপ্রথম নিষেধ করতে হবে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলার পাশে অন্যকে স্থাপন করে আইন রচনার জন্য- যা সুস্পষ্ট শির্‌ক। যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে পারে, সে খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে উপরোক্ত নীতিটি কতটা ভুলস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। তারা যেভাবে এই নীতিটি ব্যবহার করে, তা একেবারেই উল্টো, এই নীতির সঠিক ব্যবহার বরং তাদেরই বিরুদ্ধে যায়। ভালো কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শর্ত হলো, এর পন্থাটি শরীয়ত সম্মত হতে হবে। এক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত হলো, ঐ মুনকার (খারাপ) নিষেধ করতে গিয়ে যেন আরো

বড় মুনকার (ক্ষতি) না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করা। ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) বলেনঃ "সুতরাং যদি কারো মন্দ কাজের নিষেধ করা আরো বড় মন্দের দিকে পরিচালিত করে যা আল্লাহ্ (সুবঃ) ও রাসূল (সঃ) বেশী অপছন্দ করেছেন (প্রথম মন্দের চেয়ে), তাহলে তা নিষেধ করা বৈধ নয়। যদিও আল্লাহ্ (সুবঃ) এটি (প্রথম মন্দ) অপছন্দ করেন এবং এটি যারা করে তাদের অপছন্দ করেন। (ই'লাম আল মুওয়াক্কীন, খন্ড ৩, পৃঃ ৪)

যারা মন্দ প্রার্থী আর ভালো প্রার্থীর কথা বলে নির্বাচনে অংশ নেয়াকে বৈধ করে; তারা এ মন্দ ঠেকাতে শির্ক বা কুফরীর মতো মূল্য দিতে বলে। দুটি জিনিসকে মেপে দেখুন তো, সমান হয় কিনা। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [البقرة/٢١٧]

"ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।" (সূরা বাকারা ২:২১৭)

এখানে, ফিৎনা বলতে আল্লাহ্ (সুবঃ) শির্ক ও কুফরীকে বুঝিয়েছেন, যা অধিকাংশ তাফসীরে পাওয়া যায়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেনঃ "যদিও হত্যা করার মাঝে পাপ ও অমঙ্গল রয়েছে তবে কাফিরদের ফিৎনার (কুফরী) মাঝে রয়েছে তার চেয়েও অধিক গুরুতর পাপ এবং অমঙ্গল।" *(আল ফাতওয়া-২৮/৩৫৫)*

শেখ আলী আল-খুদাইর তাঁর "লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্ - এই সাক্ষ্য দানে আহ্বান" বইটিতে শেখ সুলাইমান বিন সাহমান (রহঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ "আল-ফিৎনাহ হলো কুফর। সুতরাং সমস্ত বেদুঈন ও নগরবাসী যদি যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যায় তা অনেক কম গুরুতর ঐ জমীনে একটি তাগুতকে নির্বাচন করার চেয়ে যে এমন আইনে শাসন করে যা ইসলামের শরীয়াত বিরোধী।"

সুতরাং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের অজুহাতে শির্ক করা যাবে না, তাতে অত্যাচার যতই কমে যাবার সম্ভাবনা থাকুক, তাতে কিছুই যায় আসে না। এটা এই জন্যই যে মুসলিমরা অত্যাচারের কারণে যে ক্ষতির শিকার হচ্ছে, তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে শির্ক করার মাধ্যমে।

❖ প্রশ্ন-৯। ''নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণ করার অনুমতি'' এই যুক্তিতে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ ভ্রান্ত কিভাবে?

উত্তরঃ- যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ হারাম বলে মনে করেন, তারা অজুহাত দেন যে, এখন মুসলমানদের জন্য একটি জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে,

সুতরাং এমতাবস্থায় হারাম কাজে অংশগ্রহণ করাকে ইসলাম সমর্থন করে। অর্থাৎ যে জিনিসটি হারাম ছিল তা এই প্রেক্ষাপটে বা পরিস্থিতিতে হালাল!

এই নীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিৎ যা তারা করেননি। কারণ, এ নীতিটি সর্বক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করার মতো নয়। বরং এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে এবং কিছু বাধ্যবাধকতা বা সীমা আছে যার কারণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমতঃ অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে 'প্রয়োজন' বা 'জরুরী' বলা যায় না। সুতরাং আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন আমরা সত্যিকার প্রয়োজন ছাড়া এর নীতির নমনীয়তাকে ব্যবহার না করি। মানুষের 'প্রয়োজন' বা জরুরী অবস্থা ৫ প্রকারেরঃ ১. দ্বীনের জন্য আবশ্যকীয় ২. জীবনের জন্য আবশ্যকীয় ৩. মানসিক সুস্থতার জন্য আবশ্যকীয় ৪. রক্ত (বংশ) বা সম্মান রক্ষার্তে আবশ্যকীয় ৫. সম্পদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়

এই সকল প্রয়োজনীয়তা সমান পর্যায়ের নয়। যেমন, কারো জ্বিনা করা বা কোন মাহরাম মহিলাকে নিকাহ (বিবাহ) করার অজুহাত কখনো এই হতে পারেনা যে, আমার যৌন আকাঙ্খা পূরণ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সকল প্রয়োজনকেই এই নীতির আওতায় ফেলা যাবে না, এক্ষেত্রে একটি সীমারেখা আছে।

দ্বিতীয়তঃ শির্‌ক বা কুফরের ক্ষেত্রে এই নীতি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শির্‌ক এবং কুফর থেকে নিজেকে রক্ষা করাই সবচেয়ে আবশ্যকীয় ব্যাপার, মানুষের দ্বীন রক্ষা করাটাই তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। একটি প্রয়োজন রক্ষা করতে গিয়ে আরো বড় প্রয়োজন বিসর্জন দেয়া কখনোই অনুমোদনযোগ্য নয়। শুধুমাত্র ইকরাহ (চুড়ান্ত জোর জবরদস্তি)-এর ক্ষেত্রেই এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আমরা শির্‌ক ও কুফরকে হালাল করার জন্য এমন একটি নীতির সাহায্য নেয়ার কথা কিভাবে ভাবতে পারি?

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেনঃ "নিশ্চয় যেসব বস্তু হারাম; এর মধ্যে যেসব বস্তু কোন অবস্থাতেই ইসলামের শরীয়াতে অনুমোদন দেয়া হয়নি এবং এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনাও রয়েছে, (সেগুলো) না আবশ্যকীয়তায় আর না এছাড়া অন্য কোন কারণে অনুমোদনযোগ্য, যেমন, শির্‌ক, অবৈধ যৌনাচার এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা বলা এবং স্পষ্ট সীমালংঘন। এই চারটি বিষয় হলো সেইগুলো যার সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেছেনঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"বলুনঃ আমার রব হারাম করেছেন যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অসংগত বিরোধীতা, আল্লাহ্‌র সাথে এমন কিছু শরীক করা যার কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।" (সূরা আরাফ ৭:৩৩)

শেখ আলী আল খুদাইর, শেখ হামাদ বিন আতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة/١٧٣]

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যার উপর জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্য নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমান ও সীমালংঘনকারী না হয় তার কোন পাপ হবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।" (সূরা বাকারা ২:১৭৩)

সুতরাং এখানে 'অনন্যোপায়' অবস্থায় থাকাকে শর্ত করা হয়েছে, যেন এগুলো কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অন্যায় বা সীমালংঘন থেকে না খায়। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে (প্রয়োজন এবং জোর-জবরদস্তি) পার্থক্য অস্পষ্ট বা গোপন নয়।" তিনি (ইবনে আতিক) আরো বলেছেনঃ "এবং অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত বস্তু খাওয়ার অনুমতির মাঝে কি এমন কিছু আছে যা স্বেচ্ছায় দ্বীন ত্যাগ করাকে সমর্থন করে? এ ধরনের তুলনা কি এমন নয় যে, একজন ব্যক্তি তার বোন বা মাকে বিয়ে করল, সেই নীতির ভিত্তিতে যেখানে একজন স্বাধীন মানুষকে একটি দাসীকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে অথবা তার বিয়ে করার যোগ্যতা নেই (একজন স্বাধীন নারীকে)? এই বিভ্রান্তি ছড়ানো মানুষগুলো তাদের চেয়েও বেশী (বাড়াবাড়ি) করছে যারা তুলনা করে- {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] "বেচাকেনা তো সুদেরই মতো।" (সূরা বাকারা ২:২৭৫)। (হিদায়াত আত-তারিক, পৃঃ১৫১)

❖ প্রশ্ন-১০। "জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফরী ক্ষমার যোগ্য" মানুষ কিভাবে এর অপপ্রয়োগ করে গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের ব্যাপারে?

উত্তরঃ- এর আগে আমরা এ ব্যাপারে প্রমাণ দিয়েছি যে প্রয়োজনে কুফর বা শির্ক করার কোন অনুমতি নেই। আমরা এখন যে নীতিটি আলোচনা করবো তা হচ্ছে নির্বাচনের পক্ষ অবলম্বনকারীদের শেষ অস্ত্র। তারা যেকোন উপায়ে বলতে চায় যে, এটি একটি ইকরাহ (জোরজবরদস্তি) সংক্রান্ত বিষয়। হ্যাঁ, আমরাও বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই জোরজবরদস্তি নিপীড়নের

স্বীকার হয়, তাহলে তার জন্য এটি ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু, আমরা যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এই ক্ষেত্রে ইকরাহর সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই। প্রথম কথা হলো, এই নীতিমালা সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয় যে স্বেচ্ছায় কোন কাজ করে। এক্ষেত্রে যে তাকে জোর করানো হয়েছে, সেই প্রমাণ থাকতে হবে।

ডঃ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল ওয়াহাবী বলেন, "এটা সেই প্রকারের যেখানে শুধুমাত্র ঐ নিপীড়িত ব্যক্তিকেই জোর করা হচ্ছে এবং তার আর কোন উপায় বা ক্ষমতা নেই।" (নাওয়াকিদ আল ঈমান আল ইতিকাদিইয়্যাহ ওয়া যাওয়াবিত আত তাকফির ইনদাস সালাফ, ২/৭)

সুতরাং, যারা এই যুক্তি দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে বৈধ করে তারা কখনোই এই দাবী করতে পারে না যে তাদেরকে এই কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। কারণ, এখানে মুসলিমদেরকে বলা হয় 'স্বতস্ফুর্তভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করুন'।

'ইক্রাহ'-এর শর্তের ব্যাপারে ইবনে হায্র (রহঃ) বলেনঃ "ইকরাহ'র ৪টি শর্ত রয়েছেঃ

১) যে জোর করছে তার ঐ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে সেই সাথে যাকে জোর করা হচ্ছে সে এটি ঠেকাতে এমনকি এর থেকে পালাতেও অক্ষম। ২) এ ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট ধারণা আছে যে, সে যদি অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে ঐ হুমকি তার ওপর পড়বে। ৩) তাকে যে হুমকি দেয়া হচ্ছে তা অতি নিকটে অর্থাৎ যদি বলা হয়, "তুমি যদি এটা না কর, তোমাকে আগামীকাল মারব", তাহলে তাকে নিপীড়িত বলা যাবে না। এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে, তাহলো যদি নিপীড়নকারী একটি সময় নির্ধারণ করে দেয় যা অতি অল্প এবং সাধারণত সে এই সময় পরিবর্তন করে না। ৪) যাকে জোর করা হয়েছে তার থেকে এমন কিছু প্রকাশ হবে না যা দ্বারা বোঝা যায় যে সে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করছে। *(ফাতহুল বারী, খন্ড ১২, পৃঃ ৩১১)*

সুতরাং এই নীতিটি সঠিক যে, সত্যিকার অর্থেই যদি কাউকে বাধ্য করা হয় তবে তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ ক্ষমা যোগ্য। তবে আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তারা যেটাকে এখন ইকরাহ যা জোর-জবরদস্তি বলছেন তা আসলে ইকরাহ-র শর্তাবলী পূর্ণ করে না।

❖ প্রশ্ন-১১। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে রায় কি? অজ্ঞতার ভিত্তিতে ভাল নিয়্যাতে যে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে তাকফীর করার পূর্বে করনীয় কি?

উত্তরঃ- যারা এই শির্‌কী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে তারা যে কুফরীতে লিপ্ত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিছু সন্দেহ-সংসয় ও ভুল ধারণার অজুহাতে তাদের এসব কাজ অনুমোদনযোগ্য নয়, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবে এটাও সমানভাবে নিশ্চিত যে অনেক মুসলমান ব্যাপারটির আসল রূপ পুরোপুরি অনুধাবন না করে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণে সকলের প্রতি আহবান জানায়। যদিও আমরা বলি না যে ভাল নিয়্যতে কোন কাজ করলেই তা শিরক ও কুফরী থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। আসলে সঠিক ব্যাপার হল শিরক ও কুফরী করার ব্যাপারে অজ্ঞতা তাদের ভাল নিয়্যতের কারণে তাদের কুফরীর বাইরে নিয়ে আসে না।

অতএব, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কোন শির্‌ক বা কুফর করলেই সেটা মাফ হবে এমন কথা আমরা বলতে পারিনা। তবে **"যেহেতু অনেকেই এই বিশেষ (গণতন্ত্র) বিষয়ে অজ্ঞ আর তাছাড়া বিষয়টি আরও জটিল হয় যখন এটি জায়েজ করার লক্ষ্যে আলেমগণ ফিকহের সেই সব নীতির ভিত্তিতে নানান ফাতওয়া দেন, যেগুলো আমরা ইতোমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং এরকম অবস্থায় যে কাউকে তৎক্ষণাৎ কাফির বলাটা বাড়াবাড়ি বা উগ্রতা। যতক্ষন না তার কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার তুলে ধরা হচ্ছে এবং এসকল বিভ্রান্তি অপসারণ করা হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত আমরা তাকে তাকফির করতে পারি না।"**

যারা তড়িঘড়ি করে সকল ভোটদানকারীকে তাকফির করে এবং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকদিসী বলেনঃ "আর একারণেই আইন প্রণয়নকারী প্রতিনিধিদের কর্মকান্ডের বাস্তবতা এবং এর মধ্যে যেসব কাজ কুফর এবং তাওহীদ ও ইসলাম বিনষ্টকারী সেগুলো ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করার আগে এমন কাউকে (ভোটার) তাকফির করার জন্য ব্যস্ত হওয়া জায়েয নয়। এরপরও যদি সে ভোট দান করে তবে সে কুফরী করল। সুতরাং ভোটারদের ক্ষেত্রে পার্থক্যসমুহ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, সবাই আইনপ্রণেতা তৈরীর উদ্দেশ্যে ভোট দেয় না তাদের (অজ্ঞতার কারণে) অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে তার কাছে সত্য প্রকাশ করার আগে তাকে তাকফির করা যাবেনা, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে, যে তার নিয়্যত জানেনা তার কাছে, মনে হবে যে, ঐ ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত আছে। কারণ, গণতন্ত্রেও ক্ষেত্রে অনেক ভুল বোঝাবুঝি, অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে; আর তাছাড়া 'গণতন্ত্র', 'পার্লামেন্ট' গুলো সবই বিদেশী শব্দ, তাই অনেকেই

বাস্তবতা না বুঝে এর কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। এর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মত যে এমন কিছু কথা মুখ দিয়ে বলেছে যার অর্থ সে নিজেই জানে না।

সুতরাং যারা গণতন্ত্র ও এতে ভোটদানের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত জানে; তাদের একান্ত দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা এবং এ বিষয়ক বিভ্রান্তিসমুহ দুর করা।

প্রশ্ন-১২। ইসলাম ও গনতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্যগুলো কি কি?

উত্তরঃ ইসলাম ও গণতন্ত্রের কিছু মৌলিক পার্থক্য-

গণতন্ত্র	*ইসলাম*
১) গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি 'জনমত'।	১) ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়।
২) সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম 'গণতন্ত্র'।	২) আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম।
৩) সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ।	৩) সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ্।
৪) সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ।	৪) সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্।
৫) মানব রচিত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।	৫) আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।
৬) মত প্রকাশে, ভোট দানে ও নির্বাচনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত।	৬) মানুষ হিসেবে সকলেই সাধারণভাবে এসব অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গুণীজনেরা বিশেষভাবে মুল্যায়িত হবেন।
৭) উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান বিবেচিত।	৭) উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরষে প্রভেদ বিদ্যমান।
৮) নারী ও সংখ্যালঘুরা সাধারণ সমাধিকার ভোগ করবে।	৮) শক্তি ও মেধায় তারতম্যের কারণে নারী ও সংখ্যালঘুরা সংরক্ষণ নীতির অধীনে ভোগ করবে বিশেষ অধিকার।
৯) পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক বিশেষ আদর্শ। নৈতিকতার কোন বালাই নেই গণতন্ত্রে। যেমন: জরায়ুর স্বাধীনতা বা সমকামিতা	৯) শাশ্বত আদর্শ ও নৈতিক মানসম্পন্ন পরমত সমাদৃত। অনৈতিক পরমত ইসলামে বর্জণীয়।

কোন মতামতকেই বর্জন করতে বাধ্য নয় গণতন্ত্র ।	
১০) গরিষ্ঠের সমর্থন সকল বৈধতার মানদন্ড ।	১০) শাশ্বত বা প্রত্যাদিষ্ট বিধান গরিষ্টের সমর্থন ছাড়াই বৈধ ।
১১) জাগতিক উন্নয়নেই সকল চেতনা সীমিত এই অর্থে প্রগতি ।	১১) জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে চেতনা পরিব্যপ্ত, এই অর্থে প্রগতি ।
১২) জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি ।	১২) চরম জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি ।
১৩) মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার কার্য নিয়ন্ত্রিত ।	১৩) আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন দ্বারা বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত (যে আল্লাহ্ প্রদ্ত্ত ফায়সালা মোতাবেক বিচার করে না সেই কাফের ।)
১৪) সংবিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত ।	১৪) প্রত্যাদিষ্ট বিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত ।
১৫) জীবনের সর্বস্তরে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক ।	১৫) জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোই ইসলামী মূল্যবোধের পরিচায়ক ।
১৬) গণতান্ত্রিক বিশ্বাসে ধর্ম অবশ্যই রাজনীতি বিবর্জিত ।	১৬) ইসলামী বিশ্বাসে মানুষের প্রথম উপাধি খলীফা/ প্রতিনিধি, কাজেই ইসলাম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য ।

মিল্লাতে ইবরাহীম

❖ প্রশ্ন-১। মিল্লাতে ইবরাহীম কি? মিল্লাতে ইবিরাহীমের মূলকথা কি?
উত্তরঃ- আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতা'আলা বলেছেনঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

"ইব্রাহীম ও যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের জাতিকে বলল, তোমাদের ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। আমরা তোমাদেরকে মানি না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা বোধের সূচনা হল যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর।" (মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)

শাঈখ হামদ বিন আতীক (রহঃ) বলেন, আল্লাহর বাণী ঃ "وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ অর্থাৎ প্রকাশ পেল ও স্পষ্ট হলো।" 'الْعَدَاوَةُ -শত্রুতা' কে 'الْبَغْضَاء -ঘৃণা' এর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ হলো, প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মানুষ মুশরিকদের ঘৃণা করে ঠিকই তবে শত্রুতা পোষণ করে না। তাই তিনি এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে করে শত্রুতা ও ঘৃণা একই সাথে হয়। তবে শত্রুতা ও ঘৃণা স্পষ্ট দু'টি নীতির আওয়ায। জেনে রাখুন, যদি ঘৃণা কেবল অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট তাহলে তার প্রভাব ও নিদর্শন প্রকাশ না করা পর্যন্ত কোন উপকারই আসবে না। তেমনিভাবে শত্রুতা, যদি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করা হয় তাহলে বুঝা যায় না। তাহলে এমতাবস্থায় শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ্যভাবেই করতে হবে। (আদ্ দুরারাস সানিয়্যাহ)

শাঈখ সোলায়মান বিন সাহমান (রহঃ) মুমতাহিনার ৪ নং আয়াত সম্পর্কে বলেন, এই হচ্ছে মিল্লাতে ইব্রাহীম যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মিল্লাতে ইব্রাহীম হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে বোকা। (আল-বাকারাহ্ ২ঃ ১৩০) তাই মুসলিমের কাজ হলো, আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা করা এবং শত্রুতা তাদের সাথে প্রকাশ করা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও লেনদেন আচার ব্যবহার করা থেকে পূর্ণাঙ্গ দূরে থাকা। (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ, ২২১ পৃষ্ঠা)
সুতরাং মিল্লাতে ইব্রাহীম হচ্ছে ঃ

- এক আল্লাহর জন্যই উপাসনাকে একনিষ্ঠ করা। প্রত্যেক ঐ সকল বিষয় তাঁর জন্য একনিষ্ঠ হতে হবে, যাকে অর্থবোধকভাবে একবাক্যে ইবাদত তথা উপাসনা বলা যায়।
- শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।
- মুশরিক ও মুশরিকদের বাতিল উপাস্যদের সাথে তথা ত্বাগুতের সাথে শত্রুতার প্রকাশ। মুশরিকদের, তাদের উপাস্য, মত, বিধানের ও তাদের শিরকী আইন ও বিধানের মৌলিকতা ও সত্যতা অস্বীকারের কথা ঘোষণা করা।
- তাদের সাথে শত্রুতা, ঘৃণা, তাদের কুফরী অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘৃণা করা যতক্ষণ না তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং যে বাতিলের উপর তারা আছে তা পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ না করে তা থেকে খালাস না হয় সেটাকে অস্বীকার না করে।

মিল্লাত ইবরাহীমের মূলকথা হলো, সমস্ত ইবাদত আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে নিবেদন করা। তাগুতকে প্রকাশ্য এবং নির্ভয়ে প্রত্যাখ্যান করা, মুশরিকদের এবং তারা যাদের ইবাদত করে তাদের সবার সাথে 'বারাআ' বা সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা, এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শন করা এগুলোই হলো দ্বীনের ভিত্তি এবং প্রত্যেক নবীর কাছে এই একই বার্তাই পাওয়া যায়।

❖ প্রশ্ন-২। যারা বলে, "আমাদের পথ ও মিল্লাত হলো মুহাম্মাদ (সঃ) এর পথ। আর ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত বা শরীয়া তো এর পূর্বের শরীয়া। আর যারা পূর্বে এসেছে তাদের শরীয়া তো আমাদের জন্য নয়।" তাদের এ অভিযোগকে কিভাবে খন্ডন করা হবে?

উত্তরঃ তারা বলে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর শরীয়াহ আমাদের পূর্বের উম্মতদের জন্য, আমাদের জন্য ইব্‌রাহীম (আঃ) এর শরীয়াত নয়। আশ্চর্য যুক্তি ! এই যদি তাদের কথা হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলার সেই সব আয়াত সম্পর্কে তারা কি বলবেঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

আর অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথেও। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি। আর তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে রইল। (আল-মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)

সবগুলো আয়াতই স্পষ্ট–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ [الممتحنة/٦]

"তোমরা যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে তাঁদের (ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের) মধ্যে। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।"(আল-মুমতাহিনা ৬০ঃ ৬)

এখানেই শেষ নয়– আরও আছেঃ

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

ইব্‌রাহীমের মিল্লাত থেকে কে বিমুখ হতে পারে, সে ছাড়া যে নিজেকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছে? (আল-বাকারা ২ঃ ১৩০)

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে উল্লেখ করেছেনঃ

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

তারপর আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করুন এবং তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না। (আন-নাহল ১৬ঃ ১২৩)

কুরআন সুন্নাহতে এমন অসংখ্য দলীল আছে যা প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) এর দাওয়াহর মাঝে কুফ্‌ফারদের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা ও তাদের বিরোধিতা ছিল এবং শত্রুতা ছিল তাদের উপাস্য ও তাদের আইন বিধানের প্রতি। আর এটাই ছিল আমাদের পিতা ইব্‌রাহীম (আঃ) এর মিল্লাতের মূল স্তম্ভ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন

قَالَ الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلاَتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ

'নবীরা সবাই পৈত্রিক সম্পর্কে ভাই; তাদের মা ভিন্ন, কিন্তু তাদের দ্বীন একটাই।' (বুখারী)

যদিও বিভিন্ন নবীর শরীয়াহ শাখা প্রশাখার মাঝে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু ভিত্তি তাওহীদ ও দ্বীন সর্বক্ষেত্রেই অভিন্ন ছিল। তাওহীদের দাবীই হলো শিরকের সাথে সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং এর সমর্থকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া। এক্ষেত্রে 'মানসুখ' (একটির আগমনের আরেকটি বাতিল হওয়া) হওয়ার মতো কোন বিষয় নেই। কারণ এটা শরীয়াহর বিষয় নয় যে পূর্বের শরীয়াহ বাতিল হয়ে নতুন শরীয়াহ কার্যকর হয়েছে। বরং এটা সেই অপরিবর্তনীয় তাওহীদের নীতি যা সকল নবী রাসূলগণ অনুসরণ করেছেন, শিরক ও মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণের নীতি একটাইঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦]

আল্লাহর ইবাদত করবার ও ত্বগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দেয়ার জন্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (আন-নাহল ১৬ঃ ৩৬)

মহিমাময় আল্লাহ আরো বলেছেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই ওহী ব্যতিত যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। সুতরাং আমারই ইবাদাত কর।

(আল-আম্বিয়া ২১ঃ ২৫)

❖ প্রশ্ন-৩। যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে শত্রুতা, ঘৃণা করল না এবং তাদের থেকে দূরে থাকল না, তাদের সাথে বন্ধুত্ব পরিহার করল না তার ইসলাম ঠিক থাকবে কি?

উত্তরঃ- আল্লাহ সুবঃ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة/٥١]

তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" *(সূরা মা'য়িদা ৫ঃ ৫১)*

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) "*ইগাসাতুল লিহফান*" গ্রন্থে বলেন, "এই বড় শিরক হতে মুক্তি পাবে না একমাত্র আল্লাহর জন্য তাওহীদকে আলাদা করা, মুশরিকদের সাথে আল্লাহর জন্য শত্রুতা, আল্লাহর কাছে তাদের ঘৃণ্য অবস্থা সৃষ্টি করা ব্যতীত।"

শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতীফ (রহঃ) বলেন, "জেনে রাখুন, আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন তিনি যা পছন্দ করেন ও ভালবাসেন তা করার। কোন বান্দার

ইসলাম, আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতাকারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ব্যতীত সঠিক হবে না।" (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ অধ্যায়, ২০৮ পৃষ্ঠা)

সুলাইমান বিন সাহমান (রহঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে শত্রুতা, বন্ধুত্ব পরিহার, ঘৃণা করল না এবং তাদের থেকে দূরে থাকল না, তাহলে সে ব্যক্তি নবী আহমাদের অনুসৃত পথে থাকবে না। এমনকি সঠিক পথেও সে থাকবে না।"

❖ প্রশ্ন-৪। মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরনে দ্বীন প্রকাশের স্বরূপ কি? এর হুকুম কি আমাদের প্রতি?

উত্তরঃ- প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হচ্ছে তার দ্বীনকে প্রকাশ করা। ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত হলো তাগুতকে প্রকাশ্য এবং নির্ভয়ে প্রত্যাখ্যান করা, মুশরিকদের এবং তারা যাদের ইবাদত করে তাদের সবার সাথে 'বারাআ' ঘোষণা করা, এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

[الممتحنة/٤]

"ইব্‌রাহীম ও যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের জাতিকে বলল, তোমাদের ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। আমরা তোমাদেরকে মানি না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা বোধের সূচনা হল যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর।" (মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)

● শাঈখ ইসহাক্ব বিন আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেন, "শুধু অন্তরে কাফিরদের ঘৃণা করলে চলবে না। বরং শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ করতে হবে। তিনি সূরা মুমতাহিনার আয়াত উল্লেখ করে বলেন, আপনি বক্তব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যার পর আর কোন বক্তব্যের দরকার হবে না। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ "প্রকাশ পেল, শত্রুতা ও ঘৃণা। এই হচ্ছে দ্বীনের প্রকাশ। অবশ্যই উচিত হচ্ছে

কাফিরদের সাথে স্পষ্টভাবে শত্রুতা করা ও তাদের সাথে প্রকাশ্যভাবে কুফরী করা এবং শারীরিক দূরত্ব সৃষ্টি করা। শত্রুতার অর্থ হচ্ছে শত্রুতার বিপরীত শত্রুতা করা। যেমন, সম্পর্ক ছিন্নের মৌলিকতা হলো, আন্তরিক ও জিহ্বা ও শারীরিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা। আর মু'মিনের অন্তর কখনো কাফিরের শত্রুতা শূন্য হয় না। প্রকৃত দ্বন্দ্ব কেবল প্রকাশ্য শত্রুতার দ্বারাই হয়। (জিহাদ পর্ব, ১৪১ পৃষ্ঠা)

- শাঈখ হামদ বিন আতিক (রহঃ) 'দুরারে সিনিয়্যাহ'তে বলেনঃ দ্বীনের প্রকাশ হলো ঃ তাদের দ্বীনকে অস্বীকার করা, তাদের দ্বীনের দোষ বর্ণনা করা, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের সাহায্য ও তাদের প্রতি নির্ভরশীলতা হতে নিজেকে রক্ষা করা ও তাদের থেকে আলাদা হওয়া। শুধু সালাত পড়াই দ্বীন প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। (জিহাদ খন্ড - ১৯৬ পৃষ্ঠা)

- শাঈখ হামদ বিন আতিক (রহঃ) তাঁর 'সাবিল আন-নাজাত ওয়াল ফিকাক' পুস্তিকায় আরও বলেনঃ জেনে রাখুন, কুফরের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে কুফরীকারীদের সংখ্যানুযায়ী। প্রত্যেক কাফের গোষ্ঠীরই কুফরীর একটি ধরন প্রকাশ পেয়েছে আর ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান তার দ্বীন প্রকাশকারী বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ না সে প্রত্যেক কাফের সম্প্রদায়ের কুফরীর বিরোধিতা করবে যা তার নিকট প্রকাশ পেয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে শত্রুতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

- শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান বলেন, দ্বীনের প্রকাশ সেটা নয় যেমনটি মূর্খরা ধারণা করে- যে ব্যক্তি কাফিরদের বর্জন করবে, নিজের ও কাফিরদের মধ্যে ফাঁক তৈরী করবে সালাত পড়বে, কুরআন পড়বে, যথা সম্ভব নফল ইবাদাত করবে সে তার দ্বীনের প্রকাশকারী বলে গণ্য হবে। এটা মারাত্মক ভুল। বরং প্রকৃত দ্বীন প্রকাশকারী সেই যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা ও সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয় এবং তাদের সামনে বলতে কিছুই ছাড়েনা, চাই তাকে হত্যা করুক বা এলাকা হতে বিতাড়িত করুক না কেন। (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ পর্ব, ২০৭ পৃষ্ঠা)

বড় ফিতনা হচ্ছে তাওহীদকে গোপন করা এবং জনগণের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়া। ইসলামের অংশ হিসেবে শাহাদাতের প্রচার ও প্রসারে প্রত্যেক ত্বগুতের সাথে কুফরী করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব। তা ঘোষণা করা, শুরু করা, প্রকাশ করাও বড় ওয়াজিব। অবশ্যই তা মুসলমানদের দাওয়াতে বহুল প্রসার লাভ করবে।

প্রশ্ন-৫। নাবী মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাহাবারা মক্কায় দূর্বল অবস্থাতেও মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরন করেছেন এর দৃষ্টান্ত কি?

উত্তরঃ- আমাদের জন্য নবী (সঃ)-এর মাক্কী জীবনের আদর্শই যথেষ্ট। তিনি কিভাবে কুরাইশদের উপাস্যগুলোর অসারতা ও তার থেকে তাঁর সম্পর্কহীনতা প্রকাশ এবং সেগুলোর সাথে কুফরী করার কাজ সমাধা করতেন। এমনকি তারা নবী (সঃ)-কে 'বেদ্বীন' হয়ে গেছে বলেও অভিযুক্ত করত। যদি এ ব্যাপারে আরো মজবুত ও দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করতে চান তাহলে মাক্কী জীবনে অবতীর্ণ আয়াতগুলো পড়ুন। নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরন করার জন্য ঃ

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [النحل/١٢٣]

অতঃপর আমি আপনার কাছে একনিষ্ঠ মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করার প্রত্যাদেশ করেছি। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (আন-নাহল ঃ ১২৩) নবী (সঃ) তিনি আল্লাহ্র এই নির্দেশ মেনে সেই পথেই চলেছেন-যদিও মুসলিমরা তখন ছিল খুবই কম সংখ্যক। নবী (সঃ) একে প্রচার, প্রকাশ ও ঘোষণা করেছেন এবং কিছুই গোপন করেননি। এজন্য তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন।

মক্কাতেই তিনি (সাঃ) কাফিরদের উদ্দেশ্যে সরাসরি বলতেন-

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ- وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

" আপনি বলুন, হে কাফেরগণ! তোমরা যার ইবাদত করছো, আমি তার ইবাদত করি না এবং আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করো না এবং তোমরা যার ইবাদত করছো, আমি তার ইবাদতকারী নই, এবং আমি যাঁর ইবাদত করছি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমারই দ্বীন।" (সূরা কাফিরূন ১০৯ঃ ১-৬)

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) "আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।" (সূরা লাহাব ১১১ঃ ১)

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (٢٠) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (٢٢) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى [النجم/١٩-٢٣]

"তোমরা কি ভেবে দেখেছো 'লাত' ও 'উয্‌যা' সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে? তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র জন্যে? এই প্রকার বন্টন তো অসঙ্গত। এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছো, যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পথ-নির্দেশ এসেছে।"(সূরা নাজ্‌ম: ১৯-২৩)

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ- لَوْ كَانَ هَـٰؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ

"তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। যদি তারা উপাস্য হতো তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না; তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে।" (সূরা আম্বিয়া ২১ঃ ৯৮-৯৯)

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَافِرُونَ

"কাফিররা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রূপেই গ্রহণ করে; তারা বলেঃ এই কি সেই, যে তোমাদের দেবতাগুলির সমালোচনা করে? অথচ তারাই তো 'রহমান' এর উল্লেখের বিরোধিতা করে।" (সূরা আম্বিয়া ২১ঃ ৩৬)

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কুরাইশের কাফিরদের ধারণা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন এক মানুষ যে কিনা তাদের ইলাহদের ব্যাপারে খারাপ কথা বলে। সত্যিকার অর্থে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সব ইলাহদের স্বরূপ সবার সামনে তুলে ধরতেন, এদের উপাসনার বিরূদ্ধে কথা বলতেন এবং এদেরকে আলিহা হিসেবে গ্রহণ করা যে কত বড় বোকামী ও অজ্ঞতা তা সবার কাছে স্পষ্ট করে দিতেন। এভাবেই রাসূল (সাঃ) সেই একই পথের অনুসরণ করেছেন যে পথে এক সময় ইব্‌রাহীম (আঃ) চলেছেন- যদিও মক্কায় তিনি ছিলেন দুর্বল।

নবী (সঃ) একে প্রচার, প্রকাশ ও ঘোষণা করেছেন এবং কিছুই গোপন করেননি। এজন্য তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এজন্য তোষামোদ করেননি। তারা তোষামোদি থেকে দূরে ছিলেন। মু'মিনরা তার উপর দৃঢ় ছিলেন। আর নবী (সঃ) তাদেরকে আল্লাহর ওয়াদা ও জান্নাতের কথা বলে এবং পূর্বের ঈমানদারদের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে মু'মিনদের শান্তনা দিতেন যেমন তিনি বলেছেনঃ

فقال صبرا يا آل ياسر اللّٰهُمَّ اغفر لآل ياسر وقد فعلت

"হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধর, তোমাদের গন্তব্যস্থল জান্নাত।" (আল-হাকিম ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন)

খাব্বাবকে উদ্দেশ্য করে নবী (সঃ) এর উক্তি ঃ

لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الركاب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله

"তোমাদের পূর্বের এমনও ঈমানদার ছিলেন তাকে ধরে এনে মাটির গর্ত খোড়া হত। তাতে তাকে ফেলা হত, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হত, এরপর তাকে দু'খণ্ড করে ফেলা হত। লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংস তুলে নেওয়া হত। এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে সরাতে পারত না।" (বুখারী ও অন্যান্য)

❖ প্রশ্ন-৬। ত্বাগুতদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে দাওয়াতী কাজে হিকমাত বা নম্রতার নামে কালক্ষেপন জায়েজ কি?

উত্তরঃ আল্লাহদ্রোহী শক্তি ও আল্লাহ ছাড়া সে সকল উপাস্যের ইবাদত করা অর্থাৎ সমস্ত ত্বাগুত, চাই তা পাথরের মূর্তি হোক অথবা সূর্য, চন্দ্র, কবর, গাছ, মানব রচিত শরীয়াত ও আইন কানুন হোক না কেন। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, সেগুলোকে অস্বীকার করতে দেরী বা সময় ক্ষেপণ করা যাবে না। দাওয়াতী কাজে নম্রতার নামে সময় ক্ষেপন না করে বরং পথের শুরুতেই তা ঘোষণা করা উচিত। মিল্লাতে ইব্‌রাহীম ও নবী রাসূলগণের দাওয়াত এ সমস্ত উপাস্যের কুফরী করা, তাদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করতে বলে। যখন তারা তাদের জাতির জন্য দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করতেন। এ কথা বলতেনঃ

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বগুতকে বর্জন কর। (আন্-নাহাল ১৬ঃ ৩৬) এ ব্যাপারে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর একনিষ্ঠ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. إلا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ

যখন ইব্‌রাহীম তাঁর পিতা ও জাতিকে বললেন, তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি বাদে। তিনি আমাকে অচিরেই সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। (যুখরুফ ৪৩ঃ ২৬-২৭)

আমাদের জন্য নবী (সঃ)-এর মাক্কী জীবনের আদর্শই যথেষ্ট। তিনি কিভাবে কুরাইশদের উপাস্যগুলোর অসারতা ও তার থেকে তাঁর সম্পর্কহীনতা প্রকাশ এবং সেগুলোর সাথে কুফরী করার কাজ সমাধা করতেন। এমনকি তারা নবী (সঃ)-কে 'বেদ্বীন' হয়ে গেছে বলেও অভিযুক্ত করত।

❖ প্রশ্ন- ৭। মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষনা দেয়ার পূর্বে আমরা কি করব? ঐ অবস্থায় তাদের প্রতি ভালবাসা রাখা জায়েজ কি?

উত্তরঃ- আমরা প্রথমে উত্তমভাবে মুশরিকদেরকে আল্লাহর একত্বের দিকে দাওয়াহ দিব। যাদের মন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট অথবা যে ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে ধাবিত হচ্ছে কিছু কিছু বিষয় গ্রহন করার মাধ্যমে পাশাপাশি সে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা করে না, আমরা প্রথমেই তাদের সাথে প্রকাশ্য সমর্কহীনতা ও শত্রুতার ঘোষনা দেই না। আমরা শুধুমাত্র তাদের রিরুদ্ধে প্রকাশ্য ঘোষনা দেই যারা বাতিলের উপর অটল এবং আল্লাহর দ্বীন ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়। এমনকি প্রথমে স্বৈরাচার, অহংকারী ও অত্যাচারীদেরকেও হিকমাহ ও নম্রভাবে উত্তমভাবে আল্লাহর অনুগত্যের দাওয়াত দিবে। যেমন ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতাকে সম্মোধন করে বলেছেন ঃ

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ

হে আমার পিতা আমার কাছে জ্ঞান (নবুওয়াত) এসেছে। তাই আমার অনুসরণ করুন ... (মারইয়াম ১৯ঃ ৪৩)

يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ

হে আমার আব্বা! আমি ভয় করছি দয়াময়ের শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে ... (মারইয়াম ১৯ঃ ৪৫)

এভাবে মুসা (আ) ফেরাউনকে দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ তাকে তার কাছে রাসূল হিসাবে পাঠানোর পর। আল্লাহ বলেছেনঃ

فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

তোমরা উভয়ে ফিরাউনের সাথে নম্র ভাষায় কথা বল। হয়তো আল্লাহকে স্বরণ করবে অথবা ভয় করবে। (ত্বা হা ২০ঃ ৮৪)

যখন আমরা কাফের-মুশরিকদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেই নম্রতা ও হিকমাত প্রয়োগ ও উত্তম বাণী ব্যবহার করে, তখন আমাদের পার্থক্য করতে হবে দুটি অবস্থার মধ্যে আল্লাহর দ্বীনের জন্য ভালবাসা ও ঘৃণা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মধ্যে, আমরা যেন এ দুটি অবস্থাকে এক করে না ফেলি। কেননা অনেকে দুটি অবস্থাকে

এক করে ফেলেন। অর্থাৎ যদিও দাওয়ার কারনে এবং যারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধীতা না করার কারনে আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতার ঘোষনা দেই না কিন্তু শিরক থেকে মুক্ত না হওয়ার কারনে আমরা তাকে কাফের জানব এবং অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃনা রাখব যদিও বাহ্যিক নম্র ও ভাল ব্যবহার করি। আমরা যেন এই অবস্থা তাদেরকে অন্তরে ঘৃনার বদলে ভালবেসে না ফেলি, বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করি যতক্ষন না পুরোপুরি শিরক্-কুফরী থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামে আসে।

❖ প্রশ্ন-৮। মুসা (আঃ) কিভাবে ফিরাউন ও তার গোত্রকে দাওয়াহ দিয়েছিলেন?

উত্তরঃ- মুসা (আ) ফেরাউনকে দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ তাকে তার কাছে রাসূল হিসাবে পাঠানোর পর। আল্লাহ নির্দেশ দিলেনঃ

قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ([طه/٨٤]

"তোমরা উভয়ে ফিরাউনের সাথে নম্র ভাষায় কথা বল। হয়তো আল্লাহকে স্বরণ করবে অথবা ভয় করবে।" (ত্বা হা ২০ঃ ৮৪)

আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্য মূসা (আ) তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা আরম্ভ করলেন। তিনি বললেনঃ

{فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (١٨) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى} [النازعات: ١٨، ١٩]

"আপনার কি পবিত্র হওয়ার ইচ্ছা আছে? তাহলে আমি আপনাকে আপনার রবের পথ দেখাব। অতএব আপনি তাকে ভয় করুন।" (নাজি'আত : ১৮-১৯)

অতঃপর তাকে অনেক নিদর্শন ও প্রমাণ দেখালেন। যখন মূসার (আঃ) এর নিকট ফিরআউনের মিথ্যা, শত্রুতা, বিরোধিতা ও বাতিলের উপর অটল থাকার কথা প্রকাশ পেল।

তখন মূসা (আঃ) বললেনঃ

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا [الإسراء/١٠٢]

"আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, এগুলো কেবলমাত্র ভুমন্ডল ও নভোমন্ডলের রবই অবতীর্ণ করেছেন তবুও মানলেন না। তবে আমি মনে করি হে ফিরআউন আপনি একজন ধ্বংসশীল লোক।" (বানী ইসরাঈল ১৭ঃ ১০২)

❖ প্রশ্ন-৯। কোন পর্যায়ে মুশরিকদের সাথে এমনকি যদিও তারা আত্মীয় হয় তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষনা দেয়া হবে?

উত্তরঃ- তাদের নিকট এ দাওয়াহ সুস্পষ্ট করা উচিত, উত্তম ও নম্রভাবে তাদের সাথে সাক্ষাত করে দাওয়াহ দিয়ে অথবা চিঠি ও কিতাব দিয়ে, দায়ীদের মাধ্যমে, সম্ভাব্য সমস্ত দলীল প্রমান দিয়ে। দাওয়াতের সমস্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করার পরেও যদি তাদের থেকে বিরোধিতা প্রকাশ পায়, হাসি-ঠাট্টা করে তখন সুস্পষ্ট ঘোষনা দিতে হবে শত্রুতার প্রকাশ্যভাবে।

স্পষ্টভাবে দলিল প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও যদি মানতে অস্বীকার করে এবং অহংকার করে এবং তারা যে বাতিল ও শিরকের উপর ছিল তার উপর অটল থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতায় সক্রিয় হয় তাহলে তাদের সাথে আর সৌহার্দ মূলক আচরণ ও নরম ভাষায় কথা বলা চলবে না। তখন তাদের সাথে প্রকাশ্যে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।

ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর অতি নিকট আত্মীয় স্বজনের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তখন যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে তারা শিরক ও কুফরীর উপর অটল থাকবে। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল সে (তাঁর পিতা) আল্লাহর দুশমন, ইব্রাহীম তার থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। (তাওবাহ ঃ ১১৪)

❖ প্রশ্ন-১০। আবু তালিবের শ্রেণীর মুশরিকদের সাথে কিরূপ আচরন হবে? এই শ্রেণীর মুশরিকদের কাছে কি নিজে থেকে সাহায্য চাওয়া যাবে?

উত্তরঃ- আবূ তালিব তেমনি একজন ব্যক্তি যদিও সে বাতিলের উপর অটল ছিল তথাপিও হক্ব ও হক্বপন্থীদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ করেননি। বরং সে ছিল এর উল্টোটা, বরং সে ছিল হক্বপন্থী ও রাসূল (সঃ)-এর সাহায্যকারী। যদিও এটা হয়েছিল স্বজনপ্রীতি ও বংশীয় বন্ধনের কারণে।

পাপীষ্ট লোক দ্বারা এবং স্বজনপ্রীতির বন্ধন, বংশীয় টান দ্বারা যদিও এ বন্ধন ও টান মূলত বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত তবুও তাদের দ্বারা দ্বীনের পৃষ্ঠপোষকতা হয়ে থাকে। এই সাহায্যকারী পাপী লোক আবূ তালিব, যার হিদায়াতের ও সত্যের আনুগত্যের আশা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। যদি সে বিরোধী যোদ্ধাদের কাতারে না দাঁড়ায় বরং যদি দাঁড়ায়ও তবে তার কতক অনুসারীকে প্রতিহত করার জন্য যার অবস্থা এমন তাহলে তার ব্যাপারে বিশেষ দাওয়াত দেওয়া স্বাভাবিক। সেজন্য নবী (সঃ) কখনো তাঁর চাচা আবূ তালিবকে দাওয়াত দেওয়া হতে নিরাশ হননি।

নবী (সঃ)-এর চাচার এরূপ প্রতিরোধ অবস্থান গ্রহণ করা সত্ত্বেও দাওয়াতী কাজের হিসাবে ও দ্বীনি নীতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার নম্রতা দেখাননি। বরং তাঁর

চাচা তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে জানতেন এবং নবী (সঃ) কর্তৃক তাদের বাতিল উপাস্যের শত্রুতা ও দোষ-ক্রুটি বর্ণনার কথা শুনতেন ।

সুতরাং আবু তালিব শ্রেণীর মুশরিক যারা এই দ্বীনের ও তার অনুসারী মুসলিমদের বিরোধিতা করে না, বরং পারলে সহযোগিতা করে তাদের আত্মীয়তা বা অন্য কারনে, তাদের সাথে শত্রুতার ঘোষনা দিব না যতক্ষন না সে বিরোধীর কাতারে দাড়ায় । বরং আমরা তাদের সাথে বাহ্যিক ভাল ব্যবহার করব কিন্তু অন্তরে ঘৃনা রাখব যতক্ষন না সে শিরক থেকে পবিত্র হয় । পাশাপাশি আমরা তাদের দাওয়াহ দিতে থাকব, হয়তোবা সে এই দ্বীন গ্রহণ করবে ।

এখানে একটি স্পষ্ট পার্থক্য আছে যা পর্যালোচনা দরকার । তা হলো, মুসলিমকে কাফিরের আশ্রয় দেওয়া, সহযোগিতা করা, বিপদ থেকে রক্ষা করা, যা কাফির নিজের গরজেই করে থাকে, যা মুসলিম নিজেকে ছোট করে তার নিকট চায়নি । বরং এ কাজ কাফির করে থাকে আত্মীয়তা, স্বজনপ্রীতি অথবা অন্য কোন কারণে । এ অবস্থার মাঝে মুসলিম নিজে কাফিরের কাছে তা চাওয়া বৈধ নয় । বরং তার এ চাওয়া এক প্রকার লজ্জা ও অপমান, চাটুকারিতা অথবা স্বীকার করা অথবা তার বাতিল সম্পর্কে নিরবতা পালন করা অথবা তার শিরকী কাজকে সমর্থন করার শামীল । মুসলিম কখনই নিজে থেকে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে না ।

প্রশ্ন-১১ । মিল্লাতে ইবরাহীমের পথে কি ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়?

উত্তরঃ- মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের অনুসরনে কাফেরদের সাথে বৈরিতা সাথে শুরু করা ও তাদের নিকট তা প্রকাশ করা ও তাদের উপাস্য গুলিকে বর্জন করার যে আহবান জানায় তা মানা বড়ই কষ্ট সাধ্য । কেউ যেন মনে না করেন যে, এ পথে গোলাপ ও ফুল বিছিয়ে রাখা আছে অথবা এ কথা মনে না করেন এ পথে সুখ সহনশীলতায় ভরপুর । না, বরং এ পথ দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদে ভরপুর । কিন্তু এর ফলাফল হচ্ছে মিসকে আম্বরের ঘ্রাণযুক্ত পানীয়, সুখ শান্তি ও সন্তুষ্টচিত্তে পরকালে রবের সাক্ষাত লাভ । এটা এমন পথ যার উপর প্রবৃত্তির অনুসারী ও বাদশাহরা খুশি হতে পারে না । কেননা, এ হলো তাদের কার্যকলাপের স্পষ্ট প্রতিবন্ধক, এবং তাদের উপাস্য ও শিরক হতে স্পষ্ট বৈরিতা ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ [يس/٣٠]

“আফসোস বান্দাদের উপর! তাদের নিকট কখনও এমন কোন রাসূলই আসেননি, যাকে তারা বিদ্রুপ না করেছে ।” (সূরা ইয়াসীন ৩৬ঃ ৩০)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ [إبراهيم/١٣]

"আর সেই কাফেররা নিজেদের রাসূলগণকে বললো, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বের করে দেবো, নতুবা তোমরা আমাদের দ্বীনে ফিরে আসো; তখন সেই রাসূলগণের প্রতি তাহাদের রব ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি সেই যালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করব।" (সূরা ইবরাহীম ১৪ঃ ১৩)

وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ [البقرة/٨٧]

"....কিন্তু পরে যখন তোমাদের নিকট কোন রাসূল-তোমাদের প্রবৃত্তি যা ইচ্ছে করতো না, তা নিয়ে উপস্থিত হলো তখন তোমরা অহংকার করলে; অবশেষে একদলকে মিথ্যাবাদী বললে এবং একদলকে হত্যা করলে।(সূরা বাকারা: ৮৭)

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

"জনপদবাসীরা বললো, আমরা তো তোমাদেরকে অশুভ মনে করি, যদি তোমরা নিবৃত্ত না হও, তবে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবো এবং আমাদের পক্ষ থেকে কঠিন উৎপীড়ন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।" (সূরা ইয়াসীন ৩৬ঃ ১৮) আসহাবুল উখদুদের ব্যাপারে বলা হয়েছে

فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا. أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ. فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ يَا أُمَّهِ اصْبِرِى فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ

"........ রাজা তখন একটি গভীর গর্ত খুড়ে তার ভেতরে আগুন জ্বালাতে আদেশ দিলো এবং বললোঃ যে এই বালকের দ্বীন থেকে সরে না আসবে তাকেই এই আগুনে নিক্ষেপ করো বা তাকেই আগুনে লাফ দিতে আদেশ করো। তারা এমনটাই করতে থাকলো যতক্ষণ না এক মহিলা তার শিশুসন্তান সহ আসলো। সে আগুনে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করছিল। কিন্তু শিশুটি বলে উঠলোঃ মা, সহ্য করো (এই পরীক্ষা), কারণ তুমি সঠিক পথে আছো।" (সহীহ মুসলিম) খাব্বাবকে উদ্দেশ্য করে নবী (সঃ) এর উক্তি ঃ

لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ زَادَ بَيَانٌ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ (صحيح البخاري٣٨٥٢)

"তোমাদের পূর্বের এমনও ঈমানদার ছিলেন তাকে ধরে এনে মাটির গর্ত খোড়া হত। তাতে তাকে ফেলা হত, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হত, এরপর তাকে দু'খন্ড করে ফেলা হত। লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংস তুলে নেওয়া হত। এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে সরাতে পারত না। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ অবশ্যই এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন। তখন এমন নিরাপত্তা আসবে যে একজন আরোহী সানা থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে। আল্লাহর ভয় ছাড়া কোন কিছুর ভয় থাকবে না। আর ছাগলের উপর বাঘের ভয় ছাড়া। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া করছো।" (বুখারী)

নবী (সঃ) এই দ্বীনকে প্রচার, প্রকাশ ও ঘোষণা করেছেন এবং কিছুই গোপন করেননি। এজন্য তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এজন্য তোষামোদ করেননি। তারা তোষামোদি থেকে দূরে ছিলেন। মু'মিনরা তার উপর দৃঢ় ছিলেন। আর নবী (সঃ) তাদেরকে আল্লাহর ওয়াদা ও জান্নাতের কথা বলে এবং পূর্বের ঈমানদারদের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে মু'মিনদের শান্তনা দিতেন যেমন তিনি বলেছেনঃ "হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধর, তোমাদের গন্তব্যস্থল জান্নাত।" (আল-হাকিম ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন) এগুলো (শত্রুতা, বিদ্রুপ, হুমকি, অত্যাচার, হত্যা, দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি) কোন কিছুই হতো না, যদি না নবীরা এবং তাদের অনুসারী মু'মিনরা তাগুতকে উম্মোচিত না করতেন, যদি না তারা শির্ক এবং মুশরিকদের থেকে 'বারা' ঘোষণা না করতেন।

❖ প্রশ্ন-১২। আল্লাহর রীতি মুতাবিক কারা এই যমীনে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষিত হন?

উত্তরঃ- সা'দ ইবন্ আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে সাহীহাঈনে বর্ণিত যে তিনি বলেনঃ

أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يُبْتَلَى الرجل على حسب دينه فإن كان فى دينه صُلْبًا اشتد بَلَاؤُهُ وإن كان فى دينه رِقَّةٌ ابْتُلِيَ على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يَتْرُكَهُ يمشى على الأرض وما عليه خَطِيئَةٌ

"আমি বললামঃ'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানবজাতির মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশি কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে?' তিনি (সাঃ) জবাব দিলেনঃ 'নবীগণ, অতঃপর সত্যপথ অবলম্বনকারীগণ, অতঃপর তারা যারা তাদের খুব কাছাকাছি পর্যায়ের, এবং তারপর তারা যারা তাদের খুব কাছাকাছি পর্যায়ের মানুষ তার দ্বীনের উপর যতটা শক্তিমান হয় সেই হিসেবে তার পরীক্ষা নেয়া হয় কাজেই যদি তার নিষ্ঠা এবং তাকওয়া যথেষ্ট থাকে, তাহলে তার পরীক্ষা এবং কষ্টের কঠোরতাও বর্ধিত করা হয়; এবং যদি তার নিষ্ঠা এবং তাকওয়া দুর্বল হয়, তবে তার পরীক্ষা ও কষ্টও হালকা হয়- এবং একজন বিশ্বাসীকে ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জমীনের উপর দিয়ে নিষ্পাপ হয়ে হাটতে থাকে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস থেকে শিক্ষা হচ্ছে- সবচেয়ে বিপদাপদ সহ্য করেছেন নবীগণ। এরপর নবীদের মত যারা কাজ করেছেন তারা। আর মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের অনুসারীরা মানুষের মধ্যে সব চাইতে বেশী পরীক্ষিত হন। কেননা দাওয়াতী ক্ষেত্রে তারা নবীগণের পদ্ধতির অনুসরণ করে।

প্রশ্ন-১৩। এই পথের অনুসরন যদিও অনেক কঠিন কিন্তু এর শেষ ফলাফল কি?
উত্তরঃ আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا- وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

"তার চাইতে কে ভাল দ্বীনদার, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং সে মুহসিন (একনিষ্ঠ) ছিলেন মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের অনুসরণ করেছে আর আল্লাহ ইব্‌রাহীমকে একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু করে নিয়েছেন।"(আন-নিসা ৪ঃ ১২৫)

কেউ যেন মনে না করেন যে, এ পথে গোলাপ ও ফুল বিছিয়ে রাখা আছে অথবা এ কথা মনে না করেন এ পথে সুখ সহনশীলতায় ভরপুর। না, বরং এ পথ দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদে ভরপুর। কিন্তু এর ফলাফল হচ্ছে মিসকে আম্বরের ঘ্রাণযুক্ত পানীয়, সুখ শান্তি ও সন্তুষ্টচিত্তে পরকালে রবের সাক্ষাত লাভ। সবর করলে এবং দৃঢ় থাকলে এই পথের শেষ সাফল্য হচ্ছে জান্নাত--যেমন নবী (সঃ) বলেছেনঃ " اصبروا يا آل ياسر! فإن موعدكم الجنة. "হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধর, তোমাদের গন্তব্যস্থল জান্নাত।" (আল-হাকিম ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন)

❖ প্রশ্ন-১৪। মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরনে সবচেয়ে উত্তম ঈমানদারের দৃষ্টান্ত কি? সে কিভাবে বাতিলের সাথে মোকাবিলা করবে?

উত্তরঃ- সবচেয়ে উত্তম ঈমানদারের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যে মিল্লাতে ইব্রাহীম ও সকল রাসূলদের দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারক ব্যক্তি। সে এজন্য কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না। তাহলে এ ব্যক্তি হচ্ছে প্রকাশ্য ও বিজয়ী দলের অন্তর্ভুক্ত (*আত-তা'য়িফা আল-মানসূরাহ*)। সে হচ্ছে এমন সত্যের আহ্বায়ক, যে মুসলিমদের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তাদের দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধরেন এবং সেই ইহ ও পরকালে সাফল্য অর্জন করবে। যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

তার কথার চাইতে কার কথা উত্তম হতে পারে যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎ কাজ করে এবং বলে আমি মুসলিম। (ফুস্‌সিলাত ৪১ঃ ৩৩)

সে বাতিলপন্থীদের সাথে ছাড় দিয়ে কথা বলে না। তাদের উপর নির্ভর করে না ও তাদের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করে। পদবি, চাকুরি, কাজ, পদ্ধতি যা তাদের বাতিলকে সাহায্য করে তা পরিত্যাগ করে।

শাঈখ হামদ বিন আতীক কুরআনের মুমতাহিনার ৪নং আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ {وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ} [الممتحنة: ٤] ... প্রকাশ পেল ও স্পষ্ট হয়ে গেল ... অর্থাৎ যারা আল্লাহর একাত্ববাদকে স্বীকার না করবে তাদের বিরুদ্ধে বিরতিহীন শত্রুতা ও ঘৃণার শুরু হলো। আর যে ব্যক্তি আদর্শকে জ্ঞানে, কাজে ও প্রকাশ্যে বাস্তবায়ন করবে আর তার দেশের লোক তা জানতে পারবে আর তাকে কোন দেশে হিজরত করতে হবে না। (১৯৯ পৃষ্ঠা জিহাদ খণ্ড)

শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেন, ... বরং প্রকৃত দ্বীন প্রকাশকারী সেই যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা ও সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয় এবং তাদের সামনে বলতে কিছুই ছাড়েনা, চাই তাকে হত্যা করুক বা এলাকা হতে বিতাড়িত করুক না কেন। (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ পর্ব, ২০৭ পৃষ্ঠা)

এ প্রকারের মানুষ যখন তার হক্বকে প্রকাশ করলে হত্যা বা শাস্তির হুমকি দেওয়া হয় এবং হিজরত করার মত তেমন কোন দেশও না পান তাহলে তার জন্য কাহাফবাসীর পালনীয় আদর্শ যারা দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য পাহাড়ে পালিয়েছিল। অপর আরেকটি আদর্শ, রয়েছে উখদুদবাসীদের মধ্যে, যারা তাদের আকীদা ও তাওহীদের জন্য অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন, যারা দুর্বল হননি ও

নতিও স্বীকার করেননি। অপর আদর্শ রয়েছে রাসূল (সঃ) সাহাবীদের মধ্যে যারা হিজরত করেছেন, জিহাদ, যুদ্ধ, হত্যা করেছেন ও নিহত হয়েছেন। আপনাকে হিদায়াত ও সাহায্য করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

❖ প্রশ্ন-১৫। এ পথে কম প্রভাবশালী ঈমানদার কি করবে, যে দূর্বলতার কারনে মুশরিকদের সাথে শত্রুতার প্রকাশ করতে পারছে না?

উত্তরঃ- এমন লোক যে শুধু থেকেই কম প্রভাবশালী এবং বিপদাপদে পূর্ণ। এ দ্বীন এভাবে সে পালন করতে পারবে না এবং সে প্রকাশ্যে এ কাজ করলে হয়তো দ্বীনের কাজ করতেই পারবে না। সে ভয় পায় এবং প্রচার করতে পারে না তাহলে সে তার ছাগলের সাথে পাহাড়ের পাদদেশে চলে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং দ্বীন নিয়ে পালিয়ে যাবে ফিতনার ভয়ে।

❖ প্রশ্ন-১৬। পরিবার-পরিজনের দ্বীন ঠিক রাখার কাজ যাকে আটকে রেখেছে আবার সে দ্বীনের ও প্রকাশ করতে পারছে না ঐ স্থানে, ঐ কমপ্রভাবশালী ঈমানদারের করনীয় কি তার দ্বীনকে ঠিক রাখার জন্য?

উত্তরঃ- এমন অক্ষম ব্যক্তি যাকে তার বাড়ী আটকে রেখেছে বিশেষ কাজের জন্য। যিনি তার বাকী সদস্যকে শিরক, মুশরিক এবং আগুন থেকে- যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, সেখান থেকে রক্ষা করার চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। সে কাফিরদের সংস্রব থেকে দূরে থাকবে ও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তাদের বাতিলের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে না এবং যে কোন ভাবেই হোক না কেন সহযোগিতা করবে না। অবশ্যই এক্ষেত্রে তার তাওহীদকে নিরাপদ রাখতে হবে। তার অন্তর শিরক ও মুশরিকদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ থাকবে এবং অপেক্ষায় থাকবে প্রতিবন্ধকতা দূর হবার এবং দ্বীন নিয়ে পালানোর ফাঁক খুঁজবে এবং এর চেয়ে কম ঝুঁকি ও বিপদ যেখানে সে দেশে হিজরত করার সুযোগ খুঁজবে যেখানে সে তার দ্বীনকে প্রকাশ করতে পারবে, মুহাজিরদের হাবশাতে হিজরত করার মত।

❖ প্রশ্ন-১৭। মিল্লাতে ইববরাহীম এবং সিক্রেসী গ্রহণ এই দু'য়ের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা? প্রকৃতপক্ষে গোপনীয়তা কোথায় প্রযোজ্য?

উত্তরঃ- মিল্লাতে ইব্রাহীম প্রতিষ্ঠা করা ও দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য সতর্কতা স্বরূপ গোপনীয় পদ্ধতি গ্রহণ এবং শত্রুতা গোপন করার মাঝে কোন প্রতিবন্ধক নয়। আমাদের এ বক্তব্য, সিক্রেসী বা সতর্কতা গ্রহনকে বাদ দিয়ে দেয় না, কেননা নবী (সঃ) সতর্কতা গ্রহণ করতেন। বরং রাসুল (সা) এর সীরাত থেকে যার অনেক প্রমাণ আছে। তবে এ সম্পর্কে এ কথা বলা যায়, এ গোপন পদ্ধতি

সঠিক জায়গায় প্রয়োগ করতে হবে। সেটি হচ্ছে, (মিলিটারী অপারেশন) পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির খবর গোপন করা।

আর মিল্লাতে ইব্‌রাহীম ও তাদের ত্বগুতী পদ্ধতি ও বাতিল উপাস্যর সঙ্গে কুফরী করাটা এ গোপন পদ্ধতির আওতা ভুক্ত নয়। বরং দাওয়াত প্রকাশ্যে দিতে হবে। এরই বাস্তব রূপ বলা যায়, নবী (সঃ)-এর হাদীসটি- আমার উম্মাতের একটি দল সদা-সর্বদা প্রকাশ্য হকের উপর থাকবে (মুসলিম ও অন্যান্য) আর এ দাওয়াত গোপনে বা লুকিয়ে দেওয়ার অর্থই হলো ত্বগুতের সাথে আপোষে ভাব, তাদের দলে ঢুকে পড়া, তাদের অবস্থানকে আরো উঁচু করা। এটা কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর পদ্ধতি নয়। বরং এটি দুনিয়ার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের স্বভাব ও পদ্ধতি, যাদের বলা ওয়াজিব ঃ

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ [الكافرون/٦]

"তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য প্রযোজ্য আর আমার দ্বীন আমার জন্য।" (আল-কাফিরূন ১০৯ঃ ৬)

বিষয়টির সারকথা হলো, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গোপনে গ্রহণ করা আর দাওয়াত ও তাবলীগ প্রকাশ্যে।

❖ প্রশ্ন-১৮। যে সমস্ত মূর্খরা বলেঃ "নিশ্চয় মিল্লাতে ইবরাহীমের এ পথ দাওয়াতকে ধ্বংস করে ও দ্রুত করুণ পরিণতি ডেকে আনে।" তাদের এ কথার জবাব কি?

উত্তরঃ- ঐ সমস্ত মূর্খদের কথা যারা বলেঃ "নিশ্চয় এ পথ দাওয়াতকে ধ্বংস করে ও দ্রুত করুণ পরিণতি ডেকে আনে।" এ ধরনের কথা বলা মূর্খতা ও গুজব ছড়ানো বৈ কি! কেননা এ দাওয়াত হচ্ছে সেই দ্বীনের দাওয়াত যাকে আল্লাহ সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যদিও এটা মুশরিকরা অপছন্দ করে এবং এটা তারা করবেই কোন সন্দেহ নেই।

যে ব্যক্তি দাওয়াতের সংশোধন ও তার অনুসরণে এ সঠিক পথ থেকে বিমুখ হবে সে ব্যক্তি মুসলিম সমাজের উপর ফিতনা ও বিপদাপদ নিয়ে আসবে। অথবা দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকদের অন্তরে শয়তান যে সকল কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে সেগুলোকে সে বয়ে নিয়ে আসবে। আর এ ব্যক্তিই হচ্ছে বোকা' যে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দাওয়াতী পদ্ধতি হতে আরো ভাল দাওয়াতী পদ্ধতি সম্পর্কে সে অধিক অবগত মনে করে প্রতারণায় নিমজ্জিত। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন।

বড় ফিতনা হচ্ছে তাওহীদকে গোপন করা এবং জনগণের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়া। মিল্লাতে ইব্‌রাহীম প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর দ্বীনের সাথে

সুসম্পর্ক প্রকাশ এবং আল্লাহ ছাড়া উপাসনা করা হয় এমন ত্বগুতের সাথে শত্রুতাপোষণ করার চেয়ে কোন সংস্কার বড় হতে পারে? এ জন্য যদি মুসলমানেরা পরিক্ষিত না হয়, আর এ জন্য যদি কুরবানী না দেয় তাহলে আর কিসের দ্বারা তাদের পরীক্ষা হতে পারে ?

❖ প্রশ্ন-১৯। যে ব্যক্তি সতর্কতার নামে গোপনে বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে কাফেরদের সমর্থন করে ইসলামে তার অবস্থান কোথায়?

উত্তরঃ- এর সাথে জড়িত ব্যক্তি কয়েক প্রকারের-

➢ যে ব্যক্তি প্রকাশ্য ও গোপনে উভয়ভাবে তাদের সমর্থন করে। তাহলে এ ধরনের ব্যক্তি কাফের ও ইসলাম হতে বহিষ্কৃত। চাই এতে সে অপছন্দকারী হোক বা না হোক যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ ... যে ব্যক্তি কুফরীতে নিজের বক্ষ প্রসার করবে তার উপর আল্লাহর গযব ও মহা শাস্তি দেওয়া হবে। (আন্-নাহল ১৬ঃ ১০৬)

➢ গোপনে তাদের সাথে মিশে ও সমর্থন করে। আর প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে, তাহলে এ লোকও কাফির এবং এরা মুনাফিক।

➢ গোপনে তাদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন করে। এ লোক আবার দু'ধরনের।

১. যে গোপনে তাদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন করে আর সে তাদের রাষ্ট্রের নাগরিক নয়। তাকে এ কাজে প্রভাবিত করেছে নেতৃত্বের লোভ, সম্পদ, কোন দেশের নাগরিকত্বের লাভের আশায়, পরিবার অথবা এর কারণে সম্পদে যে ক্ষতি হতে পারে সে আশঙ্কায়। সে এই অবস্থায় মুরতাদ (দ্বীনত্যাগী) হয়ে যাবে। গোপনে তাদের কাজকে অপছন্দ করা তার কোন কাজে আসবে না। সে এমন ব্যক্তি যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}

[النحل: ١٠٧]

তারা এমন লোক, যারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে ভালবাসে। আর আল্লাহ কাফিরদের হিদায়াত করেন না। (আন্-নাহল ১৬ঃ ১০৭)

২. সে এ কাজ করে তাদের রাষ্ট্রে অবস্থানের কারণে, মারধর করার ও বেঁধে দেওয়ার পাশাপাশি তা না করলে হত্যার হুমকি দেয়। তাহলে এ ধরনের পরিস্থিতিতে তার জন্য সে কাজ করা জায়েয শুধু প্রকাশ্যে তাদের সাদৃশ্যতা বজায় রাখার জন্য, তবে তার অন্তর ঈমানে পূর্ণ অটল থাকে যেমনটি আম্মার (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। আল্লাহ বলেন ঃ

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النحل/١٠٦]

শুধু সে ব্যতিত যদি কাউকে বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে ... (আন্-নাহল ১৬ঃ ১০৬)

সুতরাং বিল ইক্বরাহ বা জবরদস্তি অবস্থা ব্যতীত অবশ্যই বৈধ নয় তার জন্য সে তাদেরকে বাহ্যিক সমর্থন করবে। সতর্কতার সাথে বিল ইক্বরার শর্ত সমূহ দেখে নেয়া প্রয়োজন, যেন সে সাধারন পরীক্ষায় তার ঈমানকে খুইয়ে না বসে।

❖ প্রশ্ন-২০। বিল ইক্বরাহ বা জবরদস্তি পরিস্থিতি কি যে অবস্থায় অন্তর ঠিক রেখে বাহ্যিক কুফরী কথা বলার রুখসাত রয়েছে? কোন কোন শর্ত পূরন না করলে বিল ইক্বরাহ বলে ঐ পরিস্থিতিকে গন্য করা হবে না?

উত্তরঃ- বিল ইক্বরাহ বা জবরদস্তি অবস্থা বলা হয় ঐ পরিস্থিতিকে যে অবস্থায় একজন কে হত্যা বা প্রচন্ড শাস্তি যা সহ্য করা অসম্ভব ঐ অবস্থায় সে তার অন্তরে পরিপূর্ন ঈমানকে ঠিক রেখে বাহ্যিক কুফরী কথা বলার অনুমতি দেয়। যেমনটি ঘটেছিল আম্মার বিন ইয়াসার (রা) এর ক্ষেত্রে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেনঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"ঈমান আনার পরেও যে আল্লাহর সাথে কুফরী করবে, সে ছাড়া যাকে বাধ্য করা হবে এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে । কিন্তু যারা তাদের হৃদয়কে কুফরীর জন্য উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আল্লাহর গজব নিপতিত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব " (সূরা, নাহল ১৬ঃ১০৭)

আলেমগণ অপারগতা প্রকাশ যাথাযথ হওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো ঃ

১) বাধ্যকারী তাকে যে হুমকি দেয় তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা তার আছে। আর যাকে হুমকি দেওয়া হয় সে পালিয়ে গিয়েও তা প্রতিরোধ করতে অক্ষম।

২) তার ধারণার মাত্রা এমন হতে হবে, যদি সে হুমকি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তার উপর হুমকির কাজ বাস্তবায়িত হবে।

৩) তাকে যা দিয়ে হুমকি দেওয়া হবে তা তাৎক্ষণিক উপস্থিত থাকতে হবে। যদি বলে তুমি এরূপ না করলে আগামীকাল তোমাকে মারব। তাহলে তাকে অপারগ বলে গণ্য করা হবে না।

৪) আদিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যেন বাড়াবাড়ি প্রকাশ না পায়। অর্থাৎ যেটুকু বললে বা করলে তার বিপদ (হুমকি) দূর হবে তার চাইতে বেশি কিছু করা।

একমাত্র যাকে এমন কঠিন শাস্তি দেওয়া হয় যা সহ্য করা সম্ভব নয় সে ব্যতিত কারো জন্য এ কাজ করা বৈধ নয়। আলেমগন শাস্তির মধ্যে হত্যা করা, অগ্নিদগ্ধ করা, অঙ্গহানী অথবা যাবত জীবন কারাদন্ডের কথা বলেছেন। আম্মার (রাঃ)-কে কেন্দ্র করে আত্মরক্ষার আয়াত নাযিল হয়েছে। এ কথা সবারই জানা যে, তারা যা বলেছিল তিনি তা বলেননি ততক্ষন পর্যন্ত, যখন তারা তার মাতাপিতাকে হত্যা করে এবং বিভিন্ন প্রকার কঠিন শাস্তি দেয়। তার পাজরের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং আল্লাহর জন্য তিনি কঠিন কষ্ট ভোগ করেছেন।

❖ প্রশ্ন-২১। জবরদস্তি পরিস্থিতিতেও কোন ভূমিকা নেয়া উত্তম? জবরদস্তি পরিস্থিতিতেও যারা নতি স্বীকার করেন নি এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত বর্ননা করুন?

উত্তরঃ- জ্ঞানী সম্প্রদায় কুফরী শব্দ বলতে বাধ্য করা অধ্যায় সম্পর্কে বলেছেন, শক্তভাবে তাওহীদকে আঁকড়ে থাকা, কষ্টে ধৈর্য্য ধরা, আল্লাহর কাছে এর পুরস্কারের আশা করা কোন প্রকার নতি স্বীকার না করে, এটা মহত্তের কাজ ও উত্তম। এটিই ছিল সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামদের অবস্থান ও আদর্শ। এ ধরনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দ্বীন প্রকাশ লাভ করে ও এর মর্যাদা ও গাম্ভীর্য ফুটে উঠে। দেখুন সহীহ্ বুখারীর অনুচ্ছেদ- "যে ব্যক্তি প্রহার, হত্যা ও অপমানকে কুফরীর উপর বেছে নেয়"। এর প্রমাণও ভুরিভুরি। তেমনিভাবে ইমামদের অবস্থান যা হিসাব করা সম্ভব নয়।

কিছু দৃষ্টান্ত- আসহাবুল **উখদুদের** ব্যাপারে বলা হয়েছে:

فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا. أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ. فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ يَا أُمَّهِ اصْبِرِى فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ

"........ রাজা তখন একটি গভীর গর্ত খুড়ে তার ভেতরে আগুন জ্বালাতে আদেশ দিলো এবং বললোঃ যে এই বালকের দ্বীন থেকে সরে না আসবে তাকেই এই আগুনে নিক্ষেপ করো বা তাকেই আগুনে লাফ দিতে আদেশ করো। তারা এমনটাই করতে থাকলো যতক্ষণ না এক মহিলা তার শিশুসন্তান সহ আসলো। সে আগুনে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করছিল। কিন্তু শিশুটি বলে উঠলোঃ মা, সহ্য করো (এই পরীক্ষা), কারণ তুমি সঠিক পথে আছো।" (সহীহ মুসলিম)

পূর্ব যুগের ঈমানদারদের অবস্থা যা খাব্বাবকে উদ্দেশ্য করে নবী (সঃ) বলেছিলেন ঃ

لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الركاب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله

"তোমাদের পূর্বের এমনও ঈমানদার ছিলেন তাকে ধরে এনে মাটির গর্ত খোড়া হত। তাতে তাকে ফেলা হত, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হত, এরপর তাকে দু'ভ করে ফেলা হত। লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংস তুলে নেওয়া হত। এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে সরাতে পারত না। ....(বুখারী ও অন্যান্য)

❖ প্রশ্ন- ২২। হাতিব ইবনে বালতাআ' (রা) এর মক্কায় কাফিরদের চিঠি লিখে সতর্ক করা কি কারনে কুফরী বলে গন্য হয় নি? আমাদের সময়ে এরূপ কাজ কেউ করলে তার সাথে আমাদের কি আচরন হবে?

উত্তরঃ- হাতিব (রা) মক্কা বিজয়ের অভিযানের পূর্বে মক্কার কাফেরদের চিঠি লিখে সতর্ক করেছিলেন যেহেতু তার পরিবার পরিজন মক্কায় ছিল তাদের সাপোর্ট করার মত কেউ ছিল না, তিনি এই কাজ করেছিলেন এই আশায় যে, আগে থেকে জানালে হয়তো তার পরিবারকে তারা কোন ক্ষতি করবে না। এই ঘটনা প্রকাশিত হলে উমার (রা) রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চান হতিব (রা) কে হত্যা করার জন্য। যে বুঝটি নবী (সঃ) এর উপস্থিতিতে উমার (রা) ব্যক্ত করেছিলেন সেটিকে তিনি অস্বীকার করেননি। সেটিই পূনার্ঙ্গ কথা। তাকে কিন্তু রাসূল (সঃ) একথা বলেননি, "যে তার ভাইকে 'হে কাফের' বলবে তখন দুজনের যে কোন একজন এ শব্দের বাহক হবে।" বরং উমারের (রা) হুকুমকে তিনি সমর্থন করেছেন। হাতিবের মত যার কোন প্রতিবন্ধকতা নেই তার ব্যাপারে উমার (রা) এর হুকুমকে বাদ দেননি।

রাসুল (সঃ) আমাদেরকে হাতিবের গোপনীয় পবিত্রতার কথা বলে দিয়েছেন তার ভাষায় لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "তুমি জান কি হয়তো আল্লাহ (সুব:) বদরবাসীদের প্রতি উকি মেরেছেন আর বলেছেন; 'তোমরা যে কোন আমল করতে পার। আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি" হাতিব (রা) বলেছিলেন যা বুখারীতে এসেছে "আমি এ কাজ কুফরী,

মুরতাদ বা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরীর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে করিনি।" তখন রাসূল (সঃ) তার অবস্থার সঠিক বলে বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। তৎক্ষণাত হাতিব কর্তৃক এ ধরণের কথা বলাই স্পষ্ট দলিল যে সাহাবীগণ ও তিনি জানতেন এ ধরনের কাজ করা কুফরী ও দ্বীনত্যাগ করার নামান্তর।

وَلَا نِفَاقًا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللّٰهَ مُظْهِرٌ رَسُولَهُ وَمُتِمٌّ لَهُ أَمْرَهُ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ عَزِيزًا بَيْنَ ظَهْرِيهِمْ وَكَانَتْ وَالِدَتِي مِنْهُمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَّخِذَ هَذَا عِنْدَهُمْ

আহমাদ ও আবু ইয়ালার বর্ণনায় এসেছে "আমি এ কাজ রাসূল (সঃ) কে ধোঁকা দেওয়ার জন্য করিনি বা মুনাফেকী বশতও নয়। আমি একথা জেনেই করেছি যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিজয়ী করবেন ও তাঁর নূরকে পূণার্ঙ্গ করবেন।"

তাদের অপর বর্ণনায় আছে ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, আমার অন্তর থেকে ঈমান বিকৃত হয়ে যায় নি ....।" (দেখুন 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' ৩০৬/৯) এবং বুখারীতে বর্ণিত নবী (সঃ) তার এ কথাকে সত্যায়ন করেছিলেন, "সে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলেছে।"

এই বদরী সাহাবীকে নবী (সঃ) বিষেশায়িত ও নির্দোষ ঘোষণা করেছেন এবং তার গোপনীয় ও লুকানো সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সে একাজ সে কুফরী বা দ্বীনত্যাগ করার জন্য করেনি। বরং এটি ছিল তার কবীরা গুনাহ যা বদরী যোদ্ধা হওয়ার কারণে ক্ষমা হয়ে গেছে।

ওয়াহী বন্ধ হওয়ার পর আমরা মানুষের বহ্যিক অবস্থা দেখে বিচার করার জন্য আদিষ্ট, মানুষের অন্তর চিরে দেখার জন্য আমরা আদিষ্ট হইনি। এজন্যই যে ব্যক্তি কাফিরের সাথে সামঞ্জস্যতা, বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে তার বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে আমরা তাকে কাফির ফতোয়া দিব এবং হত্যা করা হবে। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে গোপন বিষয়ের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন। যদি নিয়্যাত ভালই থাকে তাহলে আল্লাহ তাকে পুনরুত্থানের পর পুরস্কৃত করবেন। যদিও তাকে মুসলিম বাহিনী কাফিরদের কাতারে হত্যা করে থাকে।

❖ প্রশ্ন-২৩। মিল্লাতে ইবরাহীমের পথ থেকে দায়ীদের কে সরিয়ে নিতে ত্বাগুত কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়?

উত্তরঃ- আপনি যখন মিল্লাতে ইব্রাহীম ভালভাবে বুঝেছেন এবং জানতে পেরেছেন যে, এটি রাসূলগণ ও তাদের অনুসারীদের নীতি এবং এ হচ্ছে সাহায্য, বিজয় ও উভয় জগতে সৌভাগ্য লাভের পথ। তাহলে ভালভাবে জেনে রাখুন, প্রত্যেক যুগের আল্লাদ্রোহী শক্তি (ত্বগুতরা) এটা কোনদিনও মেনে নেয়নি। বরং তারা এ মহান মিল্লাতকে ভয় পায় এবং এর জন্য ভীতু, তারা

আপ্রাণ চেষ্টা করবে একে হত্যা করতে ও দা'য়ীদের অন্তর থেকে এই মিল্লাত বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতিতে মুছে ফেলার।

যেমন আল্লাহ তা'আলা প্রাচীন যুগ থেকেই তাদের এ তৎপরতা সম্পর্কে সূরা কালামে মাক্কীতে জানিয়ে দিয়েছেন ঃ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ "তারা আশা করে যদি তোমরা নমনীয় হও (আপোষ কর) তবে তারাও নমনীয় হবে।"(কালাম:৯) এই পথ থেকে সরিয়ে নিতে ত্বাগুত তার বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়, দায়ীদের বন্দী ও নির্যাতন করে। এর পাশাপাশি এমন কিছু পদক্ষেপ নেয় যেন তাদের পদস্থলন ঘটাতে পারে। বর্তমান সময়ের কিছু পদক্ষেপের উদাহরণ ঃ

- অনেক ত্বগুতরা যে পার্লামেন্ট ও জাতীয় সংসদ, কংগ্রেস, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানে দা'য়ীদের বিতর্ক একত্রিত করে এজন্য যে তারা এদের সাথে মিশে যাবে, তাদের মাঝের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে।
- কখনো অনেক ত্বগুত এই ভয়ানক পিচ্ছিল পথে বিনিয়োগ করে বিনিময়ে এ ধরনের অনেক মূর্খ আলেমদের বশ করে ফেলে। ঐ আলেমদের কাছ থেকে হাক্ মুসলিমদের দমন করার জন্য ফতোয়া আদায় করা এবং তাদের ও তাদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে এ ফতোয়া এই বলে কাজে লাগানোর জন্য যে, তারা খারেজী অথবা দ্বীনত্যাগী ও পৃথিবীতে বিশৃঙ্খল সৃষ্টিকারী লোক, জঙ্গীবাদী।
- কাফের কর্তৃক দা'য়ীদের পথচ্যুতি করার আরো একটি পদ্ধতি হলো মু'মিন ও দা'য়ীদেরকে পদ, কর্মস্থল চাকুরী, উপাধি প্রভৃতি দ্বারা প্রলুব্ধ করে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব, সম্পদ ও বাসস্থান প্রদান করা। তাদের প্রাচুর্য্য দান করা।
- আরেকটি পদ্ধতি হলো, কোন কোন ত্বাগুত দ্বীনের শাখা প্রশাখার ও দাওয়াতী কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। এর দ্বারা অনেক দা'য়ী ও আলেমদেরকে ধোঁকা দিয়ে ব্যস্ত রাখে যাতে করে এই ত্বগুতদের শয়তানী ও ফাসিকী কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে।
- তাদের ইসলাম রোধের আরেকটি পদ্ধতি হলো, তারা অনেক দা'য়ীকে দাওয়াত, খুতবা দেওয়ার অনুমোতি ও "সৎ কাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ" করার সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে দেয়, যেগুলোর মাধ্যমে তারা ঐসকল আগ্রহী দা'য়ীদেরকে শান্ত ও তাদের বশ করে রাখতে পারে।
- আরো একটি পদ্ধতি হলো, কাফির কর্তৃক মুসলিম প্রজন্মের যুবকদের অন্তরেই মিল্লাতে ইব্রাহীমকে ধ্বংস, নষ্ট ও হত্যা করে ফেলা, । আর এটা তারা করে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে এই ধরনের কারিকুলাম সরিয়ে দিয়ে তদস্থলে অন্য জিনিস অন্তর্ভূক্ত করে।

الولاء والبراءة

আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ ।

❖ প্রশ্ন । আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ কি?

উত্তর- 'আল ওয়ালা' শব্দের আভিধানিক অর্থ ভালবাসা, সমর্থন করা, সাহায্য করা, অনুসরণ করা । 'আল ওয়ালা' এর শারয়ী সংজ্ঞা হচ্ছে, শুধু আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করতে ভালবেসে কথা, কাজ ও বিশ্বাসে সম্পূর্ণ একমত হওয়া । কিছু জিনিস যা আল্লাহ্কে (সুবঃ) সন্তুষ্ট করে সেগুলো হচ্ছে- আল্লাহ্র স্মরণ (যিকির), আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা, আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস করা এবং মু'মিনদের ভালবাসা ।

'আল বারাআহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ ঘৃণা করা, ত্যাগ করা, দূরে থাকা ইত্যাদি । আল বারা এর শারয়ী সংজ্ঞা হচ্ছে 'আল-ওয়ালা'র সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ঐ সমস্ত সব কিছুর সাথে বিরোধিতা করা, ভিন্নমত পোষণ করা যা আল্লাহ্ ঘৃণা করেন এবং অপছন্দ করেন । গীবত, যিনা, শির্ক এবং কুফর হচ্ছে এমন কতগুলো জিনিষ যা আল্লাহ্ (সুবঃ) ঘৃণা করেন এবং এগুলো মু'মিনদেরও অবশ্যই ঘৃণা করতে হবে ।

'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআ'র বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চারটি বিষয় জড়িত, যথাঃ কথা, কাজ, বিশ্বাস এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বগণ । 'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' এমন একটি বিশ্বাস যা মুসলমানদের সকল কাজ ও কথাকে পরিচালিত করে এবং এটার অনুশীলন ও বাস্তবায়নের উপর মু'মিনদের মর্যাদার স্তরের তারতম্য ঘটে । প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃনা করাই হচ্ছে আল ওয়ালা ওয়াল বারার মূলকথা । আল্লাহ বলেনঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

"মু'মিনরা যেন মু'মিনদের ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে । যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর । আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তন । (সূরা, আলে ইমরান ৩ঃ২৮)

আল-বারা বিন আজিব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাঃ) বলেনঃ

اوثق عري الايمان الحب في الله والبغض في الله

'আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন।' [আহমাদ]

❖ প্রশ্ন-২। আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় অংশ তার প্রমান কি?

উত্তরঃ- 'ওয়ালা'র উৎস হচ্ছে ভালবাসা এবং 'বারাআ'র উৎস ঘৃণা; অন্তর এবং কাজ এই দুটি দ্বারাই এটি বাস্তবে পরিণত হয়। 'ওয়ালা' অন্তরঙ্গতায়, উদ্বিগ্নতায় এবং সাহায্যের দিকে উৎসাহিত করে। 'বারাআহ' বাধা, প্রতিবন্ধকতা, শত্রুতা এবং অস্বীকারকে ইন্ধন যোগায়। 'ওয়ালা' এবং 'বারাআহ' দুটোই ঈমানের ঘোষণার সাথে জড়িত এবং এর আবশ্যকীয় মূল সূত্রগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে। কুরআন এবং হাদীস থেকে এর প্রমাণ লক্ষনীয় যা নিম্নোক্ত কিছু আয়াতে উল্লেখ করা হলোঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

"মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন।" *(সূরা আলি 'ইমরান ৩ঃ ২৮)* এবং তিনি বলেনঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদর অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বল, আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ তো কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।" *(সূরা আলি 'ইমরান ৩ঃ৩১-৩২)*

আল্লাহ্ তাঁর শত্রুদের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে বলেনঃ

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا [النساء/٨٩]

"তারা এটাই কামনা করে যে, তারা যেরূপ কুফরী করেছে তোমরাও সেইরূপ কুফরী কর, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। তাই তোমরা তাদের মধ্যে থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে।" *(সূরা নিসা ৪ঃ ৮৯)* এবং তিনি আরও বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة/٥١]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" *(সূরা মা'য়িদা ৫ঃ ৫১)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨) هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١١٩) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ [آل عمران/١١٨-١٢٠]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ঈমানদার ব্যতীত অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ক্রটি করবে না; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা হলো, যদি তোমরা অনুধাবন কর। দেখ, তোমরাই তাদেরকে ভালবাস কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবে ঈমান রাখ আর তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু তারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দাঁতে কাটতে থাকে। বল, 'তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর'। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। তোমাদের মঙ্গল হলে তারা তাদেরকে কষ্ট দেয় আর

তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা এতে আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।" *(সূরা আলি 'ইমরান ৩ঃ ১১৮-১২০)*

আমরা এই বিষয়ে অনেকগুলো হাদীসের মধ্যে অল্প কয়েকটি হাদীস এবং সাহাবীদের আলোচনা উল্লেখ করবো যেমনঃ জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'মুহাম্মাদ (সঃ) তাদেরকে, প্রত্যেক মুসলমানকে পরামর্শ দেয়ার এবং প্রত্যেক কাফেরকে পরিহার করার শপথ করাতেন।' (মুসনাদে আহমদ- ৪/৩৫৭-৮) আল-বারা বিন আজিব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী (সঃ) বলেনঃ

اوثق عري الايمان الحب في الله والبغض في الله

'আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন।' *(আহমাদ)* ইবনে শায়বা বলেন যে মুহাম্মাদ (সঃ) বলেছেনঃ "ঈমানের দৃঢ়তম বন্ধন হলো শুধুমাত্র তাঁরই জন্য ভালবাসা এবং তাঁরই জন্য শত্রুতা।" (তাবারানী, আল কবির, ইবনে শায়বা এটা ইবনে মাসউদ থেকে মারফু রূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটা হাসান রূপে আখ্যায়িত করেছেন)

من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله ومنع لله الي اخر الحديث

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "যে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসে এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করে, এবং যে আল্লাহ্‌র জন্য বন্ধুত্ব নষ্ট করে অথবা তার জন্য শত্রুতা ঘোষণা করে, সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিরাপত্তা পাবে। এটা ছাড়া কেউ প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পাবে না, যদিও তার সওম ও সালাত অনেক হয়। মানুষ দুনিয়াবী বিষয়ে সম্পর্ক গড়ে তোলে, যা তাদেরকে কোন উপকারই করতে পারবে না।" (ইবনে রজব আল হাম্বালী, জামি আল উলূমওয়াল হাকিম, পৃঃ৩০)

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেন, "ঈমানের ঘোষণা- 'নাই কোন ইলাহ, ইবাদত যোগ্য আল্লাহ্ ছাড়া'- এর দাবী হচ্ছে তুমি শুধু আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে ভালবাসবে, কাউকে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করবে, নিজেরা বন্ধুত্ব করবে আল্লাহ্‌র জন্য, কারও সাথে শত্রুতা ঘোষণা করবে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য; এর দাবী হচ্ছে তুমি ভালবাসবে যা আল্লাহ্ ভালবাসেন, তুমি ঘৃণা করবে যা আল্লাহ্ ঘৃণা করেন" (ইবনে তাইমিয়্যাহ, আল-ইহ্‌তিজাল ফিল ক্বদর, পৃঃ ৬২)

❖ প্রশ্ন-৩। আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ-তে বিশ্বাসের মর্যাদা কি?

উত্তরঃ- ইসলামী আক্বীদায় 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' এর উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে ঃ

● "কোন ইলাহ নেই" যা হলো "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই"-এর অংশ। যাতে বুঝায়ঃ আল্লাহ ছাড়া যে সবকিছুর ইবাদত করা হয় সে সব হতে মুক্ত এবং নিরাপদ থাকা। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦]

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রাসূল পাঠিয়েছি, এই নির্দেশ প্রচারের জন্য যে, তোমরা কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক... ।" (সূরা নাহ্ল ১৬ঃ ৩৬)

● 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' অন্যতম প্রধান আক্বীদা যা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ়তম বন্ধন। আল-বারা বিন আজিব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাঃ) বলেনঃ

أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله

'আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্র জন্য ঘৃণা করা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন।' [আহমাদ]

● এটা হচ্ছে এমন একটা ভিত্তি যেটার দ্বারা অন্তর ঈমানের সৌন্দর্য্য এবং পরম আশ্বস্ততা অনুভব করে। নবী (সাঃ) বলেনঃ

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ (صحيح البخاري)

"যার মধ্যেই নিম্ন লিখিত তিনটি বৈশিষ্ঠ্য থাকবে সে ঈমানের মাধূর্য লাভ করবেঃ (১) তার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অন্য যেকোন কিছুর তুলনায় অধিক প্রিয় হবে। (২) যে একজনকে ভালবাসে এবং তাকে ভালবাসে শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য। (৩) এবং সে কুফরীতে ফেরত যাওয়াকে এমনভাবে ঘৃণা করে যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।" [সহীহ্ বুখারী, মুসলিম]

● এটা হচ্ছে বুনিয়াদ যেটার উপর মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্ত সম্বন্ধ এবং আদান-প্রদান নির্ভর করে, যেমন মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেনঃ

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير

"তোমাদের ঈমান নাই যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার ভাই (মুসলিম) এর জন্য পছন্দ করে।" [বুখারী]

- তাদের জন্য অনেক বড় ও অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে যাদের বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা যখন কাউকে ভালবাসে শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসে। রাসুল (সাঃ) বলেনঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ...... وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ..... (صحيح البخاري)

"সাত প্রকারের লোক যাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র জন্য একে অন্যকে ভালবাসত, তারা আল্লাহ্‌র জন্য মিলিত হত এবং আল্লাহ্‌র জন্য বিচ্ছিন্ন হত।"

- এটা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন বা সম্পর্ক যা মানুষের মধ্যে পরস্পর বন্ধন তৈরী করে। আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে সব ধরনের বন্ধনের উপর প্রাধান্য দিয়ে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [التوبة/٢٤]

"বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা তওবা ৯ঃ ২৪)

- এই 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' আক্বীদা হচ্ছে আল্লাহ্‌র 'ওয়ালাহ (আত্মরক্ষা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, রাজত্ব) পাবার একটি মাধ্যম। ইবনে জারীর ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেনঃ فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاء من الله "যে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসে এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করে যে আল্লাহ্‌র জন্য 'মুয়ালাত'(সাহায্য করা, সমর্থন করা) করে এবং আল্লাহ্‌র জন্য

শত্রুতা পোষণ করে, সে আল্লাহ্‌র 'ওয়ালায়াহ' অর্জন করবে।" (আহমদ ১৫৫৮৮)

● আল ওয়ালা ওয়াল বা'রার সম্পর্ক কেয়ামতের দিনেও থাকবে যা আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা আমাদের পূর্বেই জানিয়েছেনঃ

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

"যারা অনুসৃত হয়েছে- তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।" (সূরা বাকারা ২ঃ ১৬৬)

যে আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীন ছাড়া অন্য কিছুকে ভালবাসে এবং তাকে (আল্লাহ্), তার দ্বীনকে অথবা তার অনুসারীদের ঘৃণা করে, সে নিশ্চিত কাফের। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة/٥١]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা মা'য়িদা ৫ঃ ৫১)

● 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' হচ্ছে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এর পূর্ণতার জন্য এটি প্রয়োজনীয়। একটি হাদীসে রয়েছেঃ

من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان

"যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করে আল্লাহ্‌র জন্য দান করে এবং আল্লাহ্‌র জন্য (দান করা হতে) বিরত থাকে, ঐ ব্যক্তি তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।" [আহমাদ ও তিরমিযী, হাসান হাদীস]

❖ প্রশ্ন-৪। 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র দাবী সমূহ কি কি?

উত্তরঃ- কোন মুসলিম যে ঈমানের দাবী করে তাকে আল ওয়ালার উপযুক্ত হওয়ার জন্য অবশ্যই এর শর্ত ও দাবীসমূহ পূরণ করতে হবে, নিঃসন্দেহে 'আল ওয়ালা' এবং 'আল বারা' এর দাবীসমূহ পূরণ একজন মুসলিমের দ্বীনের সাথে লেগে থাকার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। একজন মুসলিমের প্রতি 'আল ওয়ালা' এর দাবীসমূহঃ

- দ্বীন রক্ষার্থে অমুসলিম ভূমি থেকে মুসলিম ভূমিতে হিজরত করা, শুধুমাত্র যারা দুর্বল ও অত্যাচারিত এবং যারা ভৌগলিক ও সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে হিজরত করতে পারে না তারা ছাড়া।
- দ্বীন এবং দুনিয়ার যে কোন বিষয়ে, যে কোন মুসলিম সম্প্রদায়কে সমর্থন ও সাহায্য করা, যা কিনা আমাদের কথার মাধ্যমে হোক, অন্তর দিয়ে হোক বা সম্পদের মাধ্যমে হোক। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (٧٣) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [الأنفال/٧٣، ٧٤]

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারা পরষ্পর পরষ্পরের বন্ধু-----।" (সূরা আনফাল ৮ঃ ৭২)

- অন্যান্য মুসলিম ভাইদের আনন্দে এবং দুর্দশার সময়ের সাথী হওয়া।

নবী (সাঃ) বলেনঃ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَ تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌمِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ

পারষ্পরিক ভালবাসার দিক দিয়ে মু'মিনদের দৃষ্টান্ত একটি মানব দেহের মত, যদি তার চক্ষু পীড়িত হয় তখন মাথা অসুস্থ হয় তাহলে সমগ্র শরীরই অসুস্থ হয়ে পড়ে।" (সহীহ্ মুসলিম)

মুসলিমদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকা এবং তাদের খবরা-খবর মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

- একজন মুসলিম তার ভাইয়ের ভাল কিছু অর্জন করা এবং খারাপ কিছু থেকে বিরত হওয়া অবশ্যই পছন্দ করবে, যেভাবে সে এগুলো নিজের জন্য পছন্দ করে। নবী (সাঃ) বলেনঃ

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير

"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (সহীহ্ মুসলিম)

• অন্যান্য মুসলিমদের গালি দেওয়া, ঠাট্টা করা এবং গীবত করা থেকে বিরত থাকা, আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে মুসলিমদের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ [الحجرات/١٢]

"হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি খারাপ। যারা তওবা না করে তারাই যালিম। হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভায়ের গোশত খেতে চাইবে। বস্তুত তোমরা তো তা ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।" (সূরা হুজুরাত ৪৯ঃ ১১-১২)

• মুসলিম জামা'আ-র সাথে একতায় থাকা এবং দলাদলি, ভাগাভাগি, মতদ্বৈততা পরিহার করা যেমন আল্লাহ্ হুকুম করেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর ঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং

তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎ পথ পেতে পার।” (সূরা আলি ‘ইমরান ৩ঃ ১০৩)

রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

“যে মুসলিম জামা’আ থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যাওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করবে।” (সহীহ্ মুসলিম)

‘আল বারা’-এর দাবীসমূহ ঃ

মু'মিন হওয়ার জন্য একজন মুসলিমের ইসলাম ও মুসলিমের প্রতি শুধুমাত্র আল ওয়ালা’র দাবীসমূহ সঠিকভাবে পূরণ করা যথেষ্ট নয়, তাকে কুফর ও কাফেরদের প্রতি ‘আল বারা’র দাবীসমূহও আন্তরিকতার সাথে পূরণ করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ দাবীসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ

- কুফর, শির্ক এবং তৎসংলগ্ন লোকদের ঘৃণা করা; তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষন করা যেমন আল্লাহ্র কালামে বর্নিত হয়েছেঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

“তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহ্তে ঈমান আন----।” (সূরা মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)

- কাফেরদেরকে আউলিয়া (মদদদানকারী, সাহায্যকারী ইত্যাদি) হিসাবে গ্রহণ না করা এবং তাদের সাথে স্নেহ, ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে না তোলা কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা’আলা হুকুম করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ [الممتحنة/١]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ তারা, তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কর------ ।" (সূরা মুমতাহিনা ৬০ঃ ১)

- তাদের (কাফের) ভূমি থেকে হিজরত করা এবং বিশেষ কারণ ছাড়া তাদের ভুমিতে ভ্রমন করা। সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ ». (سنن أبي داود)

"যে কেউ মুসলিমদের মধ্যে থেকে মুশরিকদের সাথে সাক্ষাত করে, তাদের মাঝে বাস করে থাকে এবং তাদের জীবনযাত্রাকে সমর্থন করে সেও (সে মুসলিমও) তাদের মধ্যে একজন (অর্থাৎ মুশরিক)।" (আবু দাউদ)

- কাফেরদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবন ব্যবস্থাকে অনুসরণ না করা। যেমনঃ নবী (সাঃ) হতে বর্ণিত আছেঃ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "যে কেউ অন্য কোন (জাতীর) লোকের অনুসরণ করে, সে তাদের মধ্যে একজন।" নবী (সাঃ) আরও বলেনঃ غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى "আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ইহুদী এবং খৃষ্টানরা তাদের চুলে খিজাব লাগায় না, অতএব তারা যা করে তোমরা তার বিপরীত কর।" (সহীহ্ বুখারী)

- তাদের সঙ্গ এবং বন্ধুত্ব ত্যাগ করা যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ [هود/١١٣]

"যারা সীমালংঘন করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড় না, তাহলে অগ্নি তোমদিগকে স্পর্শ করবে। এই অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন

অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হবে না।” (সূরা হূদ ১১: ১১৩)

● কাফেরদের সাথে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার এবং সম্মানের খাতিরে দ্বীনের মধ্যে কোন আপোষ-মিমাংসা করা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ “তারা (কাফির) চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তা হলে তারাও নমনীয় হবে।” (সূরা কালাম ৬৮: ৯)।

অধিকন্তু, মুওয়াহিদরা কাফেরদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করবে না, যেমন আল্লাহ্ হুকুম করেছেনঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة/١١٣]

“আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামী।” (সূরা তওবা ৯: ১১৩)

কাফেরদের শত্রুতার ধরন

❖ প্রশ্ন-১। মু'মিদের সাথে কাফিরদের শত্রুতার ধরন কি?

উত্তরঃ তাদের এই শত্রুতার রয়েছে নানান রূপঃ

▪ অন্তরের কুফরী (তাকযিব); আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ [الأنعام/٣٤]

“নিশ্চয় তোমার পূর্বে অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল; কিন্তু তারা ধৈর্যধারণ করেন...” (সূরা আন'আম ৬: ৩৪)

▪ ঠাট্টা (সুখ্‌রিয়াহ) এবং বিদ্রুপ (ইসতিহ্জা) করা; আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ [المطففين/٢٩]

“যারা অপরাধী তারা তো মু'মিনদেরকে উপহাস করত।” (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ৮৩: ২৯)

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ [يس/٣٠]

“পরিতাপ বান্দাদের জন্য; তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে বিদ্রুপ করেছে।”(সূরা ইয়াসীন৩৬:৩০)

■ মু'মিনদেরকে পাগল (জুনুন) বলে অপবাদ দেয়া; আল্লাহ্ (সুব:) বলেনঃ

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ [الحجر/٦]

"তারা বলে, 'ওহে যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ।" (সূরা হিজ্‌র ১৫ঃ ৬)

■ মু'মিনরা কর্তৃত্ব (হুক্‌ম) ও ক্ষমতালোভী (রিয়াসাহ) বলে অপবাদ দেয়া, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ [يونس/، ٧٨]

"তারা বলতে লাগলোঃ তুমি কি আমাদের নিকট এইজন্য এসেছ যে, আমাদেরকে সরিয়ে দাও সেই তরিকা থেকে, যাতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি, আর পৃথিবীতে তোমাদের দুইজনের আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায়?" (সূরা ইউনুস ১০ঃ ৭৮)

■ মু'মিনদের ধর্মত্যাগ ও বিশৃঙ্খলা (ফাসাদ) সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত করা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ [غافر/٢٦]

"ফিরাউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের স্মরণাপন্ন হোক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।" (সূরা মু'মিন ৪০ঃ ২৬)

■ মু'মিনদের দারিদ্র ও অসহায়ত্বের সুযোগে গালমন্দ করা, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ [الشعراء/١١١]

"তারা বললঃ আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ নিচু শ্রেণীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে।" (সূরা শূরা ২৬ঃ ১১১)

■ তারা এটি করত যাতে অন্য মানুষেরা মু'মিনদের নিকটে না আসেঃ

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا [مريم/٧٣]

"... কাফিররা মু'মিনদের বলেঃ দু'দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসেবে কোনটি উত্তম।" (সূরা মারইয়াম ১৯ঃ ৭৩)

▪ মু'মিনরা অভিশপ্ত এবং মু'মিনদের কারণে তাদের উপর গযব আসবে এমন অভিযোগঃ

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

"তারা বললঃ আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি এবং যদি তোমরা বিরত না হও তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব; ..." (সূরা ইয়াসীন ৩৬ঃ ১৮)

▪ সত্য প্রত্যাখ্যান এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা যুক্তি প্রদর্শন; আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا

"কিন্তু কাফিররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতন্ডা করে, এর দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেই সমস্তকে তারা বিদ্রুপের বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করে থাকে।" (সূরা কাহ্ফ ১৮ঃ ৫৬)

▪ সাধারণ মানুষকে মু'মিনদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা, আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেনঃ

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ

"তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা বললঃ 'তোমরা যদি শুআ'ইবকে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্থ হবে'।" (সূরা আ'রাফ ৭ঃ ৯০)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ [غافر/٢٦]

"ফিরাউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের স্মরণাপন্ন হোক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।" (সূরা মু'মিন ঃ ২৬)

মু'মিনরা মুষ্টিমেয় হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ জনগণের উপর তাদের মতবাদ চাঁপিয়ে দিচ্ছে এমন অভিযোগ উত্থাপন। এর উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ (সুবঃ) বলেন فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٥٣) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (٥٤) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (٥٥) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ [الشعراء/٥٣-٥٦] "এরপর ফিরাউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠালো এই বলেঃ 'ইহারা তো ক্ষুদ্র একটি দল। ইহারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে এবং আমরা তো সকলেই সদা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সদা সতর্ক'।" (সূরা শু'আরা ২৬ঃ ৫৩-৫৬)

▪ তারা দাবী করে যে, সত্য দ্বীনের ব্যাপারে তাদের অবস্থান মু'মিনদের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى [طه/٦٣]

"তারা বললঃ নিশ্চয় এরা দুইজন যাদুকর, তারা চায় তাদের যাদু দিয়ে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস করতে।" (সূরা ত্বাহা ২০ঃ ৬৩)

▪ নানাবিধ চক্রান্ত ও পরিকল্পনা করে সাধারণ মানুষকে মু'মিনদের অনুসরণ থেকে বিরত রাখা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [سبأ/٣٣]

"যাদেরকে দুর্বল বলা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবেঃ 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আলাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলায় শৃঙ্খল পরাব। তাদেরকে তারা যা করত তারই প্রতিফল দেয়া হবে।" (সূরা সাবা ৩৪ঃ ৩৩)

▪ মু'মিনদেরকে সুবিধাবঞ্চিত করে দ্বীন থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা।
আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ [المنافقون/٦، ٧]

"তারা বলেঃ আলাহ্র রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় কর না যতক্ষণ না তারা তার থেকে সরে পড়ে। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধনভান্ডার তো আল্লাহ্রই কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।" (সূরা মুনাফিকূন ৬৩ঃ ৭)

▪ মু'মিনদেরকে নানাবিধ সমস্যায় ফেলে দ্বীন থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা।
আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ [القلم/٩] "তারা চায় তুমি নমনীয় হও; তাহলে তারাও নমনীয় হবে।" (সূরা কালামঃ ৯)

আল্লাহ (সুব:) বলেনঃ

وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ [المائدة/٤٩]

"...তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও যাতে আল্লাহ যা তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন তা থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে।" (সূরা মা'য়িদা ৫ঃ ৪৯)

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ [البقرة/١٢٠]

"ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর।" (সূরা বাকারা ২ঃ ১২০)

- মু'মিনরা যদি তাদের দ্বীন থেকে না সরে অথবা কাফিরদের সাহায্য সহযোগীতা না করে তবে তাদেরকে জেল ও মৃত্যুদন্ডের ভয় দেখানো।

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا

"কাফিররা তাদের রাসূলগণকে বলেছিলঃ আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দেশ থেকে বহিস্কৃত করব।" (সূরা ইব্রাহীম ১৪ঃ ১৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا

"তারা যদি তোমাদের ব্যাপারে জানতে পারে তাহলে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনোই সফলকাম হবে না।" (সূরা কাহ্ফ ১৮ঃ ২০)

- মু'মিনদের উপর অত্যাচার, হত্যা এবং সংঘাত চাঁপিয়ে দেয়া।

আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ [الأنبياء/٦٨]

"তারা বললঃ তাকে পুড়িয়ে দাও; সাহায্য কর তোমাদের দেবতাদেরকে...।" (সূরা আম্বিয়া ২১ঃ ৬৮) তিনি, (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা), বলেনঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ [الأنفال/٣٠]

"আর স্মরণ কর যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যে, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা নির্বাসিত করবে..." (সূরা আন্ফাল ৮ঃ ৩০) তিনি, (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা), বলেনঃ

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ [البقرة/٢١٧]

"তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়।" (সূরা বাকারা ২ঃ ২১৭)

তাই মু'মিন ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, কাফিরদের শত্রুতা ও বিরোধিতার কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যা কখনো বদলাবে না।

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের বিধান

❖ প্রশ্ন-১। কফিরদের সাথে ভয়ের ওজর দেখিয়ে বন্ধুত্বের ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তরঃ- ইমাম সুলাইমান বিন আব্দিল্লাহ রহ. বলেন, তুমি জেনে রেখো আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন,

"যদি একজন ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে موافقة মুওয়াফাক্বাহ (ঐক্য, সম্মতি, সন্তুষ্টি) দেখায়-তাদের থেকে ভয়ে, তাদের প্রতি مداراة মুদ্বারাহ (বন্ধুত্ব, নম্রতা) দেখায়, অথবা مداهنة মুদ্বাহানাহ (আপোস করে, তোষামদ করে) দেখায় তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য, তাহলে সে তাদের মতই কাফের, যদিও তাদের দ্বীনকে সে অবজ্ঞা করে এবং ঘৃনা করে, ইসলাম এবং মুসলিমদের ভালবাসে।" (আদ দালাইল ফি মুওয়ালাত আহলি আল ইশরাক/৭৯)

❖ প্রশ্ন-২। مكره মুক্বরাহ কে?

উত্তরঃ মুক্বরাহ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার প্রতি জবরদস্তি করা হয়, যাকে মুশরিকিনরা বন্দী করে এবং বলে, কুফরী কর না হলে তোমাকে এরূপ এরূপ করব এবং হত্যা করব অথবা তাকে তারা নিয়ে যায় ততক্ষন পর্যন্ত নির্যাতন করতে থাকে যতক্ষন না সে তাদের সাথে রাজী হয়। সুতরাং তার জন্য অনুমতি রয়েছে তাদের সাথে মুখের কথায় রাজী হওয়া, যখন তার অন্তর ঈমানে অটল থাকবে। আল্লাহ বলেছেন,

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النحل/١٠٦]

"ঈমান আনার পরেও যে আল্লাহর সাথে কুফরী করবে, সে ছাড়া যাকে বাধ্য করা হবে এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে । কিন্তু যারা তাদের হৃদয়কে কুফরীর জন্য উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আল্লাহর গজব নিপতিত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব " (সূরা, নাহল ১৬ঃ১০৭)

❖ প্রশ্ন-৩। ভয়ে বা দুনিয়ার স্বার্থে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে দালীল প্রমান কি?

উত্তরঃ সালফে সালেহীনগনের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে, যে কৌতুক করে কুফরী কথা বলে সে কুফরী করে, সুতরাং তার ব্যাপারে কি ফায়সালা হবে যে লোভের বশবর্তী হয়ে, দুনিয়াবী বিষয় অর্জন করার জন্য বা ভয়ে কুফরী কথা বলে? নিশ্চয়ই ভয় বা দুনিয়াবী স্বার্থ কোন ওজর নয়, এর প্রমান অনেক, আমরা এখানে কিছুমাত্র উল্লেখ করলাম-

প্রথম প্রমানঃ আল্লাহ সুবঃ বলেন,

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।" (সূরা, বাক্বারাহ ২ঃ১২০)

আল্লাহ সুবঃ বলেন,

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

" জ্ঞান (কুরআন) আসার পর আপনি যদি তাদের হাওয়ার অনুসরন করেন তাহলে আপনি জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবেন।" (সূরা, বাক্বারাহ ২ঃ১৪৫)

সুতরাং রাসুল (সঃ) যদি তাদের ভয়ে অন্তরে কোন বিশ্বাস না রেখে তাদের দ্বীনের অনুসরন করতেন বাহ্যিকভাবে , তাহলেও তিনি জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হতেন।

দ্বিতীয় প্রমানঃ

وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدِ

" বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।" (সূরা, বাক্বারাহ ২ঃ২১৭)

আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন কুফফাররা ততক্ষন যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষন না আমাদেরকে আমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুফরী

করবে কাফেররা তাদের সাথে যুদ্ধ করার পর তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। তাহলে তার ব্যাপারে ফায়সালা কি যারা মুশরিকরা তাদের সাথে যুদ্ধ করা ব্যতীত ঐক্যমত পোষন করে, তাদের অবস্থা আরও ভয়ংকর।

তৃতীয় প্রমানঃ

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

অর্থ:- মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্র সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।(সূরা আলে ইমরান২৮)

আল্লাহ নিষেধ করেছেন মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধু বানাতে, সতর্ক করেছেন যারা এরূপ করবে তাদের সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তারা ব্যতীত যারা তাদের থেকে বিপদের আশংকা করে অর্থাৎ তাদের দ্বারা বশীভূত এবং তাদের সাথে শত্রুতা প্রদর্শন করতে সক্ষম নয়, তাই সে বাহ্যিক বন্ধুতা দেখায়, অথচ তার অন্তরে কাফেরদের প্রতি শত্রুতা এবং ঘৃনা রয়েছে সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে বাধা দূর হবার যেন সে পুনরায় শত্রুতা ও ঘৃনা প্রদর্শন করতে পারে তার ব্যাপার ভিন্ন।

সুতরাং তার ব্যাপারটি কত খারাপ যে দুনিয়াবী স্বার্থে তাদেরকে বন্ধু বানায়, কারণ সে কাফেরদের ভয় করে। অথচ আল্লাহ নিষেধ করেছেন তাদের ভয় করতে- { إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } "এরাই হলে শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর।" (সূরা, আলে ইমরান ৩ঃ১৭৫)

চতুর্থ প্রমানঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফেরদের কথা শোন, তাহলে ওরা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীণ হয়ে পড়বে।" (সূরা, আলে ইমরান ৩ঃ১৪৯)

আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন তাদের আনুগত্য করলে নিঃসন্দেহে তারা কুফরীতে ফিরিয়ে নেবে, কারণ কুফরীর কমে কোন কিছুতে তারা সন্তুষ্ট নয়।

পঞ্চম প্রমানঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ

"হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই।" (সূরা, মায়িদাহ ৫ঃ৫১-৫২)

সাহবী আবু হুরাইরা (রা) বলেন, তোমাদের প্রত্যেক্যে ভয় করা উচিত, কারণ সে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান হয়ে যেতে পারে যখন সে জানবেও না। অতপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন..(আদ দুররে মানসুর ৩/১০০)

এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনু হাযম রহ. বলেন, এই আয়াতটি শাব্দিক অর্থে নেয়া যথার্থ, অর্থাৎ সে হচ্ছে কাফির কুফফারদের দল থেকে, এটাই সত্য। এমনকি দুইজন মুসলিমও এই ব্যাপারে ভিন্নমত পোষন করবে না। (আল মুহাল্লা, ১১/১৩৮)

আয়াতে আল্লাহ তাদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে ভীতিকে ওজর হিসেবে গ্রহণ করেন নি, বরং তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তারা দূর্ঘটনায় পতিত হওয়ার ভয়ে এরূপ করে।

ষষ্ঠ প্রমানঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"ঈমান আনার পরেও যে আল্লাহর সাথে কুফরী করবে, সে ছাড়া যাকে বাধ্য করা হবে এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে । কিন্তু যারা তাদের হৃদয়কে কুফরীর জন্য উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আল্লাহর গজব নিপতিত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব । এটা এ জন্যে যে, তারা পার্থিব

জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা, নাহল ১৬ঃ১০৬-১০৭)

সুতরাং আল্লাহ সুবঃ অপরিবর্তনীয় ফায়সালা করেছেন- যে তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে সে কাফের। তার জীবন, সম্পদ বা পরিবারের ওজর থাকুক বা না থাকুক, সে বাহ্যিকভাবে কুফরী করুক বা অন্তরে, অথবা শুধু বহ্যিকভাবে, অন্তরে নয়, চাই সে কুফরী করুক কথা ও কাজ উভয়ভাবে, অথবা যেকোন একভাবে, অথবা মুশরিকদের থেকে কোন দুনিয়াবী লাভের জন্য- **সকল অবস্থায় সে কাফির**- শুধুমাত্র সে ব্যতীত যে মুক্বরাহ (যাকে জবরদস্তি করা হয়েছে)।

আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, যে কুফরীর জন্য হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেয় যদিও সে সত্যের ব্যাপারে নিশ্চিত, তারা বলে- আমরা এটা করতে চাইনি তাদের ভয় ব্যতীত- কিন্তু তবুও " তাদের উপর আল্লাহর গজব নিপতিত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব " অত:পর তিনি জানিয়ে দিয়েছেন তাদের এই শাস্তির কারণ এই নয় যে, তারা শিরকে বিশ্বাস করত, এটা নয় যে তারা তাওহীদের ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল, এটাও নয় যে দ্বীনকে ঘৃনা করা বা কুফরকে ভালবাসা- বরং কারণ হচ্ছে দুনিয়াকে দ্বীনের উপর, তাঁর সন্তুষ্টির উপর স্থান দেয়া।

সপ্তম প্রমানঃ-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।" (সূরা, হাজ্জ ২২ঃ১১)

তাদের অবস্থা হচ্ছে যারা ফিতনায় পড়ে দ্বীনকে ত্যাগ করে তাদের মত। যখন তারা ফিতনায় পড়ে তারা দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং মুশরিকদের সাথে একমত পোষন করে, তাদের আনুগত্য করে এবং তারা মুসলিমদের জাম'আ ত্যাগ করে মুশরিকদের দলে চলে যায়।

অষ্টম প্রমানঃ

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

"যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়।" (সূরা, মুজাদালাহ ঃ২২)

আল্লাহ জনিয়ে দিয়েছেন, যারা ঈমান আনে এমন একজনকেও খুজে পাওয়া যাবে না, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সাথে বিরুদ্ধাচরনকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে সে যেই হোক না কেন। কারণ এই বন্ধুত্ব হচ্ছে ঈমান বিধ্বংসী, কারণ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং ঈমান কখনই এক হতে পারে না, যেমন আগুন পানি এক হতে পারে না।

আয়াতে আল্লাহ পরিষ্কার সতর্কতা জারি করেছেন যে, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের জন্য কখনই সম্পদ, পিতা, ভাই, স্ত্রী-সন্তান, গোত্র-গোষ্ঠীর ভয় ওজর হতে পারে না, যাকে অনেকেই ওজর হিসেবে দেখাতে চায়।

যারা বলে যে আমাদের ওজর হচ্ছে আমরা তাদের ভয়ে এরূপ করি, তাদের জবাবে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ কারণ ভয় কোন ওজর নয়, আল্লাহ বলেছেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ [العنكبوت/١٠]

"কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি; কিন্তু আল্লাহ্র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্র আযাবের মত মনে করে।" (সূরা, আনকাবুত ২৯ঃ১০)

❖ প্রশ্ন-৪। বিল ইক্বরাহ-র পরিস্থিতিতেও অন্য মুসলিমের ক্ষতি করা জায়েয কিনা?

উত্তরঃ- বিল ইক্বরাহ বা জবরদস্তি পরিস্থিতি যদি সত্যিই হয় তবে অনুমতি আছে অন্তরে ঈমান ঠিক রেখে বাহ্যিক কুফরী কথা বলা বা কাজ করা যতক্ষন না তা অন্যকোন মুসলিমকে ক্ষতি করে। কিন্তু এতে যদি অন্য মুসলিমদের ক্ষতি হয়, তাহলে তা বৈধ নয়, এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে- একজন ব্যক্তি নিজের জীবনকে বাঁচানোর জন্য অন্য মুসলিমকে হত্যা করতে পারে না।

আন্ নাওয়াবী (রহ.) বলেন, যদি তা হয় কোন মুসলিমকে হত্যা করা, তাহলে তা বৈধ নয় এমনকি ইক্বরাহ-র পরিস্থিতিতেও, এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। (আল মিনহাজ শরাহ সাহীহ মুসলিম,১৮ঃ১৬-১৭)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) তাতারদের দ্বারা জোর করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করানোর ব্যাপারে বলেন, "এমনকি যদি তাকে জবরদস্তি করা হয় যুদ্ধ করার জন্য এই ফিতনার সময়ে, তার জন্য বৈধ নয় যুদ্ধ

করা। বরং এটা তার জন্য ওয়াজিব তার অস্ত্রকে ধ্বংস করা এবং শাহীদ না হওয়া পর্যন্ত সাবর করা.....নিশ্চয়ই তার জন্য বৈধ নয় অন্য মুসলিমকে হত্যা করা, ইজমা অনুযায়ী। সুতরাং যদি তাকে জবরদস্তি করা হয় এবং হুমকি দেয়া হয় তাকে হত্যা করা হবে যদি অন্য মুসলিমকে হত্যা না করে, তারপরেও তার জন্য বৈধ নয় অন্যকে হত্যা করা তার নিজের জীবনকে রক্ষা করার জন্য। এটা বৈধ নয় অন্যদের উপর যুলুম করা নিজে নিহত না হওয়ার জন্য। (মাজমুউল ফাতওয়া ২৮/৫৩৮-৫৩৯)

❖ প্রশ্ন-৫। মুওয়ালাত এবং তাওয়াল্লী কি?

উত্তরঃ শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন হুমাইদ রহ. বলেন, প্রত্যেক মুসলিম যে আল্লাহর প্রতি মুখলিস তার উপর ওয়াজিব যে সে জেনে নিবে উলামাগন তাওয়াল্লী এবং মুওয়ালাত এর পার্থক্যের ব্যাপারে কি বলেছেন। মুওয়ালাত হচ্ছে, যেমন কাফেরদের সাথে নরমভাবে কথা বলা, তাদের প্রতি হাসা, তাদের ময়লা পরিষ্কার করে দেয়া এবং অনুরূপ কাজসমূহ, যদিও ঐ অবস্থায় তাদেরকে এবং তাদের দ্বীনকে পরিত্যাগ করে, তথাপিও সতর্ক থাকতে হবে- কারণ এগুলো হচ্ছে কাবায়ের (কবিরা গুনাহ) এর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ, এবং ঐ ব্যক্তি খুবই বিপদজনক অবস্থায় আছে।

এবং তাওয়াল্লী হচ্ছে, তাদের গুন-কীর্তন করা, অথবা তোষামদ করা, অথবা তাদেরকে সাহায্য এবং সহযোগিতা করা মুসলিমদের বিরুদ্ধে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদেরকে স্পষ্টভাবে পরিত্যাগ না করা- এইসবগুলো হচ্ছে যে তা করে তার রিদ্দাহ (দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়া) এবং তার প্রতি মুরতাদের হুকুম জারি করা ওয়াজিব- যা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা প্রমানিত। (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ১৫/৪৭৯)

❖ প্রশ্ন-৬। মুওয়ালাত এবং তাওয়াল্লী এর মধ্যে পার্থক্য কি? এই দু'টি জিনিসকে কিভাবে আলাদা করা হবে?

উত্তরঃ সম্মানিত শাইখ আলী আল খুদাইর কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মুওয়ালাত এবং তাওয়াল্লী এরমধ্যে পার্থক্য কি? এই দু'টি জিনিসকে কিভাবে আলাদা করা হবে?

সম্মানিত শাইখ উত্তরে বলেন, কুফফারদের প্রতি তাওয়াল্লী হচ্ছে কুফরে আকবার বা বড় কুফর (যা ইসলামের বাইরে নিয়ে যায়) এগুলোর মধ্যে কোন তাফসীল নেই। এগুলো হচ্ছে চার প্রকার-

১। কুফফারদেরকে তাদের দ্বীনের কারনে ভালবাসা বা মুহাব্বাতের মাধ্যমে তাওয়াল্লী।

যেমন, গনতন্ত্রের লোকদের গনতন্ত্রের জন্য ভালবাসা, আইন প্রণয়নকারী সংসদ সদস্যদের ভালবাসা, আধুনিকতাবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের ভালবাসা, তাদের উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাসের কারনে। সুতরাং সে ব্যক্তি কাফের, কুফরে তাওয়াল্লী এর কারনে। আল্লাহ সুবঃ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

"হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা, মায়িদাহ ৫ঃ৫১) কারণ ওয়ালী এর এক অর্থ মুহিব (যে ভালবাসে, পছন্দ করে..), এটা বলেছেন ইবনে আছির রহ. আন্ নিহায়্যাহ ২/২২৮ এ।

২। সাহায্য করা (নুসরাহ) এবং সহযোগিতার মাধ্যমে তাওয়াল্লী।

যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করে সে কাফির, মুরতাদ। যেমন যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের সাহায্য করছে। আল্লাহ সুবঃ বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

"হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা, মায়িদাহ ৫ঃ৫১)

৩। মৈত্রী স্থাপনের মাধ্যমে তাওয়াল্লী।

যে কুফফারদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে, চুক্তি করে বন্ধুত্বের সাহায্য করার জন্য, এমনকি বাস্তবে যদি সাহয্য নাও করে কিন্তু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়, এই ব্যাপারে আল্লাহ সুবঃ বলেন-

أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ

"আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে বলেঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।" (সূরা, হাশর ৫৯ঃ১১)

এই প্রতিশ্রুতি মুনাফিক্বরা মদীনার কিছু ইয়াহুদীদেরকে করেছিল। এর অনুরূপ হচ্ছে বর্তমানে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কোয়ালিশন গড়ে তুলেছে, মিথ্যা টেরোরিষ্ট তুহমত দিয়ে।

৪। আপোস করার মাধ্যমে তাওয়াল্লী।

কুফফারদের মত যারা গনতন্ত্রকে তাদের শাসন ব্যবস্থা করে নিয়েছে অথবা তাদের মত সংসদ তৈরী করেছে, আইন প্রণয়নের জন্য আইন কমিটি, যা কুফফারদের কাজের অনুরূপ- তারা কুফফারদের সাথে তাওয়াল্লী করে নিয়েছে। এই চার প্রকার ওয়ালায়াত বা তাওয়াল্লী হচ্ছে স্বয়ং কুফরী যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

মুওয়ালাত (যা তাওয়াল্লী থেকে ব্যাপক-বিস্তৃত) এর দুই প্রকার-

১। এই মুওয়ালাত যাকে তাওয়াল্লী বলা হয়, যা আমরা পূর্বে তাওয়াল্লী এর ব্যাপারে বর্ননা করেছি, একে মুওয়ালাত কুবরা (বড় মুওয়ালাত), الموالاة العظمي আল উজমা (প্রধান মুওয়ালাত), আল আম্মা (সাধারন মুওয়ালাত), আল মুতলাক্বাহ (পরম মুওয়ালাত) বলে ও ডাকা হয়, এই সব অর্থ তাওয়াল্লী এর অর্থের অনুরূপ।

২। ছোট বা সীমিত মুওয়ালাত।

এর মধ্যে রয়েছে ঐসব কিছু যাতে কুফফারদের মর্যাদা দেয়া হয়, সম্মান করা হয়, অথবা সমাবেশে অগ্রে স্থান দেয়া, মুসলিমের বদলে তাদেরকে কাজে নিযুক্ত করা ইত্যাদিকে বুঝায়। এটি অবাধ্যতা এবং কবিরাহ গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ সুবঃ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

“হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের প্রতি অনুভূতি দেখিয়ে..” (সূরা, মুমতাহিনা ৬০ঃ১)

আল্লাহ ‘অনুভূতি দেখানো’ কে মুওয়ালাত বলেছেন, তিনি একে কুফরী বলে আখ্যা দেন নি, কারণ তিনি এখানে তাদেরকে ‘হে মু’মিনগন’ বলে ডেকেছেন। (আল হাদ্দ আল ফা’সিল আল বায়ান আল মুওয়ালাত ওয়া তাওয়াল্লী আল কুফফার)

❖ প্রশ্ন-৭। কাফেরদের সাথে মুয়ামালাত বা আচার-ব্যবহার কয় প্রকার?

উত্তরঃ- শাইখ নাসির ইবনে ফাহাদ বলেন, সুতরাং কুফফারদের সাথে মুওয়ামেলাত বা আচার-ব্যবহার তিন প্রকারঃ

১। প্রথম প্রকারঃ যে ধরনের আচার-ব্যবহার কুফরী রয়েছে যা ইসলামের বাইরে নিয়ে যায়।

কিছু উলামাগন একে 'তাওয়াল্লী' বলেছেন। সুতরাং প্রত্যেক প্রকারের মেলামেশা যার দালীল রয়েছে যে এটি কুফরী এবং দ্বীনত্যাগ- তাহলে এটি এই প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। যেমন, কাফেরদের দ্বীনকে ভালবাসা, তাদেরকে ইসলামের উপর বিজয়ী দেখতে আশা করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা ইত্যাদি।

২। **দ্বিতীয় প্রকারঃ** মেলামেশা যা হারাম, কিন্তু কুফরী নয়।
এবং কিছু উলামাগন একে 'মুওয়ালাত' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক প্রকারের মেলামেশা যার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে দালীল রয়েছে, কিন্তু এই হারাম কুফরী পর্যায়ের নয়, তা এই প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। যেমন, তাদেরকে সমাবেশে সামনে স্থান দেয়া, তাদেরকে প্রথমে সালাম দেয়া এবং তাদের সাথে এমন অনুভূতি দেখানো যা তাওয়াল্লী পর্যায়ে পৌছে না ইত্যাদি।

৩। **তৃতীয় প্রকারঃ** মেলামেশা যা জায়িজ।
এটি মুওয়ালাতের অন্তর্ভূক্ত নয়, এবং এর জায়েয হওয়ার ব্যাপারে দালীল রয়েছে, যেমন যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি তাদের সাথে ন্যায়পরায়ন হওয়া, কাফের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা ইত্যাদি। (আত তিবয়ান ফি কুফরি মান আ'নাল আমরিকান, পৃ ৪১-৪২)

❖ প্রশ্ন-৮। কাফেরদের সাথে ব্যবসা ও ভ্রমন করার ব্যাপারে বিধান কি?
উত্তরঃ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, সুতরাং একজন (মুসলিম) ব্যক্তির তাদের থেকে পশুখাদ্য এবং ঘোড়া কেনা বৈধ যেমন অন্যদের থেকে কেনা বৈধ....এবং তাদের কাছে খাদ্য, বস্ত্র এবং এই ধরনের জিনিস বিক্রি করা বৈধ। কিন্তু এমন জিনিস বিক্রি করা যা তাদেরকে হারাম কাজে সহায়তা করবে, যেমন ঘোড়া এবং অস্ত্র যা তারা যুদ্ধ এবং অন্যান্য হারাম কাজে ব্যবহার করবে- তাহলে তা অবৈধ। (আস সিয়াসাহ আশ শারীয়াহ-১৫৫)
ইবনু হাজার আস্কালানী (রহ) সালফে-সালেহীনগনের মত বর্ননা করেন, "মুশরিকদের সাথে কেনা-বেচা বৈধ, তা ব্যতীত যা বিক্রি করলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে।" (ফাতহুল বারী, ৪/৪১০)
এবং কাফেরদের সাথে বেচা-কেনার কয়েকটি শর্ত রয়েছে,

১. কেনা-বেচা হতে হবে হালাল জিনিসে।
২. এমন কোন জিনিস নয় যা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে।
৩. ঐ কেনা বেচায় কোন জিনিস থাকতে পারবে না যা মুসলিমের সম্মানহানী করে। (ফাতহুল বারী, ৪/৪৫২)

ইবনু হাজার আস্কালানী (রহ) সালফে-সালেহীনগনের মত বর্ননা করেন, "তখনই কুফফারদের কাছে ভ্রমন করা বৈধ যখন এই আশা করা হয় যে, সম্ভবত তারা ইসলামের ডাকে সাড়া দিবে। কিন্তু যদি এই আশা না থাকে , তাহলে তাদের কাছে ভ্রমন কর বৈধ নয়। (ফাতহুল বারী, ১০/১১৯)
অত:পর তিনি আরও বলেন, "তাহলে যা প্রকাশ্য দেখা যাচ্ছে তা হল কুফফারদের কাছে ভ্রমন করার বিষয়টি নিয়্যাত এবং এ থেকে কি উপকার হবে তার উপর নির্ভর করে।" সুতরাং এটি সর্বদা হারাম নয়, আবার সর্বদা বৈধও নয়, এটি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

❖ প্রশ্ন-৫। তাগুতের ইবাদতকারী কাফির-মুশরিকদের সাথে আমাদের আচরণনীতি কি?

উত্তরঃ- যারা আল্লাহর পাশাপাশি তাগুতের ইবাদত করে তারা মুশরিক এবং কাফের, তাদের বেলায় আল বারা (শত্রুতা, ঘৃনা, বিদ্বেষ) প্রযোজ্য। তাদের সাথে একজন ঈমানদারের আচরণ হবে নিম্নরূপ-

১। **তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করা যাবে নাঃ** আল্লাহ (সুব:) বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا [النساء/١٤٤]

"হে ঈমানদারগন! মু'মিনদের পরিবর্তে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমান দিতে চাও?" (সূরা নিসা ৪ঃ১৪৪)

২। **তাদের শাসন কর্তৃত্ব মেনে নেয়া যাবে নাঃ** আল্লাহ (সুব:) বলেনঃ

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء/١٤١]

"আল্লাহ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের কোন পথ রাখবেন না।" (নিসা ৪ঃ ১৪১)

{وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا}

"আর তুমি কাফের এবং মুনাফিকদের কথা মানবে না " (আল আহযাব ৩৩ঃ৪৮)

৩। **তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহন করা যাবে না, তাদের আনুগত্য করা যাবে না যদিও তারা পিতা কিংবা ভাই হয়ঃ** আল্লাহ (সুব:) বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [التوبة/٢٣]

-হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।” (সূরা তাওবা ৯ঃ২৩)

৪। **তারা ত্বাগুত প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত তাদের নিকট থেকে কোন নুসরাহ** (দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার ও রক্ষা করার জন্য বস্তুগত সর্মথন) **চাওয়া যাবে না**ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

.... فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ (صحيح مسلم: ٤٨٠٣)

‘‘.... আমি একজন মুশরিক এর কাছে কখনই সাহায্য চাইবো না’’ (মুসলিম) তাদের থেকে নুসরাহ নেয়া যাবে না এ জন্য যে যাদের কাছে নুসরাহ চাওয়া হয় তাদের সাথে উইলিয়া (বন্ধুত্বের) সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, আর মু’মিনদের সাথে কাফেরদের কখনই বন্ধুত্ব হতে পারে না।

৫। **মুসলিমরা তাদের নারীদের বিয়ে করতে পারবে নাঃ**

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেনঃ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة/٢٢١]

“তোমরা মুশরিক মেয়েদেরকে কখনো বিয়ে করবে না, যতক্ষন না তারা ঈমান না আনিবে। বস্তুত একজন মু’মিন কৃতদাসী নারী, একজন মুশরিক শরীফজাদি নারী অপেক্ষাও উত্তম, যদিও সে তোমাদের মোহিত করে। (আল বাক্বারা:২২১)

৬। **মুসলিম নারীদেরকেও তাদের সাথে বিয়ে দেওয়া যাবে নাঃ**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“আর তোমাদের নিজেদের কন্যাদিগকেও মুশরিক পুরুষদের সহিত বিবাহ দিবে না, যতক্ষন না পর্যন্ত তারা ঈমান আনিবে। কেননা একজন ঈমানদার কৃতদাস একজন উচ্চবংশীয় মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও প্রথমত লোকটিকে তারা অধিক পছন্দ করিয়া থাকে। কেননা তাহারা তোমাদিগকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া নেয়। আর আল্লাহ তাহার নিজের অনুমতিক্রমে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান জানান।” (আল বাক্বারা ২ঃ ২২১)

৭। মুসলিমরা তাদের উত্তরাধিকারী হতে পারেনা, তারা মুসলিমদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে নাঃ

উসামা বিন যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন,)

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"একজন মুসলিম একজন কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না অথবা একজন কাফির একজন মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না।" (বুখারী, মুসলিম)

৮। মুসলিমরা মুশরিকদের জবাই করা গোশত খেতে পারে না

৯। মুসলিমরা তাদের পিছনে সলাত আদায় করতে পারে না,

আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ

والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم

তোমাদের উপর প্রত্যেক মুসলিমের পিছনে নামায আদায় বাধ্যতামুলক করা হয়েছে।" (আবু দাউদ)

১০। তারা মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া যাবে নাঃ

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) মুনাফিকদের সর্ম্পকে বলেন,

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ [التوبة/٨٤]

"আর তাদের কোন লোক মারা গেলে তাদের জানাযা তুমি কখনও পড়বে না, তার কবরের পাশে কখনও দাড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অবিশ্বাস করেছে। আর তারা মরেছে এমন অবস্থায় যে তারা ফাসেক ছিল।" (আত তাওবা ৯ আয়াত ৮৪)

১১। মুশরিকরা যখন মারা যায় তখন মুসলিমরা তাদের জন্য ক্ষমা চাইতে পারবেনা ঃ আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة/١١٣]

"নবী ও ঈমানদারদের পক্ষে শোভা পায়না যে তাহারা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে, তাহারা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন; যখন তাহাদের সামনে একথা উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহারা জাহান্নামে যাবারই উপযুক্ত।" (আত তাওবা আয়াত ১১৩)

১২। তাদের কে মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা যাবেনা

১৩। তারা মক্কায় হারাম শরীফে প্রবেশ করতে পারবে না.

আল্লাহ (সুবাহানা ওয়া তায়ালা) বলেন,

آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

"হে ঈমানদার ব্যক্তিগন মুশরিক লোকেরা নাপাক। অতএব এই বৎসরের পর যেন তারা মসজিদে হারামের পাশেও না আসতে পারে।" (আত তাওবা ঃ ২৮)

১৪। ভাতৃত্বের অধিকার ও কর্তব্য তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়ঃ

আল্লাহ (সুবাহানা ওয়া তায়ালা) বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [الحجرات/١٠]

"নিশ্চই শুধুমাত্র মুমিনরা পরস্পরের ভাই।" (আল হুজরাত ৪৯ঃ ১০)

১৫। তাদের হত্যার জন্য কিসাস নিতে একজন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে নাঃ বর্ণিত আছে যে, আলী (রাঃ) বলেছেন,

"সকল ঈমানদারদের রক্ত সমান, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নীচতম ব্যক্তি তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে এবং তারা অন্যান্যদের বিরুদ্ধে এক হাত। একজন মুমিনকে একজন কাফিরের জন্য হত্যা উচিত নয়, অথবা কেউ চুক্তিবদ্ধ থাকলে তার চুক্তি জারি থাকা পর্যন্ত তাকে হত্যা করা যাবে না।" (আহমদ, আবু দাউদ, নাসাই ওয়াল হাকিমের গ্রেড সহীহ যেমন ইবনে হাজার আসকালানি, -----আদিল্লাতুল আহকাম বর্ননা করেছেন), (কিতাবুল জিলাইয়াত নম্বর ৯৯৮)

১৬। তাদের ঐসব মজলিশে যোগদান করা যাবে না যেখানে দ্বীন ইসলামের কোন বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করে,

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেনঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا [النساء/١٤٠]

আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা' আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন (সূরা নিসা ৪ঃ১৪০)

❖ প্রশ্ন-১০। কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন প্রমাণ করে এমন নিদর্শনগুলো কি কি, যা থেকে অবশ্যই দূরে থাকা কর্তব্য?

উত্তরঃ- কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন প্রমাণ করে যা থেকে ঈমানদারদের অবশ্যই দূরে থাকা কর্তব্য এমন ২০টি নিদর্শন হচ্ছে-

১. কাফিরদের উপর সন্তুষ্ট থাকাঃ

কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার প্রথম ধরণটি হল কাফিরদের উপর সন্তুষ্ট থাকা বা তাদের কুফরি কর্মে রাজি-খুশি থাকা–এমনকি তাদের স্বীকৃত কুফরি কর্মকে প্রত্যাখানের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া বা সন্দেহ পোষণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ (সুব) বলেন:

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ [المائدة/٨١]

" যদি তারা আল্লাহ্র প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।" (সূরা, মায়িদাহ ৫: ৮১)

২. কাফিরদের উপর নির্ভরতাঃ

কোন ধরণের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার জন্য কিংবা নিরাপত্তার খাতিরে কাফিরদের উপর নির্ভর করাও কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার পরিচয় বহন করে । এটি কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার দ্বিতীয় নির্দশন। আল্লাহ্ (সুব) এই বলে এ সম্পর্কে নিষেধ করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة/٥١]"

হে মুমিনগণ ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না"। (সূরা, মায়িদাহ ৫:৫১)

৩. কুফরির কোন বিষয়ে একমত পোষণঃ

কুফরি কোন বিষয়ের সঙ্গে একমত পোষণ করার অর্থ হল আল্লাহর বক্তব্যের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য মেনে নেয়া।

তাদের বিশ্বাসহীনতা সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুব) বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سَبِيلًا [النساء/٥١]

"আপনি কি তাদের দেখেননি যাদের কিতাবের একাংশ দেয়া হয়েছিল; তারা জিব্‌ত ও তাগুতে বিশ্বাস করে ? এরা কাফিরদের সম্পর্কে বলে, এদের পথ মুমিনদের পথ অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর"। (৪:৫১)

মুসলিম উম্মাহর মধ্য থেকে যে বা যারাই কাফিরদের সঙ্গে যোগ দিবে এবং তাদের অপকর্মের সঙ্গী হবে সে-ই মুনাফিকির কারণে নিজের জন্য ডেকে আনবে দুঃসহ যন্ত্রণা ও আযাব। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ এই উম্মাহর সন্তানদের অবস্থা ঐ তোতাপাখিগুলির মতো যারা কিছু না বুঝেই বুলি আওড়ায়, 'আমি কমিউনিজম কে একটি দর্শন হিসেবে বিশ্বাস করি', কিংবা ' আমি সোশালিজমে বিশ্বাসী' কিংবা বলে , 'গণতন্ত্র একটি সুন্দর রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সংবিধান সেক্যুলার হওয়া উচিত।' কাফিররা কুফরের এই মূলনীতিগুলো মুসলমানদের আবাসভূমিতে বাস্তবায়নের এজেন্ডা নিয়েছে: এবং, এই লক্ষ্যে জনগণকে এরা এ সমস্ত শয়তানি বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আল্লাহ্ (সুব) বলেন :

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ [البقرة/١٢٠]

"ইহুদী এবং খৃষ্টানরা কখনোই আপনার ওপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন"। (২:১২০)

৪. কাফিরদের সান্নিধ্যের অন্বেষণঃ

কাফিরদের মমতা-ভালবাসা পাওয়ার চেষ্টা করার অর্থ হল তাদের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কযুক্ত করা। আল্লাহ্ (সুব) এ রকম কাজে নিষেধ করেন, আল্লাহ্ (সুব) বলেন:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ [المجادلة/٢٢]

"আপনি এমন কোন সম্প্রদায়কে খুঁজে পাবেন না, যে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের ভয় করে অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, হোক সে তার পিতা, পুত্র, ভ্রাতা কিংবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র।" (সূরা, মুজাদালাহ ৫৮:২২)

ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'আল্লাহ্ আমাদের সুস্পষ্ট জানিয়েছেন, কোন ঈমানদারই আল্লাহ্ ও রাসূলকে চ্যালেঞ্জকারীদের আনুকূল্য প্রত্যাশী হয় না। দুটি বিপরীত ধর্মী জিনিষ যেমন একে অপরকে তাড়িত করে, মুমিনের ঈমানও তদ্রূপ মুমিনকে এরূপ কাজ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং, ঈমান থাকা অবস্থায় আল্লাহর শত্রুদের প্রতি অনুকুল মনোভাব পোষন অসম্ভব। যদি কেউ অনুভব করেন যে তার ভিতর

এই মনোভাবের ঘাটতি রয়েছে , তাহলে বুঝতে হবে যে, তার ঈমানে গলদ রয়েছে।' আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ [الممتحنة/١]

"হে মুমিনগণ ! তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি মমতা পোষণ করছো, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে" । (সূরা, মুমতাহিনা ৬০:১)

৫. কাফিরদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশঃ কাফিরদের সঙ্গে কেউ একাত্মতা প্রকাশ করলে সন্দেহাতীতভাবে সে কাফিরদের মিত্রে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন : "যারা ভ্রষ্টতা করে তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করোনা, অন্যথায় অগ্নি তোমাদের স্পর্শ করবে, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোনই রক্ষক নেই, এবং তোমরা সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না" ।

আল কুরতুবি বলেন, 'কোন কিছুর প্রতি একাত্মতা প্রকাশের অর্থ হল তার ওপর নির্ভর করা এবং সমর্থনের জন্য তার দারস্থ হওয়া এবং এভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরী করা যা তোমাকে তুষ্টি দেয়।' কাতাদাহ্ বলেন, 'এই আয়াতের অর্থ হল, কোন মুসলিমের পক্ষেই কাফিরদের পছন্দ করা কিংবা তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করা সঙ্গত নয়।' একজন কাফিরের বন্ধু কাফির, এবং একজন মুরতাদ বা অবাধ্যের বন্ধু আরেকজন অবাধ্য। আল্লাহ্ (সুব:) নবীকে (সঃ) উদ্দেশ্য করে বলেন :

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٧٤) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا [الإسراء/٧٤، ٧٥]

"আমি আপনাকে অবিচলিত না রাখলে আপনি তাদের দিকে ঝুকেই পড়তেন প্রায়; আর তা হলে অবশ্যই আমি আপনাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ এবং পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম; তখন আমার বিরূদ্ধে আপনি কোন সাহায্যকারী পেতেন না"। (১৭ : ৭৪-৭৫)

আমাদের এটি মনে রাখতে হবে যে, এভাবে সৃষ্টির সেরা নবীকে (সঃ) যে রকম ধমকের সুরে আল্লাহ্ (সুব) এ ব্যাপারে সম্বোধন করেছেন, সেক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা কিরকম হতে পারে। *(মুজমুআত তাওহীদ)*

৬. কাফিরদের কুফরি বিশ্বাসের প্রশংসা- প্রশস্তিঃ

কাফিরদের কুফরি বিশ্বাসের প্রশংসা- প্রশস্তি করার মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়।

আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ([القلم/٩]

"তারা ইচ্ছা পোষণ করে যে, আপনি তাদের সঙ্গে এক ধরণের সমঝোতায় (ধর্মীয় বিষয়ে সৌজন্যতা সহকারে) আসেন, সুতরাং তারাও আপনার সঙ্গে সমঝোতা করবে"। (সূরা, ক্বলাম ৬৮ : ৯)

৭. কাফিরদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করাঃ

কাফিরদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা তাদের সাথে মৈত্রী বন্ধনের নিদর্শক। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ [آل عمران/١١٨]

"হে মুমিনগণ ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না ; যা তোমাদের বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে । তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর । তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর ।" (৩ঃ১১৮)

এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল মুসলিমদের সেই দল সম্পর্কে যারা মুনাফিক এবং ইয়াহুদিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় রাখত, কেননা সে সময়ে তারা (মুনাফিক ও ইয়াহুদি) তাদের (মুসলিমদের) প্রতিবেশী ও বন্ধু ছিল । আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করে মুসলিমদের কাফির-মোনাফিকদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করলেন। আবু দাউদে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলেন, "একজন ব্যক্তির দ্বীন তার সহচর বন্ধুদের মতই হয়ে থাকে, সুতারাং তোমাদের যে কেউ যেন সতর্ক হয় কাকে সে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে।"

৮. কাফিরদের অনুগত হওয়াঃ

কাফিরদের ইচ্ছা-আকাঙ্খার আনুগত্য তাদের সঙ্গে মৈত্রীর আরেকটি নিদর্শন। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন ঃ-

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا [الكهف/٢٨]

"তুমি তার আনুগত্য করো না – যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি। যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এবং যার কার্যক্রম হারিয়ে গেছে।"(১৮ঃ২৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ([آل عمران/١٤٩]

"হে মু'মিনগণ ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।" (৩ঃ১৪৯)
আল্লাহ (সুবঃ) আরও বলেনঃ

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

"নিশ্চয়ই শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।"(৬ঃ১২১)

ইবনে কাছির এই সর্বশেষ আয়াত সম্পর্কে বলেন,যখন অন্যদের কথা মত আল্লাহ এবং তাঁর শরীয়াকে তাদের বক্তব্যের সমপর্যায়ে নিয়ে আসা হয় তখনই তা শির্ক হয়ে যায়। এটি এই আয়াতেও প্রতিয়মান হয়,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ [التوبة/٣١]

"তারা (ইহুদী ও খৃষ্টানরা) তাদের আলেম ও সন্নাসীদের আল্লাহর পাশে তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে" (সূরা, তাওবাহ ৯ঃ৩১)

৯. কুরআন তাচ্ছিল্যকারীদের সঙ্গে একত্রে বসাঃ

কাফিরদের সঙ্গে বসলে যখন তারা কুরআনকে তাচ্ছিল্য করে তখন তাদেরই দলভুক্ত হতে হয়। আল্লাহ আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন।
আল্লাহ (সুবঃ) বলেন ঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا [النساء/١٤٠]

"কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হবে তোমরা তাদের সাথে বস না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। মুনাফিক এবং কাফিরদের তো আল্লাহ জাহান্নামে একত্র করবেন।" (৪:১৪০)

ইবনে জারীর আত তাবারী ব্যাখ্যা করেন যে, এর অর্থ হল এই যে, যদি আপনি তাদের এ কাজ করতে দেখেন এবং এ সম্পর্কে কিছুই না বলেন, তখন এটি

সুস্পষ্ট হয় যে , আপনার আনুগত্য তাদের জন্য যা আপনাকে তাদের মত করে দেয়। তিনি আরো বলেন,এই আয়াতের মাধ্যমে মুসলিমদের প্রতি পরিষ্কার ভাবে কাফিরদের ধর্মদ্রোহী যাবতীয় কর্মকান্ডে বসার ব্যপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নবী (সাঃ) বলেন,

"যারা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত তাদের বাড়ী যেও না, অন্যথায় তোমরা অনুরূপ দুর্ভাগ্যের জন্য ক্রন্দন করবে, নতুবা তা(দুর্ভাগ্য) তাদের কাছে যেভাবে এসেছে তোমাদের কাছেও অনুরূপভাবে আসবে।"(বুখারী)

১০. মুসলিমদের উপর কাফিরদের কর্তৃত্ব প্রদানঃ

মুসলিমদের উপর কাফিরদের কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে মুসলিমদের কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হতে বাধ্য করা হয় । কেননা কর্তৃত্বশীল কাফিরদের প্রতি আনুগত্যের কারনে তাদের কুফরী কর্মকান্ডের বিরোধিতা করা মুসলিমদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর তাদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার অর্থ হল তাদের পদ মর্যাদার প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যা ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে কোন ক্রমেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আল্লাহ বলেনঃ

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء/١٤١]

"এবং কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।" (৪ঃ১৪১)

১১. কাফিরদের উপর বিশ্বাস স্থাপনঃ কাফিরদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ হল তাদেরকে নিজেদের মিত্র বা বন্ধু মনে করা।

১২. কাফিরদের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করাঃ কাফিরদের কার্যক্রমের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা, তাদের পোষাকের অনুসরণ কিংবা তাদের লেবাস ও ফ্যাশনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেদের লেবাসের ষ্টাইল পরিবর্তন করা–এই জিনিসগুলি তাদের সঙ্গে মিত্রতার বিষয়টিকে পরিষ্কার করে। (মাজমুআত তাওহীদ)

১৩. কাফিরদের কাছে টানাঃ কাফিরদের সাহচর্যে আনন্দ অনুভব করা, তাদের কাছে নিজেদের অন্তর্নিহিত অনুভূতি ব্যক্ত করা, তাদেরকে কাছে টানা এবং তাদের সম্মান করা তাদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনেরই পরিচয় বহন করে। (*মুজমুআত তাওহীদ*)

১৪. কাফিরদের ভ্রষ্টতার কাজে কোন কিছু দিয়ে সহযোগিতা করা

তাদের ভ্রষ্টতায় সাহায্য করা কিংবা সাহায্য যুগিয়ে তাদের উৎসাহিত করার অর্থ হল নিজেকে তাদের মিত্রে পরিণত করা। কুরআন দুটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছে, একটি হল লূত (আঃ) এর স্ত্রী সংক্রান্ত এবং অপরটি

নূহ্ (আঃ) এর স্ত্রী সম্পর্কিত। লূত (আঃ) এর স্ত্রী তার শহরের লোকদের লূত (আঃ) এর বিরুদ্ধে সমর্থন যুগিয়েছিল এবং লূত (আঃ) এর লোকদের দুর্দশায় উৎফুল্ল হয়েছিল; এমনকি লূত (আঃ) এর অতিথিদের সম্পর্কে গোপনীয় তথ্য সরবরাহ করেছিল। অনুরূপ ঘটনা নূহ্ (আঃ) এর স্ত্রীর ক্ষেত্রেও সংঘটিত হয়েছিল। (তাফসীর ইবনে কাছীর)

১৫. কাফিরদের উপদেশ-পরামর্শ চাওয়াঃ

এর স্বরূপ হচ্ছে, কাফিরদের উপদেশ পরামর্শ শ্রবণ করা, তাদের উচ্চ আসনে আসীন করা কিংবা তাদের বন্দনা করা (মুজমু'আত তাওহীদ)

১৬. কাফিরদের সম্মান করাঃ

কাফিরদের বেশি বেশি সম্মানিত করা এবং নির্বোধের মত বিশাল বিশাল টাইটেলে ভূষিত করা তাদের প্রতি মিত্রতা প্রর্দশনেরই নামান্তর। আমরা লক্ষ্য করি, কিছু লোক তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশের ভঙ্গি হিসাবে তাদের সঙ্গে দেখা করার সময় তাদের সিনায় হাত রাখে; কেউবা আনুগত্যের নমুনা স্বরপ তাদের মাথার হ্যাট নামিয়ে রাখে (হামুদ আত তাবিজরি) আল্লাহ (সুবঃ) বলেন-

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا [النساء/١٣٩]

"যারা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদের আউলিয়া (রক্ষাকারী, সাহায্যকারী, বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করবে, তারা কি তাদের কাছে ইজ্জাত অন্বেষণ করে ? নিঃসন্দেহে সকল ইজ্জাত আল্লাহরই"। (৪:১৩৯)

প্রকৃতপক্ষে এই কাফিররা মুসলিমদের থেকে যা প্রাপ্য তা হল ভয়াবহ সমালোচনা এবং তাচ্ছিল্য। এটা বর্ণিত আছে যে, নবী (সাঃ) আমাদেরকে তাদের সংবর্ধিত করার উদ্যোগ নিতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِى طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ

"তোমরা তাদের সালাম দিয়ো না (ইহুদী ও খৃষ্টানদের) এবং যখন তোমরা তাদের সঙ্গে রাস্তায় সাক্ষাৎ কর, তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে যেতে বাধ্য কর । (মুসলিম ৫৭৮৯)

১৭. কাফিরদের সঙ্গে বসবাস করাঃ

কাফিরদের আবাসস্থলকে বসবাসের জন্য সাব্যস্ত করা এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটানোও তাদের মিত্রে পরিণত হওয়ার শামিল। নবী (সঃ) বলেন,

مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ“

যে-ই কাফিরদের সাথে যোগ দেয় এবং তাদের মাঝে বসবাস করে সে তাদেরই একজন।” (আবু দাউদ) এবং অন্য হাদীসে

عن سمرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا

“কাফিরদের সঙ্গে বসবাস করনা কিংবা তাদের সঙ্গে যোগ দিও না : যে-ই তাদের সঙ্গে বসবাস করে কিংবা তাদের মাঝে বাস করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।” (আল-হাকিম)

১৮. কাফিরদের সঙ্গে জোগসাজস করাঃ

কাফিরদের সঙ্গে জোগসাজস করা, তাদেরকে বিভিন্ন স্কীমে সাহায্য করা, তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, তাদের পক্ষ হয়ে গোয়েন্দাগিরি করা, মুসলিমদের সম্পর্কে তাদের তথ্য দেয়া কিংবা তাদের কোন পদে অধিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করা এগুলো সবই তাদের মিত্রদের কাজ। বর্তমান মুসলিম বিশ্ব এখন সব থেকে নিকৃষ্ট যে অসুখে ভুগছে এটি সেগুলোর অন্যতম। এটি পুরো প্রজন্মকে নষ্ট করেছে, এবং শিক্ষা থেকে শুরু করে রাজনীতিসহ সরকারের সকল পর্যায়কে কলুষিত করেছে। মিশরে ইংরেজ দখলদারির শেষে মুহাম্মদ কুতুব বলেছিলেন, “ সাদা ইংরেজরা চলে গেছে কিন্তু বাদামী ইংরেজরা এখনো আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান। ”

১৯. মুসলিমদের ঘৃণা এবং কাফিরদের ভালবাসাঃ

যারা ইসলামের পবিত্রভূমি থেকে কাফিরদের ভুমিতে পলায়ন করে, তাদের চিন্তাধারা-ধ্যানধারণার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে, তারা মূলতঃ তাদেরই বন্ধু যাদের কাছে তারা গিয়েছে। (আর রিদ্দাহ বাইনা আল-আমস ওয়াল ইয়াওম)

২০. কাফিরদের মতাদর্শকে সমর্থন করাঃ

যারা সেক্যুলার রাজনীতি, কমিউনিজম, সোশালিজম, জাতীয়তাবাদ,ইত্যাদি মতাদর্শের পিছে দৌড়ায় এবং এই মতাদর্শগুলোর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে, তারাও মূলতঃ তাদেরই বন্ধু যাদের শরণাপন্ন তারা হয়েছে। (আর রিদ্দাহ বাইনা আল-আমস ওয়াল ইয়াওম)

কাফেরদের অনুকরণ

❖ প্রশ্ন-১। কতক্ষন একজন ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলতে পারে না?

উত্তরঃ কেউ বলতে পারে না যে, সে মুসলিম যতক্ষন না সে শত্রুতা ঘোষনা করে তাদের বিরদ্ধে যারা ইসলাম ঘৃণা করে, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যারা আল্লাহ্ (সুবঃ) এবং নবী (সাঃ)-কে ঘৃণা করে আর ঘৃণা করে মুসলিমদের। এটি আমার কথা নয়। এটি কোন ইমাম, শায়খ কিংবা জ্ঞানীর কথা নয়। এটি পৃথিবীর কোন ব্যক্তির কথাও নয়। এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কথা-

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

[المجادلة/٢٢]

যারা আল্লাহ্র ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে আপনি এমন লোকের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না; যারা আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে। যদিও তারা তাদের পিতা অথবা তাদের পুত্র অথবা তাদের ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠি হোক না কেন। [সূরা মুজাদিলা (৫৮ঃ২২)]

আল্লাহ্ (সুবঃ) আমাদের বলছেন যে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল(সঃ)-কে ভালবাসে তাদের মাঝে আমরা এমন কাউকে পাবনা যারা দয়া, সহানুভূতি,ভালবাসা,ক্ষমা প্রদর্শন করে এমন কাউকে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে যদিও সে তার বাবা, সন্তান ,ভাই অথবা ঘনিষ্ট আত্নীয় হয়।

❖ প্রশ্ন-২। কাফেরদের অনুকরন এর ব্যাপারে আমাদের প্রতি কিরূপ সতর্কতা রয়েছে?

উত্তরঃ- আল্লাহ্ (সুবঃ) তা'আলা আমাদের কাফেরদের কর্মপন্থার অনুসরণ, অনুকরণ ও সাদৃশ্য করতে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। মোহাম্মদ (সাঃ) এটিকে কেয়ামতের একটি ছোট চিহ্ন বলে চিহ্নিত করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ননা করেছেন , নবী (সাঃ) বলেছেন ,

لتسلكن سبل من قبلكم حذو النعل بالنعل ، ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا فشبر ، فإن ذراعا فذراع الي اخر الحديث

"ততদিন কেয়ামত আসবে না যতদিন আমার উম্মত পূর্ববর্তী জাতির কাজগুলো করবে এবং তাদের অনুসরণ করবে বিঘত বিঘত করে, গজ গজ করে (ইঞ্চি ইঞ্চি করে)।" তাকে বলা হল, "হে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ)! আপনি কি পারসীয় ও রোমানদের কথা বলছেন?" নবী (সাঃ) বললেন, " তারা ছাড়া আর কেইবা হতে পারে?" (বুখারী)

একারণেই প্রত্যেক সালাতের প্রত্যেক রাকাতে আমরা একটি অতি গুরুত্ব পূর্ণ দোয়া করি ; فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال আদি বিন হাতিম (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সাঃ) কে আল্লাহ্‌র এই আয়াত "*গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম*" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বললেন,"*এরা হল ইহুদী*" আর "ওলাদ্দো আল্লীন," তিনি উত্তরে বললেন,"*এরা হল খ্রীষ্টান আর তারা হল পথভ্রষ্ট।*" (তিরমিজি , আবু দাউদ)

আমরা প্রত্যেক সালাতে একথা বলছি অথচ এই আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিকরূপে কাফেরদের অনুকরণ, অনুসরণ ও ইহুদী খ্রীষ্টানদের জীবন প্রনালী অনুযায়ী জীবন যাপন করছি। কাফেরদের অনুকরণ করা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের থেকে দূরে থাকার আল্লাহ্‌র এই আদেশের কারণ খুবই পরিস্কার। কারণ যদি আমরা তাদেরকে বাহ্যিক ভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করি তাহলে সময়ের সাথে সাথে আমরা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা শুরু করব। পরিণামে আমরা তাদের কুফর ও শিরকের অনুসরণ করব। আল্লাহ্‌ (সুবঃ) এ সম্পর্কে আমাদের পরিস্কারভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন । আমাদের সে সকল সতর্ক বাণীর দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة/٥١]

"হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা মায়িদা (৫ঃ৫১)]

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

"মু'মিনগন যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না ...। " [সূরা আল ইমরান (৩ঃ২৮)]

এবং আমাদের সামনে রয়েছে নবীদের পিতা আল্লাহ্‌র খলিল ইব্রাহিম (আঃ) এর সর্বোত্তম উদাহরণ ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ [الممتحنة/٤]

"তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে... ।" [সূরা মুমতাহিনা (৬০ঃ৪)]

সূতরাং আমরা এই আয়াত থেকে শিখলাম যে, যাকে আল্লাহ্ উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা হল, আমরা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব, তাদের অনুকরণ, অনুসরণ ও তাদেরকে ভালবাসতে পারব না । আসুন আমরা ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করি! আসুন আমরা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ভাবেই মুসলিম হই! আমাদের খাওয়া, হাটা, ঘুম, কথা-বার্তা, পোষাক, মৃত্যু সবই হোক মুসলিমের মত। আল্লাহ্‌র রহমতে আমরা মুসলিম। আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা কাফের নই। সুতরাং আসুন আমরা তাদেরকে অনুকরণ করা থেকে বিরত হই!

❖ প্রশ্ন-৩। কাফেরদের অনুকরনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্বেও মুসলিমদের বাস্তব অবস্থা কি আজকাল?

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র শপথ! তথাকথিত সভ্য সমাজে বসবাসরত মুসলিমরদের বিশ্বাস এত দূর্বল হয়ে পড়েছে যে, তারা এমন আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পরেছে যা একজন বিশ্বাসী মুসলিমের আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তার প্রতি বিদ্বেষমূলক । এটি মুসলিমদের জন্য ভয়াবহ একটি দূর্যোগ। কাফেরদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন, তাদের আচরণে ও রীতি-নীতির অনুকরণ ইসলামের শিক্ষার লঙ্ঘন ।

আমরা আজকে প্রত্যক্ষ করছি যে, সারা পৃথিবীতে বিপরীতে কাজ হচ্ছে। মুসলিমরা আজ কাফেরদের সাথে বসবাস করতে এত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে যে তারা সে সকল বৈশিষ্ট সম্পর্কে আর মোটেই সচেতন নেই যা মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে পার্থক্য তৈরী করে। অনেক মুসলিমই আজ শত্রুদের

ফাঁদে পা দিয়েছে। তাদের মাঝে কেউ কেউ আবার তাদের কুফরীকেও গ্রহণ করেছে। কত নামধারী মুসলিম আছে যারা মানবরচিত আইন মেনে নিচ্ছে ও এর মাধ্যমে বিচার ফয়সালা চাচ্ছে, অথচ আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়নের কোন ইচ্ছাই প্রকাশ করছে না? কত তথাকথিত মুসলিম দেশ কাফেরদের সাহায্য করছে সচেতন মুসলিমদের বিরুদ্ধে যারা নিজেদের বাঁচাতে সংগ্রাম করছে? কত নামধারী মুসলিম কাফেরদের সেনাবাহিনীতে গোলামী করছে?

কত মুসলিম কাফেরদের পোশাক, তাদের আচর-আচরণ নকল করছে? অনেক পুরুষই সোনার মালা, কানে দুল আর ব্রেসলেট ব্যবহার করছে অথচ গর্বের সাথে বলছে যে তারা মুসলিম? (মুসলিম পুরূষদের জন্য সোনার কিছু পরিধান করা হারাম)। কতক নামধারী মুসলিম রয়েছে যারা নবী (সাঃ)-এর আদেশের বিরুদ্ধে যাচ্ছে আর দাঁড়ি কামিয়ে ফেলেছে। আবার এই মানুষগুলোই পশ্চিমা খেলোয়াড় ও তারকাদের নতুন নতুন ফ্যাশন আর চুলের স্টাইল নকল করছে। তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের "সুন্নাহ" ছেড়ে দিয়ে নিকৃষ্ট জাতির অনুসরণ করছে। তারা মুখে বলে আমরা রাসূল (সাঃ)-কে ভালবাসি, অথচ তাদের কাজ প্রমাণ ,করে যে তারা কাফেরদের আরো অনেক বেশি ভালবাসে।

কত মহিলা হিজাব ত্যাগ করে নিজেদের প্রদর্শন করছে? তারা আঁটোশাঁটো ও খোলামেলা পোশাক পড়তে পছন্দ করে। কত মুসলিম নারী রয়েছে যারা বাহিরে যাবার সময় মেকাপ করছে ও সুগন্ধি ব্যবহার করছে? মূলতঃ এরা কাফেরদের অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই করছে না । তারা নৈতিকতা বিবর্জিত অবিশ্বাসী নারীদের সর্বাত্মকভাবে অনুকরণ করছে ।

কত মুসলিম আছে যারা কথাবার্তায় কাফেরদের অনুকরণ করছে? আপনারা দেখবেন যে তারা পরস্পরের সাথে দেখা হলে জান্নাতের ভাষা "আস্‌সালামু আলাইকুম" এর পরিবর্তে Yo! man ,wazzup (what`s up)? যখন তারা কোন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয় তখন কিছু নামধারী মুসলিম অদ্ভুত সব শপথ করে যদিও আল্লাহ্‌ আমাদের অন্য কিছু বলার শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন, سبحان الله "সুবহানাল্লাহ" বা انا لله وانا اليه راجعون "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" অথবা قدرالله وماشاء فعل "ক্বদ্দারাল্লাহু ওয়া মা শাআ' ফাআ'ল" ।

যখন কোন আনন্দজনক ঘটনা ঘটে ও সফলতা প্রাপ্তি ঘটে তখন অনেক তথাকথিত মুসলিম আল্লাহ্‌র প্রশংসা সূচক الله اكبر "আল্লাহু আকবর" অথবা الحمدلله "আলহামদুলিল্লাহ" না বলে, বলে Yes! অথবা "আমিই এটি করেছি"। কত মুসলিম হাঁচির পরে "আলহামদুলিল্লাহ" বলতে ভুলে যায়। যদিও

বা তাদের মনে পড়ে তবুও তারা তা বলতে লজ্জা পায় কিন্তু কাফেরদের অনুকরণে "এক্সকিউজ মি" বলতে দ্বিধা করে না।

কত মুসলিম আছে যারা কাফেরদের অনুসরণ করে তাদের আনন্দ-উৎসবে অংশ গ্রহণ করে আর তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পালন করে। এসবের মধ্যে রয়েছে বড় দিন, ভ্যালেন্টাইন ডে, নববর্ষ , হ্যাপী নিউ ইয়ার ,জন্মদিন ,বাবা দিবস, মা দিবস, বন্ধু দিবস ইত্যাদি।

কত মুসলিম আছে যারা কাফেরদের অনুকরণে কবরের চারপাশে সাজ-সজ্জা করছে এবং কবর পাকা করছে? জাবির (রাঃ) বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

"আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) কবর পাকা করতে, বসার স্থান হিসেবে ব্যবহার করতে এবং কবরের উপর দালান বানাতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম)

কত নামধারী মুসলিম রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র আইন বাদ দিয়ে মানুষের তৈরী আইন দ্বারা মুসলিম দেশগুলোকে শাসন করছে?

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"তবে কি তাহারা জাহেলী যুগের বিধান কামনা করে ? দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র চাইতে বিধান প্রদানে আর কে উত্তম ।" [সূরা মায়েদা (৫ঃ৫০)]

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ, এবং আমরা আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা পেয়েছি ইসলাম থেকে যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য পরিপুর্ণ করে দিয়েছেন। আমরা এর শিক্ষাতে কিছুই যোগ দিতে পারব না বা এর থেকে কিছুই বাদ দিতে পারব না। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যা তোমাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে বা যা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে তার সবকিছুই আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট করে দিয়েছি।" (মুসনাদ আহমাদ)

রাসূল (সাঃ) অনেক হাদীসে কাফেরদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, من تشبه بقوم فهو منهم "যে কোন জাতিকে অনুকর করে সে তাদের অর্ন্তগত।" (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ)

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হল কাফেরদের থেকে পৃথক থাকা। আল্লাহ্ কর্তৃক অভিশপ্তদের পথ অনুসরণ করা ইসলামের অংশ হতে পারে না। কুরআন ও সুন্নাহ্ এর আলোকে যে কেউ এটি অনুধাবন করতে পারে।

❖ প্রশ্ন-৪। কাফেরদের অনুকরন কয় প্রকার এবং কি কি?

উত্তরঃ- কাফেরদের অনুকরণ দুই প্রকার হতে পারে । হারাম জিনিসের অনুসরণ আর হালাল জিনিসের অনুকরণ।

প্রথম প্রকার হল এমন অনুকরণ যা হারাম ঃ- এর অর্থ হল জেনে শুনে কাফেরদের ধর্মের এমন সতন্ত্র বৈশিষ্ট অনুসরণ করা যা আমাদের ধর্মে নেই । এটি করা হারাম এবং বড় গুনাহ্। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো করার মাধ্যমে একজন মুসলিম, কাফের হয়ে যেতে পারে ।

দ্বিতীয় প্রকার হল এমন অনুকরণ যার অনুমতি আছেঃ- এর অর্থ হল এমন জিনিস করা যা প্রকৃত পক্ষে কাফেরদের থেকে নেওয়া হয়নি যদিও তাদের কেউ কেউ এটি করে । এটির অর্থ তাদের অনুসরণ করা নয়। নিম্নলিখিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে দুনিয়াবী বিষয়ে ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অনুকরণ করা বা তাদের সদৃশ হওয়া অনুমোদনযোগ্য।

(১) তাদের পরিচয় বহন করে এরূপ কোন প্রকার আচার-অনুষ্ঠান বা উপাসনা অনুকরণ করা যাবে না।

(২) তাদের ধর্মের কোন অংশ পালন করা যাবে না ।

(৩) এমন কাজ করা যাবেনা যা সম্পর্কে ইসলামে বিধান রয়েছে। যদি এ সম্পর্কে ইসলামে কোন বিধান পাওয়া যায়, যা এই কাজ অনুমোদন করে বা করে না; তাহলে আমাদের অবশ্যই ইসলামের বিধানের অনুসরণ করতে হবে।

(৪) এমন কোন কাজ করা যাবে না যা শারিয়াহ্ এর বিপরীতে যায় ।

(৫) তাদের কোন উৎসব পালন করা যাবে না।

(৬) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না।

نواقض الايمان
দ্বীন ধ্বংসকারী বিষয় সমূহ

❖ প্রশ্ন-১। نواقض الايمان দ্বীন ধ্বংসকারী বিষয় বলতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ ناقض 'নাকেদ্ব' বা বিনষ্টকারী বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, যার অস্তিত্বের কারণে অন্য কোনো জিনিস বিনষ্ট বা বাতিল হয়ে যায়। এ কথা অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, নামাজ বিনষ্ট বা বাতিল হওয়ার যেমন কিছু কারণ ও বিষয় আছে, তেমনিভাবে দ্বীন বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় আছে। মুসল্লি যদি নামাজ বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর যে কোনো একটিতে পতিত হয়, তাহলে সাথে সাথে তার নামাজ বাতিল হয়ে যায়। যেমন নামাজের মধ্যে শব্দ করে হাসা, কিছু আহার করা বা পান করা ইত্যাদি। এমনি ভাবে তাওহীদ তথা দ্বীন বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় রয়েছে যার মধ্যে বান্দা পতিত হলে তার তাওহীদ বিনষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে সে কাফের মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়।

❖ প্রশ্ন-২। نواقض الايمان দ্বীন বিধ্বংসী বিষয়গুলো কি কি?

উত্তরঃ দ্বীন বিধ্বংসী বিষয় হচ্ছে -

১। আল্লাহর সাথে শরীক করাঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ "

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا [النساء/٤٨]

নিশ্চই আল্লাহ শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না কিন্তু এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন" (সূরা নিসা ঃ৪৮) আল্লাহ আরও বলেনঃ

مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"নিশ্চই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দিবেন আর তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" *(সুরা মায়েদাহঃ ৭২)*

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, কাউকে ভয় করা, অন্যের উপর ভরসা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মানত-মানসা করা, অন্যকে উপকার ও অপকারের মালিক মনে করা, আল্লাহর যেমন ক্ষমতা, অন্য কারো এরূপ ক্ষমতা রয়েছে বিশ্বাস করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আইন বিধানদাতা মানা, অন্য আইনে বিচার ফায়সালা চাওয়া ইত্যাদি সবই শির্ক যা একজনকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

২। আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে এমন মাধ্যম স্থির করা যার কাছে বান্দা সুপারিশ কামনা করে এবং তার ওপর তাওয়াক্কুল করাঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ [يونس/١٨]

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর উপাসনা করে, যা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পাওে না উপকারও করতে পাওে না। তারা বলেঃ এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী।" (ইউনুসঃ ১৮)

আল্লাহ অন্যত্র আরোও বলেনঃ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

“আর যারা তাকে ব্যতীত অলী আউলিয়া ধারণ করেছে (এবং প্রার্থনা ও মান্নত মানসা ইত্যাদি ইবাদত সাব্যস্ত করে) তারা বলে আমরা তাদের উপাসনা করি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিবে।” *(সুরা যুমারঃ ৩)*

এটা হচ্ছে আউলিয়া এবং নেককার লোকদের কবরের উদ্দেশ্যে যারা যায় তাদের অবস্থা। তারা সেখানে গিয়ে কবরবাসিকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত হয়, কবরবাসী আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে এ বিশ্বাসে যেমনঃ তাদের কাছে দোয়া করা, তাদের উদ্দেশ্যে মানত করা, পশু যবাই করা, তাদের কাছে সাহায্য কামনা করা এবং কবরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করা।

৩। মুশরিকদেরকে কাফের মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের কুফরী মতবাদকে সহীহ মনে করাঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ “নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।” (আল ইমরান-১৯)

অন্যত্র বলেনঃ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
“যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করবে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।” (সুরা আল ইমরান ৩ঃ ৮৫)

এখানে সন্দেহ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহ যার কাফের হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে তার কুফরীর ব্যাপারে কোনো মুসলমানের সন্দেহ পোষণ করা যেমনঃ ইহুদী নাসারা মুশরিক (অর্থাৎ ইহুদী নাসারা ও মুশরিকদের কুফরীর ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর কোনো দ্বিমত নেই, তাই কোনো মুসলমান এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। করলে সেও কুফরী মতবাদে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হবে)। এ দৃষ্টি কোন থেকে জাহেলি যুগের মুশরিক যারা নিজেদের মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে নিজেরাই স্বাক্ষ্য প্রদান করেছিলো, আর বর্তমান যুগের মুশরিক যারা ইসলাম ও ঈমানের দাবী করে অথচ আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট হককে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, এই দুই ধরনের মুশরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৪। রাসূল (সঃ) এর দ্বীন, অথবা (পুন্য কাজের) সাওয়াব অথবা (পাপের জন্য) শাস্তি এবং দ্বীনের যে কোনো বিষয় রং-তামাশা বিদ্রুপ করা কুফরীঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

"আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর আয়াত সমূহের সাথে, তার রাসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? তামাশা করো না, তোমরা তো ঈমান প্রকাশ করার পর কাফের হয়ে গেছো।" *(আত-তাওবাহঃ ৬৫-৬৬)*

ইমাম মোহাম্মদ বিন আঃ ওয়াহ্হাব তাঁর কাশফুশ শুবহাত পুস্তিয়কায় বলেনঃ "এটা যখন নিশ্চিত ভাবে প্রমানিত যে কতিপয় মুনাফিক যারা রাসুল (সঃ) এর সাথে রূমের যুদ্ধে অংশগ্রহন করে ও তাদের ঠাট্টা বিদ্রুপাত্মক কথা দ্বারা কুফরী করেছে, তখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, যে ব্যক্তি সম্পদের স্বল্পতার আশংকায় কিংবা কিছু প্রাপ্তির আশায় অথবা কারো মনতুষ্টির জন্য কুফরী কথা বলল অথবা কুফরী কর্ম করল, সে অবশ্যই ঐ ব্যক্তির চেয়ে জঘন্য কাজ করেছে যে ঠাট্টা ও বিদ্রুপাত্মক কথা বলেছে।

এমন অবস্থা আজকাল অনেক নামধারী মুসলিমদের যারা পর্দা করা, দাড়ি রাখা অথবা দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করে প্রকারান্তরে তারা যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সাথে ঠাট্টা করে।

৫। যাদুঃ যাদুর মধ্যে রয়েছে (যাদু-মন্ত্র দ্বারা) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিছিন্নতা সৃষ্টি করা; উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করা। তাছাড়া "তাওলার" আশ্রয় নেয়া। তাওলা হচ্ছে (যাদু মন্ত্রের সাহায্যে) স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে বশীভূতকরণ। এর মধ্যে রয়েছে ভেলকিবাজী এবং ভালবাসা সৃষ্টি করে বলে কথিত রিং। এগুলো নিঃসন্দেহে কুফরী। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ [البقرة/١٠٢]

"তারা উভয়েই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিতো না যে, দেখো, আমরা নিছক পরীক্ষা মাত্র অতএব তুমি কুফরী করো না।" (আল-বাকারাহঃ ১০২)

৬। মুসলমানদের বিরূদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নেয়া ও সহযোগিতা করাঃ

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা, তাদেরকে কাফেরদের হাতে ধরিয়ে দেয়া ইত্যাদি সবই কুফরী। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة/٥١]

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা জালেমদেরকে হেদায়াত করেন না।" *(মায়েদাহঃ ৫১)*

৭। যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ) এর আনীত কোন বিধানকে অপছন্দ করল সে কুফরী করল-যদিও সে ওটি নিজে আমল করেঃ

আল্লাহ সুবঃ বলেনঃ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد/٢٨]

"এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন।" (সূরা, মুহাম্মদ ৪৭ঃ২৮)

৮। মুহাব্বত ও ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথবা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করাঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ [البقرة/

"আর কোনো কোনো লোক এমনও রয়েছে, যারা অন্যান্যকে আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় অনেক বেশী।" (বাকারা; ১৬৫)

৯। যে ব্যক্তি মনে করে যে, নবী (সঃ) এর নিয়ে আসা বিধানের চেয়ে অন্য বিধান পরিপূর্ণ বা উত্তমঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ [آل عمران/١٩]

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হলে ইসলাম।" (*আল ইমরান-১৯)*

অন্যত্র বলেনঃ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করবে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" *(সূরা আল ইমরান ৩ঃ ৮৫)*

হাদীসে বর্ণনা আছে, নবী মুহাম্মাদ (সঃ) বলেছেনঃ

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

"ঐ জাতের শপথ যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত রয়েছে, এই উম্মাতের ইহুদী হোক আর খ্রিষ্টান হোক আমার সম্পর্কে শোনার পর যদি আমার প্রতি এবং

আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে তবে অবশ্যই সে জাহন্নামের অধিবাসীদের মধ্যে গন্য হবে।" *(মুসলিম)*

১০। আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়াঃ

আল্লাহ বাণীঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ

[السجدة/٢٢]

"যে ব্যক্তিকে তার রবের আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে অতঃপর সে তা থেকে বিমূখ হয়েছে তার চেয়ে বড় যালিম কে? নিশ্চয় আমি অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" *(সুরা সাজদাহঃ ২২)*

এসব ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়ের ক্ষেত্রে অবহেলাকারী বা ভয় দ্বারা প্রভাবিতদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। তবে যে ব্যক্তি নিরূপায় ও বাধ্য তার কথা ভিন্ন। এগুলো সবই অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সচরাচরই ঘটে থাকে। মুসলমানের উচিত এগুলোতে পতিত হওয়ার আশংকায় ভীত এবং সতর্ক থাকা। যে সব কাজ আল্লাহর ক্রোধ এবং তার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে অপরিহার্য করে দেয় সেগুলো থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

তাওহীদের সংশয় নিরসন

❖ প্রশ্ন-১। যারা বলে لا اله الا الله মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট, বাস্তবে তার বিপরীত কিছু করলে ক্ষতি নেই - তাদের এ সংশয়ের জবাব কি?

উত্তর- মানুষের মনে একটা সংশয় বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাহলো এই যে, তারা বলে থাকে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা পাঠ করা সত্ত্বেও হযরত উসামা (রাঃ) যাকে হত্যা করেছিলেন, নবী (সাঃ) সেই হত্যাকান্ডটাকে সমর্থন করেননি।

এইরূপ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এই হাদীসটিও তারা পেশ করে থাকে যেখানে তিনি বলেছেনঃ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে (মুখে উচ্চারণ করে) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর উচ্চারণকারীদের হত্যা করা সম্বন্ধেও আরও অনেক হাদীস তারা তাদের মতের সমর্থনে পেশ করে থাকে।

এই মূর্খদের এসব প্রমান পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যারা মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করবে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না এবং তারা যা ইচ্ছা তাই করুক, তাদেরকে হত্যা করাও চলবে না।

এই সব জাহেল মুশরিকদের বলে দিতে হবে যে, একথা সর্বজনবিদিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইয়াহুদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাদেরকে কয়েদ করেছেন যদিও তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলত।

আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবাগণ বানূ হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যদিও তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল; তারা সলাতও পড়তো এবং ইসলামেরও দাবী করত, শুধুমাত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করার কারনে।

ঐ একই অবস্থা তাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য যাদেরকে হযরত আলী (রাঃ) আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া ঐ সব জাহেলরা স্বীকার করে যে, যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারা কাফের হয়ে যায় এবং হত্যারও যোগ্য হয়ে যায়– তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সত্ত্বেও। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের যে কোন একটিকে অস্বীকার করে, সে কাফের হয়ে যায় এবং সে হত্যার যোগ্য হয় যদিও সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। তা হলে ইসলামের একটি অঙ্গ অস্বীকার করার কারণে যদি তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর উচ্চারণ

তার কোন উপকারে না আসে, তবে রাসূলগণের দ্বীনের মূল ভিত্তি যে তাওহীদ এবং যা হচ্ছে ইসলামের মুখ্য বস্তু, যে ব্যক্তি সেই তাওহীদকেই অস্বীকার করল তাকে ঐ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর উচ্চারণ কেমন করে বাঁচাতে সক্ষম হবে? কিন্তু আল্লাহর দুশমনরা হাদীস সমূহের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে না।

হযরত ওসামা (রাঃ) হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তিনি একজন ইসলামের দাবীদারকে হত্যা করেছিলেন এই ধারণায় যে, সে তার জান ও মালের ভয়েই ইসলামের দাবী জানিয়েছিল। কোন মানুষ যখন ইসলামের দাবী করবে তার থেকে ইসলামবিরোধী কোন কাজ প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে। এ সম্বন্ধে কুরআনের ঘোষণা এই যে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا [النساء/٩٤]

"হে মু'মিন সমাজ! যখন তোমরা আল্লাহর রাহে বহির্গত হও, তখন (কাহাকেও হত্যা করার পূর্বে) সব বিষয় তদন্ত করে দেখিও।" (সুরা নিসাঃ ৯৪)

অর্থাৎ তার সম্বন্ধে তথ্যাদি নিয়ে দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত হইও। আল্লাহ বলেছেন, (ফাতাবাইয়ানূ) অর্থাৎ তদন্ত করে দেখ। তদন্ত করার পর দোষী সাব্যস্ত হলে হত্যা করতে হবে।

এইভাবে অনুরূপ হাদীসগুলোর অর্থ বুঝে নিতে হবে। ঐগুলোর অর্থ হবে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মধ্যে তাওহীদ ও ইসলাম প্রকাশ্যভাবে পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে হবে- যে পর্যন্ত বিপরীত কোন কিছু প্রকাশিত না হবে। এ কথার দলীল হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কৈফিয়তের ভাষায় ওসামা (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ তুমি হত্যা করেছ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও? এবং তিনি আরও বলেছিলেনঃ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

'আমি লোকদেরকে হত্যা করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলবেঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। সেই রাসূলই কিন্তু খারেজীদের সম্বন্ধে বলেছেনঃ "যেখানেই তোমরা তাদের পাবে, হত্যা করবে, আমি যদি তাদের পেয়ে যাই তবে তাদেরকে হত্যা করব 'আদ জাতির মত সার্বিক হত্যা।" (*বুখারী ও মুসলিম*)

যদিও তারা ছিল লোকদের মধ্যে অধিক ইবাদতগুযার, অধিক মাত্রায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সুবাহানাল্লাহ উচ্চারণকারী।

খারেজীরা এমন বিনয়-নম্রতার সঙ্গে সলাত আদায় করত যে, সাহাবাগণ পর্যন্ত নিজেদের সলাতকে তাদের সলাতের তুলানায় তুচ্ছ মনে করতেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ .... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ (صحيح مسلم)

অর্থ:- রাসুল (সাঃ) খারেজীদের ব্যাপারে বলেন, এই সম্প্রদায় কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা মুসলিমদেরকে হত্যা করবে। এবং মুর্তিপুজকদের ছেড়ে দেবে। তারা ইসলাম থেকে এমন ভাবে বের হয়ে যাবে যেমনভাবে ত্বীর তার ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। যদি আমি তাদেরকে পাই তাহলে অবশ্যই আমি তাদেরকে হত্যা করব আদ জাতির হত্যা ন্যায়। (সহীহ মুসলিম)

তারা কিন্তু ইলম শিক্ষা করেছিল সাহাবাগণের নিকট হতেই। কিন্তু কোনই উপকারে আসল না তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, তাদের অধিক পরিমাণ ইবাদত করা এবং তাদের ইসলামের দাবী করা, যখন তাদের থেকে শরী'আতের বিরোধী বিষয় প্রকাশিত হয়ে গেল।

ঐ একই পর্যায়ের বিষয় হচ্ছে ইয়াহুদদের হত্যা এবং বানু হানীফার বিরুদ্ধে সাহাবাদের যুদ্ধ ও হত্যাকান্ড। ঐ একই কারণে নবী (সঃ) বানু মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যখন তাঁকে একজন লোক এসে খবর দিল যে, তারা যাকাত দিবে না। এইরূপে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে সমস্ত হাদীসকে তারা হুজ্জত রূপে পেশ করে থাকে তার প্রত্যেকটির তাৎপর্য্য তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি।

❖ প্রশ্ন-২। 'যে ব্যক্তি দ্বীনের কতিপয় ফরয ওয়াজেব পালন করে, সে তাওহীদ বিরোধী কোন কাজ করে ফেললেও কাফের হয়ে যায় না' যারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাদের ভ্রান্তির জবাব কি?

উত্তর- যাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিহাদ করেছেন তারা এদের (আজকের দিনে শির্কী কাজে লিপ্ত- নামধারী মুসলমানদের) চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধিমান ছিল এবং তাদের শির্ক অপেক্ষাকৃত লঘু ছিল। অতঃপর একথাও তুমি জেনে রাখো যে, এদের মনে আমাদের বক্তব্যের ব্যাপারে যে ভ্রান্তি ও সন্দেহ-সংশয় রয়েছে সেটাই তাদের সব চাইতে বড় ও গুরুতর ভ্রান্তি। অতএব এই ভ্রান্তিও অপনোপদন ও সন্দেহের অবসান কল্পে নিম্নের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনঃ তারা বলে থাকেঃ যাদের প্রতি সাক্ষাৎভাবে কুরআন নাযিল হয়েছিল (অর্থাৎ

মক্কার কাফির-মুশরিকগণ) তারা আল্লাহ ছাড়া কোনই মা'বুদ নেই একথার সাক্ষ্য প্রদান করে নাই, তার রাসূল (সঃ)-কে মিথ্যা বলেছিল, তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিল, তারা কুরআনকে মিথ্যা বলেছিল এবং বলেছিল এটাও একটি যাদু মন্ত্র। কিন্তু আমরা তো সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ ছাড়া নেই কোন মাবুদ এবং (এ সাক্ষ্যও দেই যে,) নিশ্চয় মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর রাসূল, আমরা কুরআনকে সত্য বলে জানি ও মানি আর পুনরুত্থান এর বিশ্বাস রাখি, আমরা সলাত পড়ি এবং সিয়ামও রাখি, তবু আমাদেরকে এদের (উক্ত বিষয়ে অবিশ্বাসী কাফেরদের) মত মনে কর কেন?

এর জওয়াব হচ্ছে এই যে, এ বিষয়ে সমগ্র আলেম সমাজ তথা শরীআতের বিদ্বান মন্ডলী একমত যে, একজন লোক যদি কোন কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সত্য বলে মানে আর কোন কোন বিষয়ে তাকে মিথ্যা বলে ভাবে, তবে সে নির্ঘাত কাফের, সে ইসলামে প্রবিষ্টই হতে পারে না; এই একই কথা প্রযোজ্য হবে তার উপরেও যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করল, আর কতক অংশকে অস্বীকার করল, তাওহীদকে স্বীকার করল কিন্তু সলাত যে ফরয তা মেনে নিল না। অথবা তাওহীদও স্বীকার করল, সলাতও পড়ল কিন্তু যাকাত যে ফরয তা মানল না; অথবা এগুলো সবই স্বীকার করল কিন্তু সিয়ামকে অস্বীকার করে বসল কিংবা ঐ গুলো সবই স্বীকার করল কিন্তু একমাত্র হজ্বকে অস্বীকার করল, এরা সবাই হবে কাফের।

কোন ব্যক্তি যদি এগুলো সমস্তই অর্থাৎ তাওহীদ, সলাত, যাকাত, রামাযানের সিয়াম, হজ্জ মেনে নেয় কিন্তু পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যাবে। তার রক্ত এবং তার ধন-দৌলত সব হালাল হবে (অর্থাৎ তাকে হত্যা করা এবং তার ধন-মাল লুট করা সিদ্ধ হবে) যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا [النساء/١٥٠]

"নিশ্চয় যারা অমান্য করে আল্লাহকে তাঁর রাসূলদেরকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের (আনুগত্যের) মধ্যে পার্থক্য করতে চায় আর বলে কতককে আমরা বিশ্বাস করি আর কতককে অমান্য করি এবং তারা ঈমানের ও কুফরের মাঝামাঝি একটা পথ আবিষ্কার করে নিতে চায়-এই যে লোক সমাজ সত্যই তারা হচ্ছে কাফের, বস্তুতঃ কাফেরদিগের জন্য আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি এক লাঞ্ছনা দায়ক শাস্তি।" (*আন নিসাঃ ১৫০*)

আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কালাম পাকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের কিছু অংশকে মানবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে, সে সত্যিকারের কাফের এবং তার প্রাপ্য হবে সেই বস্তু (শাস্তি) যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। এতদ্বারা এ সম্পর্কিত ভ্রান্তিও অপনোদন ঘটছে।

যখন মানুষ নবী (সঃ) কর্তৃক আনীত ফরয, ওয়াজেব সমূহের সবগুলোকে মেনে নিয়ে ঐগুলোর একটি মাত্র অস্বীকার করে কাফের হয়ে যায় তখন কি করে সে কাফের না হয়ে পারে যদি রাসূল, সমস্ত দ্বীনের মূল বস্তু তাওহীদকেই সে অস্বীকার করে বসে? সুবহানাল্লাহ! কি বিস্ময়কর এই মূর্খতা!

আর এ কথাও বলা যেতে পারে যে, যে বানু ওবায়দ আল কান্দাহ বানু আব্বাসের শাসন কালে মরক্কো প্রভৃতি দেশে ও মিসরে রাজত্ব করেছিল, তারা সকলেই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কালেমার সাক্ষ্য দিত–ইসলামকেই তাদের ধর্ম বলে দাবী করত। জুমা ও জামাআতে নামাযও আদায় করত। কিন্তু যখন তারা কোন কোন বিষয়ে শরী'আতের বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণের কথা প্রকাশ করল, তখন তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর আলেম সমাজ একমত হলেন। আর তাদের দেশকে দুরুল হরব বা যুদ্ধের দেশ বলে ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ যুদ্ধ করলেন। আর মুসলমানদের শহরগুলোর মধ্যে যেগুলো তাদের হস্তগত হয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করে নিলেন। তাদের এ কথাও বলা যেতে পারেঃ যে তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেনঃ

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ [التوبة/٧٤]

অর্থাৎ "তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলছেঃ কিছুই তো আমরা বলিনি" অথচ কুফরী কথাই তারা নিশ্চয় বলছে, ফলে ইসলামকে স্বীকার করার পর তারা কাফের হয়ে গিয়েছে।" *(সুরা তওবাঃ ৭৪)*

তুমি কি শুননি মাত্র একটি কথার জন্য আল্লাহ এক দল লোককে কাফের বলছেন, অথচ তারা ছিল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমসাময়িক কালের লোক এবং তারা তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছে, সলাত পড়েছে যাকাত দিয়েছে, হজ্জব্রত পালন করেছে এবং তাওহীদের উপর বিশ্বাস রেখেছে? আর ঐসব লোক যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেনঃ

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ [التوبة/٦٥، ٦٦]

"তুমি বলঃ তোমরা কি ঠাট্টা তামাশা করছিলে আল্লাহ ও তাঁর আয়াতগুলোর এবং তাঁর রাসূলের সম্বন্ধে? এখন আর কৈফিয়ত পেশ করো না। তোমরা নিজেদের ঈমান প্রকাশ করার পরও তো কুফরী কাজে লিপ্ত ছিলে।" (*তওবা ৬৫-৬৬*)

এই লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেনঃ তারা ঈমান আনার পর কাফের হয়েছে। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তারা তো মাত্র একটি কথাই বলেছিল এবং সেটা হাসি ও ঠাট্টার ছলে।

অতএব, তুমি এ সংশয় ও ধোঁকাগুলোর ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। সেটা হলঃ তারা বলে, তোমরা মুসলমানদের মধ্যে এমন লোককে কাফের বলছ যারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তারা নামায পড়ছে, রোযা রাখছে। তারপর তাদের এ সংশয়ের জওয়াবও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ।

باب الكفر دون كفر

কুফর দুনা কুফর

❖ প্রশ্ন-১। কুফর দুনা কুফর কি?

উত্তরঃ- কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে সালাফে সালেহীনগনের একটি সু প্রতিষ্ঠিত আক্বীদাহ হচ্ছে- আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির। এটি বড় কুফরী এই বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু আমাদের সময়ের কিছু বাতিল আলেমরা দাবী করে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করা ছোট কুফরী। তারা মিথ্যা বলে এবং এর স্বপক্ষে তারা মহান সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা) এর দূর্বল সনদের একটি উক্তিকে ব্যবহার করে, যা তার ব্যাপারে বলা হয়, সূরা মায়িদার ৪৪নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন- কুফর দুনা কুফর অর্থাৎ বিষয়টি বড় কুফরী নয় বরং ছোট কুফরী।

❖ প্রশ্ন-২। কুফর-দুনা কুফর এর ব্যাপারে ইবনে আব্বাস থেকে বর্নিত আছরগুলোর সানাদ কি? প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে তাঁর থেকে বর্নিত সাহীহ বর্ননা কি?

উত্তরঃ- আল্লাহর বানীঃ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির" (সূরা, মায়িদাহ ৫:৪৪)

এই আয়াতের তাফসীরে সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা) এর কথা অনুযায়ী এটি কি বড় কুফর নাকি ছোট কুফর বিষয়টি প্রমান করার জন্য দেখতে হবে তিনি এ ব্যাপারে কি বলেছেন। এবং যা তার নামে বর্ননা করা হবে তার সত্যতা কতটুকু। চলুন আমরা দেখি, এ ব্যাপারে কি কি বর্ননা রয়েছে, এগুলোর সনদ কি? আছার (সাহাবীর বর্ননা) এক এবং দুই

(১) ইবনে জারীর বর্ননা করেন, হুনাদ আমাকে বর্ননা করেন, ইবনে ওয়াক্বীহ তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা সুফিয়ান থেকে, তিনি মু'আমার ইবন রাশাদ থেকে, তিনি ইবন তাউস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, ইবনে আব্বাস রা. তাঁর (আল্লাহর) বানী, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির" এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'এর মধ্যে কুফর রয়েছে, কিন্তু এই কুফরী ফিরিশতা, কিতাব এবং রাসুলদের অস্বীকার করার মত কুফরী নয়'।[তাফসীরে ইবনে জারীর, ভলি ৬, পৃ ২৫৬)

শাইখ আলী আল তামিমি বলেন, আমি বলি এই সনদটি সাহীহ, যা বাহ্যিকভাবে দেখা যাচ্ছে, সব কথাই ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ননা করা হয়েছে। অনেক লোকেরাই এর ইসনাদ সাহীহ হওয়ার কারনে বিভ্রান্ত হন এবং এর মধ্যে ইদরাজ (অতিরিক্ত কথা ঢুকানো) কে লক্ষ্য করে না, যা পরিষ্কার হয়, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক এর সংগ্রহ থেকে,

(২) ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বর্ননা করেন, আমাদের কাছে বর্ননা করেছেন মু'আমার তিনি ইবন তাউস থেকে, তিনি তার পিতা (তাউস) থেকে, ইবনে আব্বাসকে তাঁর বানীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির" তিনি বলেন, 'এর মধ্যে কুফর রয়েছে (হিয়া বিহি কুফরুন)'। ইবনে তাওস বলেন, 'কিন্তু এই কুফরী ফিরিশতা, কিতাব এবং রাসুলদের অস্বীকার করার মত কুফরী নয়।'

আল বারাকাওয়ী বলেন, 'আব্দুর রাজ্জাক অধিক বিশ্বস্ত এবং উত্তম মু'আমার থেকে, যদি বিরোধ হয় তবে তার কথাই গ্রহনযোগ্য।'

ইবনে আসাকীর বলেন, আমি আহমাদ বিন হাম্বল কে বলতে শুনেছি, 'যদি তুমি দেখ মু'আম্মার এর সাথীরা বিরোধ করছে, তবে হাদীসটি আব্দুর রাজ্জাক এর জন্য (তার থেকে গ্রহণযোগ্য)' [শারহ ইলাল আত্ তিরমিজি ইবনে রজব কর্তৃক, ভলি ২/৬৯২)]

তাহলে বুঝা গেল, 'কিন্তু এই কুফরী ফিরিশতা, কিতাব এবং রাসুলদের অস্বীকার করার মত কুফরী নয় ।' এই কথাটি ইবনে আব্বাস রা. এর নয় কথাটি তাউসের এবং ইবনে জারীর বর্নিত আছারে এটি ইদরাজ বা ইবনে আব্বাসের নামে অতিরিক্ত সংযোজন, যা তিনি বলেননি । বরং তিনি শুধু বলেছেন, ' হিয়া বিহি কুফরুন' অর্থাৎ 'এর মধ্যে কুফর রয়েছে' ।

খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, ইবনে কাসীর ইদরাজ সহ ইবনে জারীর এর এই আসারটি উল্লেখ করেননি ।

আছার তিন

(৩) আল হাফিয ইবন নাসর আল মারাওয়ী বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বর্ননা করেন, আমাদেরকে আব্দুল রাজ্জাক বর্ননা করেন, আমাদেরকে সুফিয়ান বর্ননা করেন, তিনি একজন ব্যক্তি থেকে, তিনি তাউস থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ... তারাই কাফির" তিনি বলেন, 'কুফর, যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না ।' [তা'যীম ক্বাদর ইস-সলাহ, নং ৫৭৩] সনদে একজন অপরিচিত ব্যক্তির কারনে ইসনাদ টি যয়ীফ (দূর্বল) ।

আছার চার

(৪) আল হাফিয ইবন নাসর বলেন, আমাদেরকে বর্ননা করেন, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ আমাদেরকে বর্ননা করেন, তিনি হিশাম (বিন হুজাইর) থেকে, তিনি তাউস থেকে, ইবনে আব্বাস রা. তাঁর বানীর ব্যাপারে বলেন, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ... তারাই কাফির" তিনি বলেন, 'এটা ঐ কুফরী নয় যা তোমরা মনে করছ ।'

মন্তব্য- এই সনদে সব ব্যক্তিরাই বিশ্বস্ত হিশাম বিন হুজাইর ব্যতীত, তাকে যায়ীফ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সালাফগন: তাদের মধ্যে রয়েছেন আলী বিন মাদীনি, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ [আল জারহ ওয়া তা'দীল, ভলি. ৯ পৃ:৫৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ বলেন, আমি আমার পিতা (ইমাম আহমাদ) কে বলতে শুনেছি, 'আমি ইয়াহইয়াকে হিশাম বিন হুজাইর এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি তাকে অনেক দূর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেন' । [আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাত আর রিজাল, ভলি ২ পৃ৩০]

তিনি আরও বলেন, আমি আমার পিতাকে (ইমাম আহমাদ) বলতে শুনেছি, 'হিশাম বিন হুজাইর হচ্ছে মাক্কী এবং সে হাদীসের ব্যাপারে দূর্বল' । [আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাত আর রিজাল, ভলি ১ পৃ ২০৪]

আল উক্বাইলি তাকে ডাকতেন আদ্ দুয়াফা বা দূর্বল রাবী হিসেবে ।

আছার পাঁচ

(৫) আল হাকিম বর্ননা করেন, আলী বিন হারব থেকে, তিনি সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ থেকে, তিনি হিশাম বিন হুজাইর থেকে, তিনি তাউস থেকে বর্ননা করে যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'এটা ঐ কুফর নয় যেদিকে তোমরা ঝুকে পড়ছ (বুঝাতে চাচ্ছ), "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির" হচ্ছে ছোট কুফর (বড়) কুফর থেকে [কুফর দুনা কুফর]'। [আল মুস্তাদারক, ভলি.২, পৃ; ৩১৩]

এই আছারটি অনেক বিখ্যাত, কিন্তু এটিও দূর্বল হিশাম বিন হুজাইর এর কারনে, হাদীস বিশারদগন তাকে দূর্বল ঘোষনা করেছেন।

আছার ছয়

(৬) ইবনে জারীর আত তাবারী বলেন, আমাদেরকে মুসান্না বর্ননা করেন, আব্দুল্লাহ বিন সালেহ বলেন, মুওয়াবিয়াহ বিন সালেহ আমাদেরকে বর্ননা করেন, আলী বিন আবি তালহা থেকে, ইবনে আব্বাস তাঁর বানীঃ , وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির" এ ব্যাপারে বলেন, 'যে অস্বীকার করে যা (তিনি) নাজিল করেছেন তাহলে সে কাফির, এবং যে এটি স্বীকার করে ও এর দ্বারা বিচার ফায়সালা না করে সে জালিম এবং ফাসিক্ব।' [তাফসীরে ইবনে জারীর, ভলি. ৪, পৃ.২৫৬)

এই বর্ননাটিও অনেক বিখ্যাত, এবং অনেক তাফসীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। সনদে আব্দুল্লাহ বিন সালেহ হচ্ছে, ইবনে মুহাম্মদ বিন মুসলিম আল জুহনী আল মিসরী, আল লাইস বিন সা'দ এর লেখক, এবং সে দূর্বল রাবী। আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন, আমি আমার পিতাকে আব্দুল্লাহ বিন সালেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন 'প্রথমে সে দৃঢ় ছিল, পরবর্তীতে তার পতন ঘটে এবং সে কিছুই না।' ইবনে আল মাদীনী বলেনে, 'আমি তার থেকে কিছুই বর্ননা করব না'। [আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতির রিজাল, ভলি.২, পৃ:২১৩]

আন নাসায়ী বলেন, 'সে বিশ্বস্ত ছিল না।' আহমদ বিন সালেহ বলেন, 'সে অভিযুক্ত, এবং কিছুই না।' সালেহ জাররাহ বলেন, 'ইবনে মুয়ীন তাকে বিশ্বস্ত হিসেবে গ্রহন করতেন কিন্তু আমার কাছে সে হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী।' [আল মিযান-আয-যাহাবী, ভলি. ৪, পৃ: ৪১১]

আপরদিকে বর্ননাটি মুনক্বাতে (বিচ্ছিন্ন সনদ বিশিষ্ট) এবং অগ্রহণযোগ্য। কারণ আলি বিন আবি তালহা কোন সাহাবীর সময় পর্যন্ত পৌছে নি, না ইবনে আব্বাস বা অন্য কেউ।

ইবনে আবি হতিম বলেন, 'আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আলী বিন আবি তালহা ইবনে আব্বাস থেকে তাফসীর শুনেননি। [আল মারাসীল পৃ. ১১৭] এবং ইবনে হিব্বান বলেন, 'সে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ননা করে এবং (অথচ) উনাকে কখনই দেখে নি।' [আয্-থিক্বাত, ভলি. ৭, পৃঃ ২১১)
হাফিয আত্-তাক্বরীবে বলেন, 'সত্যবাদী কিন্তু তার বর্ননা বিচ্ছিন্ন।'
মুয়ায বিন সালিহ ইবনে হুদাইফ, আন্দালুসিয়ার কাযী-হাফিয তার থেকে বর্ননা করেন, 'সত্যবাদী কিন্তু ভুল করেন।' সুতরাং তিনি নিজে একাকী যথেষ্ট নন (রাবী হিসেবে)।
সুতরাং সনদটি দূর্বল এবং দালীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় কারণ রাবী আব্দুল্লাহ বিন সালিহ দূর্বল, সনদে মুওয়াবিয়াহ বিন সালিহ রয়েছেন যে শক্তিশালী নয়, সনদে আলী বিন আবি তালহা রয়েছেন যার সত্যতা শক্তিশালী নয়, অপরদিকে ইবনে আব্বাস পর্যন্ত সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।
তাছাড়া আত্ তাবারী তার শাইখ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম থেকে বর্ননা করেন, যে অজানা, কেউই তার থেকে বর্ননা করেননি, ইমাম তাবারী ছাড়া। আমরা অনুরূপ সনদের একটি দূর্বল হাদীস বর্ননা করে দেখাচ্ছি যে, এই সনদ থেকে বর্ননা গ্রহণযোগ্য নয়।
ইবনে জারীর আত তাবারী বলেন, আমাদেরকে মুসান্না বর্ননা করেন, আব্দুল্লাহ বিন সালেহ বলেন, মুওয়াবিয়াহ বিন সালেহ আমাদেরকে বর্ননা করেন, আলী বিন আবি তালহা থেকে, 'আলিফ লাম ছোয়াদ যা সূরা আ'রাফের শুরু, ক্বাফ হা আইন ইয়া ছোয়াদ যা সূরা মারইয়ামের শুরু, তা হা ইয়া সীন ছোয়াদ তা সীন মীম নুন এবং এর অনুরূপ এবং রাসুল (স) বলেন এটি একটি ক্বাসাম যা আল্লাহ করেছেন এবং আল্লাহর একটি নাম।' [তাফসীর আত তাবারী খণ্ডঃ ৮, পৃ; ১১৫] আলী বিন আবি তালহা মধ্যবর্তী কোন রাবী ব্যতীত হঠাৎ করে রাসুল (স) থেকে বর্ননা করেন, এটা নিশ্চিত রাসুল (স) এরূপ কখনই বলেননি, এবং এটা সুনিশ্চিত যে এগুলো আল্লাহর নাম নয়। এই সনদটি যে দূর্বল, মুনকার তা যথেষ্টভাবে দেখানো হয়েছে।
এইসব বর্ননার পর আমরা বলতে পারি এই ব্যাপারে একমাত্র সাহীহ বর্ননাটি হচ্ছে, যা আব্দুল রাজ্জাকে বর্ননা করেছেন, ইবনে আব্বাসকে তাঁর বানীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ। "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির" তিনি বলেন, 'এর মধ্যে কুফর রয়েছে (হিয়া বিহি কুফরুন)'।

আরকানুল ঈমান
আল্লাহর প্রতি ঈমান

❖ প্রশ্ন-১। ঈমানের প্রথম রুক্ন বা স্তম্ভঃ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে কি বোঝায়? আল্লাহর প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?

উত্তরঃ- প্রথমতঃ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ বিশ্ব জগতের একজন রব রয়েছেন। যিনি স্বীয় সৃষ্টি রাজত্ব, পরিচালনা ও কর্ম ব্যাবস্থাপনায় এক ও একক। যিনি রুযীদাতা, জীবন দাতা, মৃত্যুদাতা, ক্ষমতাশীল, এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনকারী । তিনি একাই যা ইচ্ছা তা করেন, এবং যা চান তার হুকুম করেন। তাঁরই হাতে আসমান জমিনের রাজত্ব। তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল ও জ্ঞাত রয়েছেন। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কর্ম সমূহে কোন শরীক নেই।

দ্বিতীয়তঃ এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুন্দর নাম সমূহ ও পুত-পবিত্র পূর্ণ গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়। আর এই আকীদাহ- বিশ্বাস দু'টি বড় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত-

প্রথমঃ নিশ্চয় আল্লাহ্র সুন্দর নাম ও মহান গুণ রয়েছে, যা পরিপূর্ণ গুনাবলীর প্রমাণ করে, তাতে কোন প্রকারের অপরিপূর্ণতা ও ত্রুটি নেই। সৃষ্টিজীবের কোন কিছুই তার মত ও তার অংশীদার হতে পারেনা।

দ্বিতীয়ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল দোষ ও ত্রুটি যুক্ত গুণ হতে সম্পুর্ণভাবে পুত-পবিত্র যেমন-নিদ্রা অপারগতা, মূর্খতা ও জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি।

আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলোর লক্ষ্য রাখা উচিতঃ (১) সংযোজন ও বিয়োজন ব্যাতীত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সকল সুন্দর নাম সমূহ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত রয়েছে তার উপর ঈমান আনা। (২) আল্লাহ্ নিজেই নিজের নাম রেখেছেন। সৃষ্টি জীবের কেউ তার নাম রাখে নাই। এবং তিনি নিজেই এই সকল নাম দ্বারা স্বীয় প্রশংসা করেছেন। ইহা সৃজিত নতুন নয়। ইহার উপর ঈমান আনা। (৩) আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ এমন পরিপূর্ণ অর্থবোধক যাতে কোন প্রকারের কোন ত্রুটি নেই। তাই এ নাম সমূহের প্রতি ঈমান আনা যেমন ওয়াজিব, তেমনি এর অর্থের উপর ঈমান আনাও ওয়াজিব। (৪) এ সমস্ত নামের অর্থ অস্বীকার ও অপব্যাক্ষা না করে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা ওয়াজিব। (৫) প্রতিটি নাম হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান ও ফলাফল এবং এর প্রভাবের প্রতি ঈমান আনা।

তৃতীয়তঃ এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র সত্যিকার ইলাহ বা মা'বুদ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদাত পাওয়ার অধিকার

রাখেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ, ইবাদতে তাঁর কোন শরীক নেই। ইহাই তাওহীদে উলুহীয়্যাহ্।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহ.) তাঁর "আক্বীদাহ আত তাহাভিয়্যাতে" আল্লাহর প্রতি ঈমানকে এভাবে উপস্থাপন করেন- ১। নিশ্চয়ই আল্লাহ এক, যাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই। ২। তাঁর মত কিছুই নেই। (কেউ তাঁর সমতুল্য নয়)। ৩। কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। ৪। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। ৫। তিনি অনাদি, যার কোন আদি নেই। তিনি অনন্ত, যার কোন অন্ত নেই। ৬। তাঁর ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই। ৭। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। ৮। কল্পনা তাঁর ধারে কাছে পৌঁছে না এবং ইন্দ্রিয় জ্ঞান তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না। ৯। সৃষ্ট বস্তু তাঁর সদৃশ্য হতে পারে না। নিদ্রার দরকার নেই। ১১। তিনি এমন সৃষ্টিকর্তা যার সৃষ্টিতে কোন সাহায্যের মুখাপেক্ষী হন না এবং তিনি অক্লান্ত রিযক দাতা। ১২। তিনি নির্ভয়ে প্রাণ সংহারকারী এবং নির্বিবাদে পুনরুত্থানকারী। ১৩। সৃষ্টির বহু পূর্বেই তিনি তাঁর অনাদি গুণাবলীসহ বিদ্যমান ছিলেন, আর সৃষ্টির কারণে তাঁর নতুন কোন গুণের সংযোজন ঘটেনি এবং তিনি তাঁর গুণাবলীসহ যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি তিনি স্বীয় গুণাবলীসহ অনন্ত থাকবেন। ১৪। সৃষ্টির কারণে তাঁর গুণবাচক নাম "খালেক" (সৃষ্টিকর্তা) হয়নি। অথবা বিশ্ব জাহান সৃষ্টির কারণে তাঁর গুণবাচক নাম "বারী" (উদ্ভাবক) হয়নি। ১৫। প্রতিপাল্যের অবিদ্যমানতায়ও তিনি ছিলেন 'রব' বা প্রতিপালক, আর মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন 'খালেক' বা সৃষ্টিকর্তা। ১৬। মৃতকে জীবন দান করার ফলে তাঁকে 'জীবনদানকারী' বলা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কোন বস্তুকে জীবন দান করার পূর্বেও তিনি এই নামের (জীবন দানকারী) অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি সৃজন ছাড়াই সৃষ্টি কর্তার নামের অধিকারী ছিলেন। ১৭। এটা এই জন্য যে, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর অনুগ্রহ ভিখারী; সব কিছুই তাঁর জন্য সহজ তিনি কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। "তাঁর মত কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" ১৮। তিনি স্বীয় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। ১৯। এবং তাদের (সৃষ্ট বস্তুর) জন্য সব কিছুরই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। ২০। এবং তাদের জন্য মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করেছেন। ২১। সৃষ্ট জীবের সৃষ্টির পূর্বে কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। জীব জগতের সৃষ্টির পূর্বেই তাদের সৃষ্টির পরবর্তীকালের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। ২২। এবং তিনি তাদের স্বীয় আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর অবাধ্যচরণ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ২৩। সবকিছু তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার

মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এবং একমাত্র তাঁরই ইচ্ছা কার্যকর হয়, এবং (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া) বান্দার কোন ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় না। অতএব তিনি বান্দাদের জন্য যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না। ২৪। আল্লাহপাক যাকে ইচ্ছা হিদায়েত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ, পক্ষান্তরে যে পথভ্রষ্ট হতে চায়, তাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে অপমানিত ও বিপদগ্রস্ত করেন। এটা তাঁর ন্যায় বিচার। ২৫। সব কিছু পরিবর্তিত হয়ে থাকে তাঁর ইচ্ছায় ও তাঁর অনুগ্রহে এবং সুবিচারের মাধ্যমে। ২৬। তিনি কারও প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমকক্ষ হওয়ার উর্ধ্বে। ২৭। তাঁর মীমাংসার কোন পরিবর্তন নেই। কেউই তাঁর নির্দেশ বাতিল করার নেই এবং তাঁর নির্দেশকে পরাভূত করারও কেউ নেই।

❖ প্রশ্ন-২। মানুষ আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা নিরুপনে অক্ষম বিষয়টির প্রমান কি?

উত্তরঃ- আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [الزمر/٦٧]

"তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরুপন করতে পারেনি। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোতে থাকবে।" (যুমার : ৬৭)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَوْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبْرُ تَصْدِيقًا لَهُ ثُمَّ قَرَأَ (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একজন ইহুদী পন্ডিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, 'হে মুহাম্মদ, আমরা [তাওরাত কিতাবে] দেখতে পাই যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত আকাশ মন্ডলীকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত যমীনকে এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে, পানি এক আঙ্গুলে ভূতলের সমস্ত জিনিসকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলে রেখে বলবেন, আমিই সম্রাট।' এ কথা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) ইহুদী পন্ডিতের কথার সমর্থনে এমন ভাবে হেসে দিলেন যে তাঁর দন্ত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। অতপর তিনি "তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরুপন করতে পারেনি।" এ আয়াতটুকু পড়লেন।

يَأْخُذُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَمَوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ فَيَقُولُ أَنَا اللَّهُ – وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا – أَنَا الْمَلِكُ

সহীহ মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, পাহাড়- পর্বত এবং বৃক্ষরাজি এক হাতে থাকবে তারপর এগুলোকে ঝাকুনি দিয়ে তিনি বলবেন, 'আমি রাজাধিরাজ, আমিই আল্লাহ।' সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় আছে

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَالْخَلاَئِقَ عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ.

"সমস্ত আকাশ মন্ডলীকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। পানি এবং ভূতলে যা কিছু আছে তা এক আঙ্গুলে রাখবেন। আরেক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ত সৃষ্টি।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত মারফু হাদীসে আছে,

يَطْوِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِى الأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ত আকাশমন্ডলীকে ভাঁজ করবেন। অতঃপর সাত তবক যমীনকে ভাঁজ করবেন এবং এগুলোকে বাম হাতে নিবেন। তারপর বলবেন, "আমি হচ্ছি রাজাধিরাজ। অত্যাচারীরা কোথায়? অংহকারীরা কোথায়? (মুসলিম)

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাত তবক আসমান ও যমীন আল্লাহ তাআলার হাতের তালুতে ঠিক যেন তোমাদের কারো হাতে এটা সরিষার দানার মত। ইবনে যায়েদ বলেন, "আমার পিতা আমাকে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঠিক যেন, একটি ঢালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের [মুদ্রার] মত।" তিনি বলেন, 'আবুযর রা. বলেছেন, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামকে এ কথা বলতে শুনেছি, "আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থান হচ্ছে ঠিক ভূপৃষ্ঠের কোন উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকা একটি আংটির মত।

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে,

بَيْنَ سَمَاء الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسمِائَةِ عَام ، وَبَيْن كُلّ سَمَاء خَمْسمِائَةِ عَام ، وَبَيْنَ السَّمَاء السَّابِعَة وَالْكُرْسِيّ خَمْسمِائَةِ عَام ، وَبَيْنَ الْكُرْسِيّ وَبَيْنَ الْمَاء خَمْسمِائَةِ عَام ، وَالْكُرْسِيّ فَوْق الْمَاء . وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ فَوْق الْكُرْسِيّ وَيَعْلَم مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

তিনি বলেন, 'দুনিয়ার আকাশ এবং এর পরবর্তী মাকামের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। আর এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের। এমনিভাবে সপ্তমাকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। একই ভাবে কুরসী এবং পানির মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের। আরশ হচ্ছে পানির উপরে। আর আল্লাহ তাআলা সমাসীন রয়েছেন আরশের উপর। তোমাদের আমলের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। (ইবনে মাহদী হাম্মাদ বিন সালামা হতে তিনি আসেম হতে, তিনি যিরর হ'তে, এবং যিরর আবদুল্লাহ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন) [কিতাবুত তাওহীদ, মুহাঃ বিন আঃ ওয়াহ্হাব]

❖ প্রশ্ন-৩। আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তরঃ- আল্লাহর নাম হচ্ছে সেগুলো, যা দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহ কে বুঝায় এবং সেসব পরিপূর্ন গুনাবলীও তাঁর নামের অন্তর্ভূক্ত যা তাঁর রয়েছে যেমন- আল ক্বাদি-র (সর্বশক্তিমান), আল 'আলি-ম (সর্বজ্ঞাতা), আল হাকি-ম (প্রজ্ঞাময়), আস-সামি'য় (সর্বশ্রোতা), আল বাছি-র (সর্বদ্রষ্টা)। এই নামগুলো স্বয়ং আল্লাহকে বুঝায় এবং যেসব পরিপূর্ন গুনাবলী তাঁর মধ্যে আছে সেগুলোকে বুঝায়, যেমন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শোনা, দেখা। সুতরাং নাম দ্বারা দু'টি জিনিস বুঝায়, আর গুনাবলী দ্বারা একটি জিনিস বুঝায়। এটা বলা যেতে পারে যে, নামের মধ্যে গুনাবলীও অন্তর্ভূক্ত এবং গুনাবলী দ্বারা তাঁর নামের দিকে ইঙ্গিত করে তথা পরোক্ষ ভাবে নামকে বুঝায়। এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

শাইখ আলী আব্দুল ক্বাদির আল সাকাফ বলেন, যা দ্বারা নাম ও গুনাবলীকে পার্থক্য করা যায় তা হচ্ছে-

১। নাম থেকে গুনাবলী বের করা যায় কিন্তু গুনাবলী থেকে নাম বের করা যায় না। যেমন আল্লাহর নাম- আর রহিম (সবচেয়ে দয়ালু), আল ক্বাদি-র (সর্বশক্তিমান), আল 'আযিম (সর্ব মহান) থেকে তাঁর গুনাবলী রহমাহ (দয়া), কুদরাহ (শক্তি), 'আযমাহ (মহানত্ব) পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর গুনাবলী ইচ্ছা, আসা, কৌশল করা এগুলো থেকে আমরা "ইচ্ছাকারী", ''আগমনকারী'', ''মাকির বা কৌশলকারী'' এসব নাম বের করতে পারি না।

তাঁর নামসমূহ বর্ননামূলক, যেমন ইবনুল কাইয়্যিম তার ''al-Nooniyyah'' কিতাবে বলেন,

২। আল্লাহর কার্যাবলী থেকে তাঁর নাম বের করা যায় না। তিনি ভালবাসেন, ঘৃনা করেন, রাগান্বিত হন কিন্তু এ থেকে তাকে "ভালবাসাকারী" ,"ঘৃনাকারী" , "রাগকারী" নামে ডাকা যাবে না। তবে তাঁর কার্যাবলী থেকে গুনাবলী বের করা যায়। সুতরাং এটা প্রমানিত যে, তাঁর এই গুনাবলী রয়েছে যে তিনি ভালবাসেন, ঘৃনা করেন, রাগান্বিত হন ইত্যাদি এটা থেকে বলা যায় যে, তাঁর গুনাবলীর বৈশিষ্ট্য অনেক প্রশ্বস্ত তাঁর নামের বৈশিষ্ট্য থেকে। (আল মাদারিয়ুস সালেকীন ৩/৪১৫)

৩। নাম এবং গুনাবলী উভয়ই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং শপথের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় কিন্তু পার্থক্য হয় তখন যখন মানুষকে আল্লাহর দাস বলে নামকরন এবং দোয়ার ক্ষেত্রে। সুতরাং আমরা নামের ক্ষেত্রে বলতে পারি আবদুর রহিম (সর্বাধিক দয়াশীলের বান্দা), আবদুল ক্বাদি-র (সর্বশক্তিমানের বান্দা) কিন্তু আমরা গুনাবলীর ক্ষেত্রে বলতে পারি না আবদুল রহমাহ (দয়ার বান্দা) বা আবদুল কুদরাহ (শক্তির বান্দা)। অনুরূপভাবে আমরা আল্লাহর নামদ্বারা তাঁর কাছে দোয়া করতে পারি, যেমন ইয়া রাহী-মু তুমি আমাকে দয়া কর, ইয়া গাফু-রু আমাকে ক্ষমা কর কিন্তু তাঁর গুনাবলীর ক্ষেত্রে আমরা এভাবে বলতে পারি না, ইয়া আল্লাহর দয়া, তুমি আমাকে দয়া করা, ইয়া আল্লাহর ক্ষমা তুমি আমাকে ক্ষমা কর।
সুতরাং দয়া আল্লাহ নয় বরং আল্লাহর একটি গুন দয়া...। (Sifaat Allaah 'azza wa jall al-Waaridah fi'l-Kitaab wa'l-Sunnah, p. 17)

❖ প্রশ্ন-৪। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আসমাউল হুসনা বা আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ বর্ননা করুণ?
উত্তরঃ- কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে;

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

অর্থ:- আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, নিশ্চই আল্লাহ (সুব:) তা'আলার ৯৯ টি নাম রয়েছে। এক কম একশত নাম। যে ব্যক্তি তা সংরক্ষন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তিনি বেজোর এবং বেজোরকেই তিনি পছন্দ করেন। (বাইহাক্বী: ১০/২৭)

আল্লাহর ৯৯ টি সুন্দরতম নামঃ

(১) الرَّحْمٰنُ যিনি পরম করুনাময়। (২) الرَّحِيمُ অসীম দয়ালু। (৩) المَلِكُ মালিক, অধিপতি। (৪) القُدُّوسُ অতি পবিত্র। (৫) السَّلامُ যিনি সব ত্রুটি থেকে মুক্ত, নিখুত। (৬) المُؤمِنُ পূর্ন বিশ্বস্ত এবং নিরাপত্তাদাতা। (৭) المُهَيْمِنُ সর্বদা পর্যবেক্ষক, স্বাক্ষী। (৮) العَزِيزُ পরম পরাক্রমশালী। (৯) الجَبَّارُ মহা প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত, সমুন্নত। (১০) المُتَكَبِّرُ সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত। (১১) الخَالِقُ সৃষ্টিকর্তা। (১২) البَارِئُ উদ্ভাবক, উদ্ভাবনকারী। (১৩) المُصَوِّرُ আকৃতিদাতা, রূপদাতা। (১৪) الغَفَّارُ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যিনি বারবার ক্ষমা করেন। (১৫) القَهَّارُ অপ্রতিরোধ্য, প্রতাপশালী। (১৬) الوهَّابُ পরমদাতা, মহান দানশীল। (১৭) الرَّزَّاقُ রিযিকদাতা, জীবিকাদাতা। (১৮) الفَتَّاحُ উত্তম ফায়সালাকারী, সূচনাকারী। (১৯) العَلِيمُ সর্বজ্ঞানী। (২০) القابِضُ রিযিক্ব সংযতকারী। (২১) البَاسِطُ রিযিক্ব সম্প্রসারনকারী, প্রচুর রিযিক্ব মঞ্জুরকারী। (২২) الخَافِضُ অবনতকারী, যেহেতু তিনি উদ্ধতদের অবনমিত করেন। (২৩) الرَّافِعُ সু-উচ্চ মর্যাদাশীল। (২৪) المُعِزُّ সম্মানদানকারী। (২৫) المُذِلُّ লাঞ্ছনাকারী। (২৬) السَّمِيعُ সর্বশ্রোতা। (২৭) البصيرُ সর্বদ্রষ্টা। (২৮) الحَكَمُ শ্রেষ্ঠ বিচারক। (২৯) العَدْلُ ন্যায় নিষ্ঠাবান। (৩০) اللَّطِيفُ সুক্ষদর্শী ও দয়ালু। (৩১) الخَبيرُ যিনি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ন সচেতন। (৩২) الحليمُ সর্বাধিক সহিঞ্চু, পরম সহনশীল। (৩৩) العَظِيمُ সবচেয়ে মহান, মহীয়ান। (৩৪) الغَفُورُ পরম ক্ষমাশীল। (৩৫) الشَّكُورُ অধিক কৃতজ্ঞ। (৩৬) العَلِيُّ সমুন্নত, সর্বশ্রেষ্ঠ। (৩৭) الكَبِيرُ সর্ব মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ। (৩৮) الحَفِيظُ হিফাযতকারী। (৩৯) المُقيتُ অতিশয় রাগান্বিত, বিদ্বেষ পোষণকারী (কাফের/মুশরিকদের প্রতি)। (৪০) الحَسِيبُ যিনি যথেষ্ট, হিসাবগ্রহনকারী। (৪১) الجَليلُ মহান মহিমান্বিত। (৪২) الكرِيمُ সবচেয়ে বেশী উদার, মহৎ, দানশীল। (৪৩) الرَّقِيبُ পর্যবেক্ষণকারী, তত্ত্বাবধায়ক। (৪৪) المُجيبُ সাড়াদানকারী। (৪৫) الْوَاسِعُ সৃষ্টির প্রয়োজন পূরনে যিনি যথেষ্ট, প্রাচুর্যময়। (৪৬) الحَكِيمُ প্রজ্ঞাময়,

মহাবিজ্ঞ। (৪৭) الْوَدُودُ অতিশয় প্রেমময়, পরম স্নেহশীল। (৪৮) المَجِيدُ পরিপূর্ন সম্মান এবং মর্যাদার অধিকারী। (৪৯) البَاعِثُ পুনরুত্থানকারী। (৫০) الشَّهِيدُ সর্ব বিষয়ে স্বাক্ষী। (৫১) الحَقُّ যিনি সত্য। (৫২) الْوَكِيلُ সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম বিন্যাসকারী, কর্মবিধায়ক, যার উপরে ভরসা করা হয়। (৫৩) القَوِيُّ অসীম শক্তিশালী, মহা ক্ষমতাবান। (৫৪) المَتِينُ প্রবল পরাক্রান্ত। (৫৫) الْوَلِيُّ অভিভাবক, সাহায্যকারী। (৫৬) الحَمِيدُ প্রশংসিত। (৫৭) المُحصي আয়ত্তে আনয়নকারী, গণনাকারী। (৫৮) المُبدِئُ সূচনাকারী, সুস্পষ্টকারী। (৫৯) المُعِيدُ পূনরুক্তকারী। (৬০) المُحْيِي জিবনদাতা। (৬১) المُمِيتُ মরণদাতা। (৬২) الحَيُّ চিরঞ্জীব। (৬৩) القَيُّومُ সর্বদা রক্ষণাবেক্ষনকারী। (৬৪) الْوَاجِدُ অভাবহীন। (৬৫) الماجد মর্যাদাবান, মহিমান্বিত। (৬৬) الوَاحِدُ এক এবং অদ্বিতীয়। (৬৭) الأَحَدُ এক এবং একমাত্র। (৬৮) الصَّمَدُ স্বয়ংসম্পূর্ন, অমুখাপেক্ষী। (৬৯) القَادِرُ যিনি পূর্ন সক্ষম। (৭০) المُقْتَدِرُ সর্ব শক্তিমান। (৭১) المُقَدِّمُ যিনি প্রথম, এটাও বলা হয় যিনি অগ্রবর্তীকারী। (৭২) المُؤَخِّر যিনি শেষ, এটাও বলা হয় যিনি পশ্চাদবর্তীকারী। (৭৩) الأَوَّلُ তিনিই প্রথম, যার পূর্বে কোন কিছু নেই। (৭৪) الآخِرُ তিনিই শেষ। (৭৫) الظَّاهِرُ সবচেয়ে উচু, সর্বোন্নত। (৭৬) البَاطِنُ সবচেয়ে নিকটে। (৭৭) الوالي শাসক, অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক। (৭৮) المُتعالِ সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান, সমুন্নত এবং সর্বোচ্চ। (৭৯) البَرُّ অত্যন্ত সদাশয় এবং দয়াশীল, কৃপাময়। (৮০) التَّوَّابُ তাওবাহ কবুলকারী। (৮১) المُنتَقِمُ প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৮২) العَفُوُّ পাপমোচনকারী, ক্ষমাকারী। (৮৩) الرَّؤوفُ অত্যন্ত দয়ার্দ্র। (৮৪) مَالِكُ المُلْكِ সার্বভৌমত্বের অধিকারী। (৮৫) ذُو الجَلالِ والإِكرَامِ অতি উদার, অতি মহান, মহানুভব। (৮৬) المُقْسِطُ ন্যায় বিচারক। (৮৭) الجَامِعُ সমন্বয়কারী। (৮৮) الغَنِيُّ স্বয়ং সম্পূর্ন যিনি সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত, অভাবমুক্ত, সম্পদশালী। (৮৯) المُغْنِي অভাবমুক্তকারী। (৯০) المَانِعُ বাধাপ্রদানকারী। (৯১) الضَّارُ ক্ষতিকারী। (৯২) النَّافِعُ উপকারকারী। (৯৩) النُّورُ আলো। (৯৪) الهادي

দিশারী। (৯৫) الْبَدِيعُ অভিনব স্রষ্টা। (৯৬) الْبَاقِي অবিচল। (৯৭) الْوَارِثُ চূড়ান্ত এবং স্থায়ী মালিকানার অধিকারী, প্রকৃত উত্তরাধীকারী। (৯৮) الرَّشِيدُ সরল ও সত্য পথের প্রদর্শক। (৯৯) الصَّبُورُ অতি ধর্য্যশীল।

❖ প্রশ্ন-৫। আল্লাহ কোথায়?

উত্তরঃ- আল্লাহ সুবঃ আসমানের উপরে আরশে সমাসীন। আল্লাহ সুবঃ বলেন- الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى "তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন" (সূরা, আত্ ত্বাহা ২০ঃ৫) মু'আবিয়াহ ইবনে আল হাকাম বলেন,

فَقَالَ لَهَا « أَيْنَ اللَّهُ ». قَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ « مَنْ أَنَا ». قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ « أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ » (صحيح مسلم)

তিঁনি (সঃ) তখন তাকে (দাসীকে) জিজ্ঞাস করলেন, আল্লাহ কোথায়? এবং সে উত্তর দিল, আসমানের উপরে। তারপর তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে? সে উত্তর দিল, আপনি আল্লাহর রাসূল। সুতরাং তিনি বললেন, তাকে মুক্তি দাও, কারণ নিশ্চয়ই সে একজন সত্যিকার বিশ্বাসী। (মুসলিম)

❖ প্রশ্ন-৬। কুরআন-সুন্নাহতে যে এসেছে 'আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' তার মানে কি?

উত্তরঃ- এর মানে এই নয় যে তিনি সত্বাগতভাবে আমাদের সাথে আছেন, বরং তিনি আরশে সমাসীন যেমনভাবে তাঁর মর্যাদার সাথে মানায়। তিনি সব দেখেন এবং সব শুনেন। তিনি আমাদের সাথে আছেন শুনা, দেখা জ্ঞান, কর্তৃত্বের মাধ্যমে। তিনি তাঁর বান্দাদের সাথে আছেন তাদের সাহায্য করা, বিজয় দেয়া, বিপদে উদ্ধার করা, সাফল্য দেয়ার মাধ্যমে।

❖ প্রশ্ন-৭। আল্লাহর ইসতিওয়া বা আরশে সমাসীন হওয়া গুনের প্রতি আমরা কিভাবে ঈমান আনব?

উত্তরঃ- এইগুনের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব, কিভাবে সমাসীন এই প্রশ্ন করা বিদ'আত। আল-ইস্‌তিওয়া (الاستواء) গুণটি সাব্যস্ত করতে নিন্মে বর্ণিত বিষয় গুলো লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য।

(১) আল-ইস্‌তিওয়া (আল্লাহ্ তা'আলা স্ব-সত্তায় আরশের উপরে রয়েছেন) এ গুণটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং এর প্রতি ঈমান আনা, কেননা ইহা কুরআন ও হাদীসে একাধিকবার প্রমানিত হয়েছে।

(২) আল-ইস্‌তিওয়া ((الاستواء। গুণটিকে যথাযোগ্য ও পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। আর এর প্রকৃত অর্থ হলোঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আরশের উপরে বিরাজমান রয়েছেন, যেমন তাঁর মহত্বের ও শ্রেষ্টত্বের শোভা পায়।
(৩) আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর বিরাজমান থাকাকে সৃষ্টি জীবের আসন গ্রহণের সাথে উপমা না দেওয়া। কেননা আল্লাহ আরশের মুখাপেক্ষী নন। তিনি আরশের মুহ্‌তাজ নন। কিন্তু সৃষ্টি জীবের সমাসীনতা সম্পূর্ণ সতন্ত্র, সৃষ্টিজীব এর মুহ্‌তাজ বা মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى/١١]

(সৃষ্টি জীবের) কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। আর তিনি সব শুনেন, এবং সব দেখেন। *(সূরা আশ্‌শুরা, আয়াত-১১)*
(৪) আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর বিরাজমানের ধরণ ও পদ্ধতি নিয়ে তর্কে লিপ্ত না হওয়া। কেননা এটা গাইবী (অদৃশ্যের) বিষয়, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানেনা।
(৫) এ গুণটি হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান ও ফলাফল এবং এর প্রভাবের প্রতি ঈমান আনা, আর তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য মহত্ত ও শ্রেষ্টত্ব সাব্যস্ত করা, যা সমগ্র সৃষ্টি হতে তাঁর উর্দ্ধে ও সুউচ্চে (আরশের উপর) অবস্থানই প্রমাণ করে।

❖ প্রশ্ন-৮। আল্লাহ নিরাকার নন এই বিষয়টির প্রমান কি?

উত্তরঃ আল্লাহ নিরাকার এর সমর্থনে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে কোন প্রমান নেই, হাক্ক কোন আলেম থেকেও এর প্রমান নেই। এটি কুরআন-সুন্নাহ বর্জিত একটি ভ্রান্ত আক্বীদাহ। আল্লাহ নিরাকার এটি একটি হিন্দুয়ানী আক্বীদাহ।
কুরআন এবং বহু হাদীসে আল্লাহর চেহারা, হাত, পা, চোখ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু আল্লাহর এসব গুনের কোন সাদৃশ্য বর্ননা করা যাবে না, কোন উপমা দেয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ বলেছেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى/١١]

(সৃষ্টি জীবের) কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। আর তিনি সব শুনেন, এবং সব দেখেন। (সূরা আশ্‌শুরা, আয়াত-১১)

আল্লাহ আরও বলেছেন- فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
"তোমরা আল্লাহর জন্য বিভিন্নরকম উপমা পেশ করো না।" (সূরা, নাহলঃ ৭৪)
তাই ইসলামী আক্বীদাহ হচ্ছে- আল্লাহর আকার তুলনাহীন।

▪ **চেহারাঃ** কুরাআনে চৌদ্দটি আয়াতে আল্লাহর চেহারার উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন- وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ "তোমার জালাল এবং ইকরামের অধিকারী রবের চেহারাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।" (সূরা, আর রহমান ৫৫ঃ২৭)

▪ **চোখঃ** অনেক আয়াতে আল্লাহর চোখের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ সুবঃ বলেন- وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا "আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার চোখের সামনে আছেন।" (সূরা আততুর ৫২ঃ৪৮)

রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

عَنْ نَافِعٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيْ النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (صحيح البخاري)

"আল্লাহ তায়ালা টেরা নন, অথচ মাসীহুদ দাজ্জালের ডানচোখ টেরা। (বুখারী)

▪ **হাতঃ** তেরটি আয়াতে আল্লাহর হাতের উল্লেখ এসেছে, যেমন তিনি বলেন,

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

"তোমাকে কিসে বাধা দিল তাকে সিজদা করতে, যাকে আমি আমার দুই হাতে সৃষ্টি করেছি। (সূরা, ছোয়াদ ৩৮ঃ৭৫)

▪ **পাঃ** আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্নিত, রাসুল (সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط

"জাহান্নাম ততক্ষন ভরবে না যতক্ষন না যতক্ষন না আল্লাহ তাঁর পা জাহান্নামে রেখে দেবেন। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে, ব্যাস, ব্যাস (যথেষ্ট হয়েছে)।" (বুখারী ও মুসলিম)

ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান

❖ প্রশ্ন-১। ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনার বিধান কি?

উত্তরঃ- ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনা, ঈমানের ছয়টি রুক্নের দ্বিতীয় রুক্ন বা স্তম্ভ। ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কোন ব্যক্তির ঈমান সঠিক ও গ্রহণ যোগ্য হবেনা। সম্মানিত ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব হওয়ার উপর সকল মুসলমান একমত। যারা সকল ফিরিশ্তাদের অথবা তাঁদের আংশিকের অস্তিত্বকে যাদের কথা আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন, অস্বীকার করবে তারা কুফুরী করলো, এবং কুরআন, হাদীস ও ইজমার বিরোধিতা করলো।

❖ প্রশ্ন-২। সংক্ষিপ্ত ভাবে ফিরিশতাদের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?

উত্তরঃ- ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনার পদ্ধতি হচেছ ফিরিশ্তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত ভাবে ঈমান আনা। সংক্ষিপ্ত ঈমান নিম্নের বিষয় গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে-

প্রথমঃ তাদের অস্তিত্বের স্বীকার করা, তারা আল্লাহর সৃষ্টি জীব, আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহ্ তাদেরকে যে সম্মান দিয়েছেন, তাদেরকে সেই সম্মান দেওয়া। তারা আল্লাহর বান্দা বা দাস। আল্লাহ্ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, তাদের মর্যাদাকে উঁচু করেছেন এবং তাদেরকে নৈকট্য দান করেছেন। আল্লাহ্ তাদেরকে যতটুকু ক্ষমতার মালিক করেছেন, তারা ততটুকু ক্ষমতারই মালিক। তারা তাদের নিজেদের ও অন্যদের লাভ-ক্ষতির মালিক নয়।

❖ প্রশ্ন-৩। ফিরিশতাগন কিসের তৈরী?

উত্তরঃ- আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্তাদের কে নূর হতে সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের সৃষ্টি হলো আদম আলাইহিস্ সালাম এর সৃষ্টির পূর্বে। হাদীসে এসেছেঃ

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

ফিরিশ্তারা নূর হতে, জিনেরা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ হতে, আর আদম (আলাইহিস্ সালাম) সে জিনিস থেকে তৈরী যা তোমাদেরকে (কুরআনে) বর্ণনা করা হয়েছে। (মুসলিম শরীফ)

❖ প্রশ্ন-৪। ফিরিশতাদের সংখ্যা কত?

উত্তরঃ- ফিরিশ্তারা সৃষ্ট জীব, তাদের আধিক্যের জন্যে আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা ছাড়া তাদের সংখ্যা কেহ জানেনা। আকাশে প্রতি চার আংগুল পরিমাণ জায়গায় একেক জন ফিরিশ্তা সিজ্দারত অথবা দন্ডায়মান অবস্থায় রয়েছেন।

সপ্তম আকাশে আল- বায়তুল মা'মুরে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা প্রত্যহ প্রবেশ করছেন। তাদের আধিক্যতার জন্যে দ্বিতীয় বার ফিরে আসার সুযোগ পাবেন না। কিয়ামত দিবসে জাহান্নাম উপস্থিত করা হবে, তার সত্তর হাজার লাগাম হবে। প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা হবে, তারা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেনঃ জাহান্নাম কে নিয়ে আসা হবে, সে দিন তার সত্তর হাজার লাগাম হবে। আর প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা হবে। (*মুসলিম*)

এখানে ফিরিশ্‌তাদের এক বিরাট সংখ্যা প্রকাশিত হল। যারা প্রায় (৭০০০০×৭০০০০=) ৪৯০ কোটি জন ফিরিশ্‌তা তবে বাকী ফিরিশ্‌তাদের সংখ্যা কত হতে পারে?

❖ প্রশ্ন-৫। বিশেষ কিছু ফিরিশতার নাম উল্লেখ করুন?

উত্তরঃ- কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জন্যে যে, সকল ফিরিশ্‌তাদের নাম উল্লেখ্য করেছেন, তাদের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন তিনজন।

(১) জিব্‌রীলঃ তাকে জিবরাঈল ও বলা হয়। তিনিই রুহুল কুদ্দস, যিনি ওয়াহী নিয়ে রাসূলগণের নিকট অবতরণ হন।

(২) মিকাঈলঃ তাকে প্রশান্তি বলা হয়। বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বে নিয়োযিত, যা জমির জীবিকা স্বরূপ। আল্লাহ্‌ যেখানে বর্ষণের আদেশ দেন সেখানে বর্ষণ পরিচালনা করেন।

(৩) ইস্‌রাফীলঃ তিনি শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছেন। পার্থিব্য জীবন শেষে পারলৌকিক জীবন শুরু হওয়ার ঘোষনা সরূপ, এবং এর দ্বারাই, (মৃত) দেহ সমূহের পুনরুজীবন ঘটবে।

❖ প্রশ্ন-৬। ফিরিশতাদের সিফাত বা গুন বৈশিষ্ট্য কি কি?

উত্তরঃ- ফিরিশ্‌তাদের সিফাত বা বৈশিষ্ট্যঃ ফিরিশ্‌তারা প্রকৃত সৃষ্টি জীব। তাদের প্রকৃত শরীর রয়েছে যা সৃষ্টিগত ও চরিত্র গত গুনে গুনান্বিত, নিন্মে তাদের কিছু গুন বর্ণনা করা হলোঃ

(ক) তাদের সৃষ্টি মহান এবং তাদের শরীর হলো বিশাল আকৃতিরঃ আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ফিরিশ্‌তাদেরকে শক্তিশালী ও বড় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আসমান ও যমিনে যে বড় বড় কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, তারা তার উপযোগী।

(খ) তাদের ডানা রয়েছেঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদের জন্যে দুই, তিন ও চার বা ততোধিক পাখা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেমন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) জিব্‌রীল (আলাইহিস্ সালাম) কে দেখেছিলেন, তার নিজস্ব আকৃতি ছয়শত পাখা বিশিষ্ট অবস্থায়। যা আকাশের প্রান্তভাগ ঢেকে রেখেছিল।

(গ) তাদের পানাহার প্রয়োজন হয় নাঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা পানাহারের মুহ্‌তাজ বা মুখাপেক্ষী নন। তারা বিবাহ করেননা, সন্তান ও হয়না।

(ঘ) ফিরিশ্‌তারা অন্তর বিশিষ্ট ও জ্ঞানীঃ তাঁরা আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন, এবং আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলেছেন। তারা আদম ও অন্যান্য নাবীদের সাথে ও কথা বলেছেন।

(ঙ) তাদের নিজস্ব আকৃতি ছাড়া অন্য আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছেঃ আল্লাহ স্বীয় ফিরিশ্‌তাদেরকে পুরুষ মানুষের আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

(চ) ফিরিশ্‌তাদের মৃত্যুবরণঃ মালাকুল মাউত বা জান কবজকারী ফিরিশ্‌তা সহ সকল ফিরিশ্‌তারা কিয়ামত দিবসে মৃত্যু বরণ করবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে যে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সে দায়িত্ব পালন করার জন্য পুনরুত্থান করা হবে।

(ছ) ফিরিশ্‌তাদের ইবাদাতঃ ফিরিশ্‌তারা আল্লাহর অনেক ধরণের ইবাদাত করেন। সলাত, দু'আ, তাস্‌বীহ রুকু, সিজদাহ, ভয়-ভীতি ও ভালবাসা ইত্যাদি। তাদের ইবাদাতের বর্ণনা নিরুপঃ (১) তারা ক্লান্তহীন ভাবে আল্লাহর ইবাদাতে সর্বদায় রত থাকেন। (২) তারা একনিষ্টতার সাথে আল্লাহ তা'আলার জন্যে ইবাদাত করেন। (৩) তারা নাফারমানী বর্জন করে সর্বদায় আনুগত্যে মাশগুল থাকেন, কেননা তারা মা'সুম অর্থাৎ নাফারমানী ও পাপাচার হতে মুক্ত। (৪) অধিক ইবাদাত করার সাথে সাথে আল্লাহর জন্য বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করা।

❖ প্রশ্ন-৭। ফিরিশতাদের কর্মসমূহ কি কি?

উত্তরঃ- ফিরিশ্‌তারা অনেক বড় বড় কাজ সম্পাদন করেন, যার দায়িত্ব আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন। সে কাজ গুলো নিম্নরূপঃ

(১) আরশ বহন করা। (২) রাসূলগণের উপর ওয়াহী অবতীর্ণের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিশ্‌তা। (৩) জান্নাত ও জাহান্নামের পাহারাদার। (৪) উদ্ভিদ, বৃষ্টি বর্ষণ ও বাদল পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত। (৫) পাহাড়-পর্বতের দায়িত্ব প্রাপ্ত। (৬) শিংগায় ফুৎকারের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিশ্‌তা। (৭) আদম সন্তানের কর্ম লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত। (৮) আদম সন্তানকে হিফাজত করার দায়িত্ব প্রাপ্ত। আল্লাহ্ যখন আদম সন্তানের উপর কোন কাজ নির্ধারণ করেন, তখন তারা তাকে পরিত্যাগ করেন, অতঃপর আল্লাহ তাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছিলেন, তা

পতিত হয় বা সংঘটিত হয়। (৯) মানুষের সাথে থাকার ও তাদেরকে কল্যানের দিকে আহ্বানের দায়িত্ব প্রাপ্ত। (১০) জরায়ুতে বীর্য সঞ্চার, মানুষের (দেহে) অন্তরে আত্মা প্রক্ষেপ, তার রিযিক, কর্ম ও সৌভাগ্য বা দূর্ভাগ্য লিপিবদ্ধে দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিশ্‌তা। (১১) মৃত্যুর সময় আদম সন্তানের আত্মা কবজ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিশ্‌তা। (১২) মানুষকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ এবং উত্তর অনুযায়ী শান্তি বা শাস্তি প্রদানে দায়িত্ব প্রাপ্ত। (১৩) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর তাঁর উম্মতের সালাম পৌঁছানোর দায়িত্ব প্রাপ্ত। তাই মুসলিম ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর তার সালাম প্রেরণের জন্য তাঁর কাছে (তাঁর কবরের কাছে) ভ্রমণের প্রয়োজন হয় না। উল্লেখিত এ প্রসিদ্ধ কাজ সমূহ ব্যতীত তাদের (ফিরিশ্‌তাদের) আরো অনেক কাজ রয়েছে।

❖ প্রশ্ন-৮। আমাদের প্রতি ফিরিশতাদের কি অধিকার রয়েছে?

উত্তরঃ- আদম সন্তানের উপর ফিরিশ্‌তাদের অধিকারঃ

(ক) তাদের প্রতি ঈমান আনা। (খ) তাদেরকে ভাল বাসা, সম্মান করা, ও তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা। (গ) তাদেরকে গালি দেওয়া, মর্যাদা ক্ষুন্য করা, ও তাদেরকে নিয়ে হাসি রহস্য করা হারাম। (ঘ) ফিরিশ্‌তারা যা অপছন্দ করেন তা হতে দূরে থাকা। কারণ, আদম সন্তানরা যাতে কষ্ট পায়, তারাও তাতে কষ্ট পায়।

❖ প্রশ্ন-৯। ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান আনার সুফল কি?

উত্তরঃ- ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমান আনার সুফল হচ্ছেঃ

(১) ঈমান পরিপূর্ণ হয়। কারণ তাদের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কারো ঈমান পরিপূর্ণ হবেনা। (২) তাদের সৃষ্টি কর্তার মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর শক্তি ও রাজত্বে জ্ঞান অর্জন। কারণ, সৃষ্টিকর্তার, শ্রেষ্ঠত্ব হতে সৃষ্টি জীবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। (৩) তাদের গুনাগুন, তাদের অবস্থা, ও কর্ম জানার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পায়। (৪) আল্লাহ তা'আলা যখন মু'মিনদেরকে ফিরিশ্‌তা দিয়ে হিফাজত করেন, তখন তাদের (মু'মিনদের) শান্তি ও তৃপ্তি অর্জন হয়। (৫) ফিরিশ্‌তাদেরকে ভাল বাসাঃ তাদের ইবাদাত সঠিক পন্থায় হওয়ায় ও মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে। (৬) খারাপ ও নাফারমানী পূর্ণ কাজকে অপছন্দ করা। (৭) আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের গুরুত্ব দেন এই জন্য তাঁর প্রশংসা করা। যেমন আল্লাহ্ ঐ সকল ফিরিশ্‌তাদের কাউকে তাদেরকে (বান্দাদেরকে) হিফাজতের, ও কর্ম লিখার ইত্যাদি কল্যাণ জনক কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন।

কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

❖ **প্রশ্ন-১** । কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার বিধান কি?

উত্তরঃ রাসূলগনের উপর আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনা, ইহা ঈমানের তৃতীয় রুক্ন বা স্তম্ভ। সকল কিতাবের প্রতি ঈমান আনা যা আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) উপর অবতীর্ণ করেছেন, আল্লাহ তা'বারাকা ও তা'আলা সত্যিকার অর্থে কিতাব সমূহের মাধ্যমে কথা বলেছেন। এবং তা (আল্লাহর পক্ষহতে) অবতীর্ণ, মাখলুক বা সৃষ্ট নয়, আর যে ব্যক্তি তা (কিতাব সমূহ) অথবা তাঁর কিছুকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا [النساء/١٣٦]

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর যে গুলো অবতীর্ণ করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশ্তাদের উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর, এবং রাসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করবেনা, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে। *(সূরা আন্-নিসা, আয়াত-১৩৬)*

❖ **প্রশ্ন-২** । কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার মূল কথা কি?

উত্তরঃ- এ কথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহর অনেক কিতাব রয়েছে। যা তিনি তাঁর রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) উপর নাযিল করেছেন। আর তা সত্যিকার অর্থে তাঁর (আল্লাহর) বাণী। আর তা হল জ্যোতি ও হিদায়াত। আর নিশ্চয় এ কিতাব সমূহের মধ্যে যা রয়েছে এবং যা ছিল তা সত্য ও ন্যায় সিদ্ধ, এর অনুসরণ করা ও তদানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এ কিতাব সমূহের সংখ্যা কেউ জানেনা।

❖ **প্রশ্ন-৩** । এসব কিতাবের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা এবং তা অবতীর্ণ করার পিছনে হিক্‌মাত বা রহস্য কি?

উত্তরঃ- প্রথমতঃ যাতে রাসূল (আলাইহিস সালাম) এর উপর অবর্তীণ কিতাব তাঁর উম্মাতের জন্য জ্ঞান কোষ স্বরূপ হয়। ফলে তারা তাদের দ্বীন সম্পর্কে জানার জন্যে এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

দ্বিতীয়তঃ যাতে রাসূল (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর অবর্তীন কিতাব তাঁর উম্মাতের প্রত্যেক মতনৈক্য পূর্ণ বিষয়ে ইনসাফ ভিত্তিক বিচারক হয়।

তৃতীয়তঃ যাতে অবর্তীণ কিতাব রাসূল (আলাইহিস্ সালাম) এর ইন্তেকালের পর দ্বীন সংরক্ষণকারী হিসাবে দাঁড়াতে পারে, স্থান ও কালের যতই দুরুত্ব হোকনা কেন। যেমন-আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর (পরবর্তী) দাওয়াতের অবস্থা।

চতুর্থতঃ যাতে এ অবর্তীণ কিতাব সমূহ আল্লাহর পক্ষহতে হুজ্জাত (পক্ষ বিপক্ষের দলীল) স্বরূপ হয়। যেন সৃষ্টি জীব এর (কিতাব সমূহের) বিরোধিতা করা এবং এর আনুগত্য হতে বের হয়ে যাওয়ার সমর্থ্য না রাখে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ [البقرة/٢١٣]

অর্থঃ সকল মানুষ একই জাতি সত্ত্বার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাবীদেরকে পাঠালেন সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। (সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-২১৩)

❖ প্রশ্ন-৪। কিতাব সমূহের প্রতি কিভাবে ঈমান আনয়ন করতে হবে?

উত্তরঃ- এ বিশ্বাস করবে (ঈমান আনা) যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণের উপর অনেক কিতাব অবর্তীণ করেছেন। আল্লাহ কুরআন কারীমে যে সকল কিতাবের নাম উল্লেখ্য করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনা। তা হতে আমরা জেনেছি-কুরআন, তাওরাত, যাবুর, ইনজীল, এবং ইব্রাহীম, ও মূসা এর প্রতি অবতীর্ণ পুস্তিকা সমূহ (আলাইহিমুস সালাম)। আরো ঈমান আনা যে, ঐসকল কিতাব ছাড়াও আল্লাহর অনেক কিতাব রয়েছে, যা তাঁর নাবীগণের উপর অবর্তীণ করেছেন। আর আল্লাহ ছাড়া ঐ সকল কিতাবের নাম ও সংখ্যা কেউ জানেনা। এ কিতাব গুলো অবর্তীণ হয়েছে যাবতীয় সৎকর্ম ও ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিমিত্তে সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁর তাওহীদ (এককত্ব) বাস্ত বায়ন এবং পৃথিবীতে শির্‌ক ও অন্যায়-অনাচার দূরীভূত করার জন্য।

❖ প্রশ্ন-৫। আল কুরআনের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?

উত্তরঃ- আর আল-কুরআনের প্রতি ঈমান আনা হলোঃ তা (অন্তরে ও মুখে) স্বীকৃতি দেওয়া এবং কুরআনে যা রয়েছে তা অনুসরণ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

তোমরা অনুস্বরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুস্বরণ করোনা। (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত-৩)

পূর্ববতী কিতাবের চেয়ে কুরআনের কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ

- আল-কুরআন স্বীয় শব্দ, অর্থ এবং ওতে যে জ্ঞান ও পার্থিব তথ্য রয়েছে তা সর্ব বিষয়ে এক অলৌকিক শক্তি।
- আল-কুরআন সর্ব শেষ আসমানী কিতাব, কুরআনের মাধ্যমে আসমানী কিতাবের সমাপ্তি ঘটেছে।
- সকল প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন হতে আল্লাহ কুরআনকে হেফাজত করবেন। ইহা অন্যান্য কিতাব হতে স্বতন্ত্র কেননা সে সব কিতাবে বিকৃতি ও পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটেছে।
- আল-কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন ও সংরক্ষণকারী।
- কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবের রহিতকারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [يوسف/١١١]

এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্ত যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হিদায়াত। *(সূরা ইফসুফ, আয়াত-১১১)*

❖ প্রশ্ন-৬। পূর্ববর্তী কিতাব সমূহ থেকে কিভাবে সংবাদ গ্রহণ করতে হবে?

উত্তরঃ- আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি যে, পূর্ববর্তী কিতাবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের নিকটে ওয়াহীর মাধ্যমে যে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য, তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এর অর্থ এ নয় যে, বর্তমানে আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের) নিকট যে কিতাব রয়েছে তা গ্রহণ করবো। কারণ তা বিকৃত করা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের নিকট যে ভাবে অবতীর্ণ করেছেন সে ভাবে নেই।

কুরআনে যে সকল বিধান রয়েছে তা মেনে চলা আমাদের অপরিহার্য। তবে পূর্ববর্তী কিতাবে যা রয়েছে তা নয়। কারণ আমরা দেখবো পূর্ববর্তী কিতাবে যে

বিধান রয়েছে তা যদি আমাদের শরিয়াতের পরিপন্থী হয়, তবে আমরা তা আমল করবো না, তা বাতিল এ জন্যে নয়, বরং তা সে সময় সত্য ছিল, এখন তা আমল করা আমাদের উপর অপরিহার্য নয়। কারণ তা আমাদের শরীয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর যদি তা আমাদের শরীয়াতের অনুরূপ হয়, তবে তা সত্য বলে বিবেচিত হবে। আমাদের শরীয়াত তা সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى [الأعلى/١٦-١٩]

"বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে, ইব্রাহীম ও মূসার কিতাব সমূহে।" *(সূরা আল-আ'লা, আয়াত-১৬-১৯)*

❖ প্রশ্ন-৭। কুরআন ও হাদীসে যে সকল আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ হয়েছে তা কি কি?

উত্তরঃ- কুরআন ও হাদীসে যে সকল আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ হয়েছে তা হলো-

● **কুরআন কারীমঃ** কুরআন হল আল্লাহর বানী যা তিনি শেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর নাযিল করেছেন। কুরআন সর্ব শেষ অবতীর্ণ কিতাব। আল্লাহ কুরআনকে বিকৃতি ও পরিবর্তন হতে হিফাজত করার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন, এবং সকল আসমানী কিতাবের রহিতকারী করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر/٩]

অর্থঃ আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। *(সূরা আল-হিজর, আয়াত-৯)*

● **তাওরাতঃ** তাওরাত ঐ কিতাব যাকে আল্লাহ মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর নূর (জ্যোতি) ও হিদায়াত স্বরূপ নাযিল করেছিলেন। বানী ইসরাঈলের নাবী ও আলেমগণ এর দ্বারা ফায়সালা করতেন। সুতরাং মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব তাওরাত এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব, বর্তমান তথা কথিত ইয়াহুদীদের হাতে বিকৃত তাওরাতের প্রতি নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ [المائدة/٤٤] অর্থঃ আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি-----। *(সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত-৪৪)*

• **ইঞ্জীলঃ** ইঞ্জীল ঐ কিতাব যা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর নাযিল করেছিলেন, যা পুর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী। সুতরাং ঐ ইঞ্জীলের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব, যা সঠিক মূলনীতি সহ আল্লাহ ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর নাযিল করেছিলেন। খৃষ্টানদের নিকট বিক্রিত ইঞ্জীল সমূহে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ [المائدة/٤٦] আমি তাকে (ঈসাকে) ইঞ্জীল প্রদান করেছি---।

(সূরা আল-মায়িদাহ :৪৬)

তাওরাত ও ইঞ্জীলে যা রয়েছে তন্মধ্যে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রিসালাতের সুসংবাদ রয়েছে।

• **যাবুরঃ** যাবুর ঐ কিতাব যা আল্লাহ্ দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর নাযিল করেছিলেন। সুতরাং ঐ যাবুরের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব যা আল্লাহ দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর নাযিল করেছিলেন। সে যাবুর নয় যা ইয়াহুদীরা বিকৃত করে ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا [النساء/١٦٣] অর্থঃ আর দাউদকে দান করেছি যাবুর। *(সূরা আন-নিসা, আয়াত১৬৩)*

• **ইব্রাহীম ও মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সুহুফ বা পুস্তিকা সমূহঃ** তা ঐ সকল পুস্তিকা যা আল্লাহ ইব্রাহীম ও মূসা (আলাইহিস্ সালাম) কে দিয়েছিলেন। কুরআন ও হাদীসে যা উল্লেখ্য হয়েছে তা ছাড়া এ সকল পুস্তিকা নিরুদ্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى [الأعلى/١٨، ١٩]

অর্থঃ " নিশ্চয় এটা আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে। ইবরাহীম ও মূসার সহীফা সমূহে।" (সূরা আল-আ'লা, আয়াত- ১৮-১৯)

রাসুলগনের প্রতি ঈমান

❖ প্রশ্ন-১ । রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার বিধান কি?

উত্তরঃ- রাসূল (আলাইহিমুস্ সালাম) দের প্রতি ঈমান আনা- ইহা ঈমানের রুক্ন সমূহের একটি রুক্ন, যার প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কোন ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণ হবেনা । যে ব্যক্তি কোন রাসূলকে মিথ্যা জানল, সে যেন অস্বীকার করল যা সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا [النساء/١٥٠، ١٥١]

অর্থঃ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অস্বীকার করি এবং এরাই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায় । প্রকৃত পক্ষে এরাই সত্য অস্বীকারকারী । আর যারা সত্য অস্বীকার কারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমান জনক শাস্তি । (সূরা আন-নিসা, আয়াত-১৫০-১৫১)

❖ প্রশ্ন-২ । নাবী-রাসুলদের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?

উত্তরঃ- এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর অনেক রাসূল রয়েছে যাদেরকে তিনি তাঁর রিসালাত প্রচার করার জন্য নির্বাচন করেছেন । যারা তাঁদের অনুসরণ করবে, তারা হিদায়াত (সঠিক পথ) পাবে । আর যারা তাঁদের অনুসরণ করবেনা তারা পথ ভ্রষ্ট হবে । আল্লাহ তাদের নিকট যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রচার করেছেন । তারা অর্পিত আমানত আদায় করেছেন, এবং স্বীয় উম্মাতকে কল্যাণের উপদেশ দিয়েছেন । তাঁরা আল্লাহর পথে যথাযথ জিহাদ করেছেন ।

যা সহ প্রেরিত হয়েছেন তার কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও গোপন না করে স্বজাতির উপর হুজ্জাত (পক্ষ-বিপক্ষের দলীল) কায়েম করেছেন । আল্লাহ যে সকল রাসূলদের নাম আমাদের কাছে উল্লেখ্য করেছেন, আর যাদের নাম উল্লেখ্য করেন নাই তাদের সকলের প্রতি আমরা ঈমান আনবো । প্রত্যেক রাসূলই তাঁর পূর্ববর্তী রাসূল আগমণের সুসংবাদ দিতেন, এবং পরবর্তী রাসূল পূর্ববতী রাসূলের সত্যায়ন করতেন ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة/١٣٦]

অর্থঃ তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, এবং তদীয় বংশ ধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নাবীকে তাঁদের পালন কর্তার পক্ষ হতে যা দান করা হয়েছে, তৎসমূদয়ের উপর। আমরা তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করিনা। আর আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী। (সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-১৩৬)

❖ প্রশ্ন-৩। নবুওয়াতের হাকীকাত কি?

উত্তরঃ- নবুওয়াত হলোঃ স্রষ্টা (আল্লাহ) ও সৃষ্টি জীবের (বান্দার) মাঝে তাঁর শরিয়াত প্রচারের মাধ্যম। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নবুওয়াতের জন্য মনোনীত করেন এবং নবুওয়াত দিয়ে সম্মানিত করেন। নবুওয়াত (আল্লাহ কর্তৃক) প্রদত্ত, কারো অর্জিত নয়, অধিক ইবাদাত বা আনুগত্যের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। কোন নাবীর ইচ্ছায় বা তাঁর চাওয়ার মাধ্যমে ও আসেনা। ইহা শুধু মাত্র মহান আল্লাহর নির্বাচন ও মনোনয়ন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [الحج/٧٥]

আল্লাহ ফিরিশ্‌তা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা আল-হাজ্ব, আয়াত-৭৫)

❖ প্রশ্ন-৪। নাবী-রাসূলদের কেন পাঠানো হয়েছে?

উত্তরঃ- রাসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) প্রেরণের হিক্‌মাত বা রহস্য নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ বান্দাদেরকে বান্দার ইবাদাত করা হতে মুক্ত করে বান্দার প্রতিপালকের (আল্লাহর) ইবাদাতে নিয়ে যাওয়া এবং সৃষ্টিজীবের দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্বীয় প্রতিপালকের (আল্লাহর) স্বাধীন ইবাদাতের পথ দেখানো। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ [الأنبياء/١٠٧] আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। (সূরা আল-আম্বিয়া:১০৭)

দ্বিতীয়তঃ যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্যের সাথে (মানুষকে) পরিচয় করা। সে উদ্দেশ্য হলো তাঁর একত্ববাদ বিশ্বাস ও ইবাদাত করা। ইহা এক মাত্র রাসূলগণের মাধ্যমে জানা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦]

আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগূত (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত) থেকে নিরাপদ থাক। *(সূরা আন-নহল, আয়াত-৩৬)*

তৃতীয়তঃ রাসূলগণ প্রেরণের মাধ্যমে মানুষের উপর হুজ্জাত (পক্ষ-বিপক্ষের দলীল) প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا [النساء/١٦٥]

সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে, আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আন-নিসা আয়াত-১৬৫)

চতুর্থতঃ কিছু অদৃশ্যের বিষয় বর্ণনা করা, যা মানুষ তাদের জ্ঞান দ্বারা অনুভব করতে পারে না। যেমন-আল্লাহর নাম সমূহ ও তাঁর গুনসমূহ এবং ফিরিশ্‌তাদের ও শেষ দিবস সম্পর্কে জানা ইত্যাদি।

পঞ্চমতঃ যাতে তাঁরা (রাসূলরা) অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ হয় কেননা আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম চরিত্রে পূর্ণ করেছেন। এবং তাঁদেরকে সংশয় ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে মুক্ত রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب/٢١]

তোমাদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যে উত্তম আদর্শ-রয়েছে। *(সূরা আল-আহ্‌যাব, আয়াত-২১)*

ষষ্ঠতঃ আত্ম শুদ্ধি ও পবিত্র করণ এবং আত্ম বিনষ্টকারী হতে সর্তক-সাবধান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [الجمعة/٢]

তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াত সমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষাদেন কিতাব ও হিক্‌মাত। *(সূরা আল-জুমু'আহ-আয়াত-২)*

❖ প্রশ্ন-৫ । রাসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) দায়িত্ব সমূহ কি কি?

উত্তরঃ- রাসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে, তা নিম্নে বর্ণিত হলঃ

- শরীয়াত প্রচার করাঃ- মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদাত হতে মুক্ত হওয়ার আহ্বান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا [الأحزاب/٣٩]

তাঁরা (নাবীগণ) আল্লাহর রিসালাত প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। *(সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত-৩৯)*

- দ্বীনের অবতীর্ণ বিধান বর্ণনা করাঃ- আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل/٤٤]

আপনার কাছে আমি উপদেশ ভান্ডার (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐ সব বিষয় বিবৃত করেন, যে গুলো তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে। *(সূরা আন-নাহাল, আয়াত-৪৪)*

- উম্মাতকে কল্যাণের পথ প্রদর্শণ ও অকল্যাণ হতে সতর্ক সাবধান করা, এবং তাদেরকে পূণ্যের সুসংবাদ ও তাদেরকে শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ [النساء/١٦٥] رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। *(সূরা আন-নিসা, আয়াত-১৬৫)*

- মানুষকে কথায় ও কাজে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আদর্শবান করে তুলা।
- আল্লাহর শরীয়াত বান্দাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ণ করা।
- রাসূলগণের (আলাইহিস্ সালাম) স্বীয় উম্মাতের বিপক্ষে শেষ দিবসে এ স্বাক্ষ্য দেওয়া যে তাঁরা তাদের নিকট স্পষ্ট ভাবে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছায়েছেন।

❖ প্রশ্ন-৬ । ইসলাম সকল নাবীদের দ্বীন ছিল তার প্রমান কি?

উত্তরঃ- ইসলাম সকল নাবী ও রাসূলগণের দ্বীন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ [آل عمران/١٩]

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য দ্বীন বা দ্বীন একমাত্র ইসলাম। (সূরা-আলে-ইমরান, আয়াত-১৯)

তাঁরা সকলেই এক আল্লাহর ইবাদাত করার দিকে, এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত বর্জন করার আহবান জানাতেন। যদি ও তাদের শরীয়াত ও বিধি-বিধান ভিন্ন রকম ছিল, কিন্তু তাঁরা সকলেই মূলনীতীতে একমত ছিলেন, তা হলো তাওহীদ বা আল্লাহর এককত্ব। নাবী (সাঃ) বলেনঃ

الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلاَّتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ

নাবীরা (আলাইহিমুস্ সালাম) একে অপরে বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন, তাদের দ্বীন একটাই..। *(বুখারী)*

❖ প্রশ্ন-৭। রাসূলগণ মানুষ, তাঁরা "গাঈব" জানেন না তার প্রমান কি?

উত্তরঃ- ইলমে গাইব জানা উলুহীয়াতের (আল্লাহর) বৈশিষ্ট, নাবীগণের গুণ নয়। কারণ তাঁরা অন্যান্য মানুষের মত মানুষ। তাঁরা পানাহার করেন, বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হন, নিদ্রা যান, অসুস্থ হন ও ক্লান্ত হন। আল্লাহ তাঁদেরকে (রাসূলদেরকে ইলমে গাইব হতে) যা অবগত করান তা ব্যতীত কোন ইলমে গাইব জানেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

{قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}

অর্থ:- বল, 'আমি আমার নিজের কোন উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমিতো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে'। (সুরা আ'রাফ: ১৮৮)

{وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [الأنعام: ٥٩]

অর্থ:- আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে। আর কোন পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন এবং যমীনের অন্ধকারে কোন দানা পড়ে না, না কোন ভেজা এবং না কোন শুষ্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে। (সুরা আনআম: ৫৯)

{وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ} [يونس: ٢٠]

অর্থ:- আর তারা বলে, 'তাঁর রবের পক্ষ থেকে তার উপর কোন নিদর্শন কেন নাযিল করা হয় না'? বল, 'গায়েবের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই। অতএব তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রয়েছি'। (সুরা ইউনুস: ২০)

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا [الجن/٢٦، ٢٧]

তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরন্ত তিনি অদৃশ্যের বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রেও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন। (সূরা আল-জ্বিন, আয়াত-২৬-২৭)

আমাদের নবী (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে জেনে বলেন;

{ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} [هود: ٤٩]

অর্থ:- এগুলো গায়েবের সংবাদ, আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে তা জানাচ্ছি। ইতিঃপূর্বে তা না তুমি জানতে এবং না তোমার কওম। সুতরাং তুমি সবর কর। নিশ্চয় শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য। (সুরা হুদ: ৪৯)

{ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ} [يوسف: ١٠٢]

অর্থ:- এগুলো গায়েবের সংবাদ, যা আমি তোমার কাছে ওহী করছি। তুমি তো তাদের নিকট ছিলে না যখন তারা তাদের সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিল অথচ তারা ষড়যন্ত্র করছিল। (সুরা ইউসুফ: ১০২)

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: ٥٢]

অর্থ:- অনুরূপভাবে (উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে) আমি তোমার কাছে আমার নির্দেশ থেকে 'রূহ'কে ওহী যোগে প্রেরণ করেছি। তুমি জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে আলো বানিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার

বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি। আর নিশ্চয় তুমি সরল পথের দিক নির্দেশনা দাও। (সুরা শু'রা: ৫২) আল্লাহ (সুব:) বলেন;

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى }

অর্থ:- আর সে মনগড়া কথা বলে না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়। (সুরা নজম: ৩, ৪)

{ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ } [آل عمران: ٤٤]

অর্থ:- এটি গায়েবের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠাচ্ছি। আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের দায়িত্ব নেবে? আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা বিতর্ক করছিল । (সুরা আলে ইমরান: ৪৪)

...... فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا (صحيح البخاري)

অর্থ:- .....অতপর ওরাক্বা রাসুল (সাঃ) কে বলল, এই হচ্ছে জিব্রাইল (আঃ) যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসা (আঃ) এর কাছে আসত। আফসোস যদি আমি জিবিত থাকতাম যখন তোমার জাতি তোমাকে বের করে দিবে। তখন রাসুল (সাঃ) বললেন, তারা কি আমাকে বের করে দেবে? তখন ওরাক্বা বলল, হ্যাঁ! তুমি যা নিয়ে এসেছ তা নিয়ে যে কেউ এসেছে তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে। তোমার সেই দিন গুলোকে যদি আমি পেতাম তাহলে আমার সর্ব শক্তি ব্যয় করে তোমাকে সহযোগিতা করতাম। (বুখারী ৩)

রাসুল (সাঃ) যদি গায়েব জানতেন তাহলে রাসুল (সাঃ) কেন বললেন, আমাকে কি তারা বের করে দেবে? এতেই বুঝা যায় রাসুল (সাঃ) গায়েব জানতেন না। তবে আল্লাহ যতটুকু জানাতেন ততটুকুই জানতেন।

❖ প্রশ্ন-৮। রাসূলগণ মা'সূম বা নিস্পাপ ছিলেন তার প্রমান কি?

উত্তরঃ- আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাত প্রদান ও প্রচার করার জন্য তাঁর সৃষ্টি জীব হতে উত্তম জাতীকে নির্বাচন করেছেন। যারা সৃষ্টিগত ও চরিত্র গত দিক হতে পরিপূর্ণ, আল্লাহ তাঁদেরকে কবীরাহ্ গুনাহ হতে নিরাপদে রেখেছেন। সকল ত্রুটি হতে তাঁদেরকে মুক্ত করেছেন। যাতে তাঁরা আল্লাহর ওয়াহী স্বীয় উম্মাতের

নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হন। আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর (আল্লাহর) রিসালাত প্রচারের ব্যাপারে যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে তাঁরা যে মা'সূম তা সর্বজন সিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا [الأحزاب/٣٩]

তাঁরা (নাবীগণ) আল্লাহর রিসালাত প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন, তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। (সূরা আল-আহ্যাব:৩৯)

যখন তাঁদের কারো পক্ষ হতে এমন কোন ছোট পাপ কর্ম প্রকাশিত হয় যা তাবলীগের (দ্বীন প্রচারের) সাথে সর্ম্পকৃত নয়। নিশ্চয় তখন তা তাঁদের নিকট বর্ণনা করা হবে। আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ ও তাঁর দিকে ধাবমান হওয়ার সাথে সাথেই মনে হবে যেন (এই পাপ) তাঁদের কাছ থেকে প্রকাশ পায় নাই, এবং এর বিনমিয়ে তাঁরা তাঁদের পূর্বের মর্যাদার চেয়ে আরো উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ তাঁর নাবীদেরকে (আলাইহিমুস্ সালাম) পূর্ণ সৎ চরিত্রে ও ভাল গুণে বিশেষিত করেছেন। এবং তাঁদের মান মর্যাদা সুউচ্চ অবস্থান ক্ষুন্ন করে এমন সকল জিনিস হতে তাঁদেরকে আল্লাহ পুত-পবিত্র রেখেছেন।

❖ প্রশ্ন-৯। নাবী ও রাসূলগণের সংখ্যা কত এবং তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারা?

উত্তরঃ- রাসূলগণের সংখ্যা তিন শত দশের কিছু বেশী প্রমাণিত হয়েছে। নাবী (সাঃ) কে যখন রাসূলগণের সংখ্যা সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেনঃ

عن أبي ذر رضي الله عنه قال :......... يا رسول الله كم النبيون ؟ قال : مائة ألف و أربعة و عشرون ألف نبي قلت : كم المرسلون منهم ؟ قال : ثلاث مائة و ثلاثة عشر

অর্থঃ আবু যর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন....... আমি রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম নবীগনদের সংখ্যা কত? তিঁনি বললেন, একলক্ষ চব্বিশ হাজার। আমি বলাল; রাসুলগনের সংখ্যা কত? তিঁনি বললেন, তিনশত পনের। (মুসতাদরাকে হাকিম)

আর নাবীদের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী। আল্লাহ তাঁদের কারোও কথা তাঁর কিতাবে আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন, আর কারোও কথা বর্ণনা করেন নাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন;

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ} [غافر: ٧٨]

অর্থ:- আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে কারো কারো কাহিনী আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি আর কারো কারো কাহিনী তোমার কাছে বর্ণনা করিনি। (সুরা গাফির: ৭৮)

আল্লাহ তাঁর কিতাবে পঁচিশ জন নাবী ও রাসূলের নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ নাবী ও রাসুলদের কাউকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। রাসূলগণের মধ্যে যারা اولوالعزم "উলুলআয্ম" তাঁরা সর্ব উত্তম। তাঁরা হলেন নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা, ঈসা, ও আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ)।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব শেষ নাবী, মুত্তাকীনদের ইমাম, আদম সন্তানের সরদার। নাবীরা যখন একত্রিত হন তখন তিনি তাঁদের ইমাম। মর্যাদার দিক দিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরে যিনি তিনি হলেন ইব্‌রাহীম খালীলুর রহমান (আলাইহিস্ সালাম) সুতরাং (আল্লাহর) দু'বন্ধু-মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) উলুল আযমদের সর্বশ্রেষ্ঠ। অতঃপর তিন জন (নূহ, মূসা ও ঈসা) সর্বশ্রেষ্ঠ (অন্য সব নাবীদের চেয়ে)।

❖ প্রশ্ন-১০। নাবীদের (আলাইহিমুস্ সালাম) معجزة মু'জিযাহ্ কি?

উত্তরঃ- আল্লাহ্ তাঁর রাসূলদের সহযোগিতা করেছেন বড় বড় নিদর্শন ও উজ্জ্বল মু'জিযার (অলৌকিক শক্তির) দ্বারা। যাতে হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা প্রয়োজন সাধন হয়। যেমন- কুরআন কারীম, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, লাঠি ভয়ানক সাঁপে পরিণত হওয়া, ইত্যাদি। অতঃপর মু'জিযাহ্ (স্বাভাবিক নীতি ভঙ্গকারী-অলৌকিক শক্তি) নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের দালীল, আর কারামাহ্ (অলীদের জন্যও অলৌকিক শক্তি) নবুওয়াতের সত্যতা সাক্ষ্যকারী প্রমান সরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ [الحديد/٢٥] لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শণাবলী সহ প্রেরণ করেছি। *(সূরা আল-হাদীদ, আয়াত-২৫)* নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

عن أبي هريرة قال قال ﷺ ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة

প্রত্যেক নাবীই নিদর্শন বা মু'জিযাহ প্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু মু'জিযার তুলনায় মানুষ ঈমান আনে নাই। আর আমি যা প্রাপ্ত হয়েছি তা সেই ওয়াহী যা আমার নিকট (আল্লাহ) অবতীর্ণ করেছেন। ফলে আমি আশাবাদী যে, কিয়ামত দিবসে তাঁদের চেয়ে আমার অনুসারী বেশী হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

বি: দ্র: তবে নবীদের মু'জিযাহ আর অলীদের কারামত কোন নিজস্ব ক্ষমতা নয়। বরং সম্পূর্ণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রনে। আল্লাহ (সুব:) যখন যাকে যতটুকু দান করেন তার থেকে কেবলমাত্র ততটুকুই প্রকাশ পেত।

❖ **প্রশ্ন-১১।** রাসুল (সাঃ) এর নবুওয়াতের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?

উত্তরঃ- তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা- ঈমানের মূলনীতি সমূহের একটি অন্যতম মূলনীতি। এর উপর ঈমান আনা ছাড়া কারোও ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا [الفتح/١٣]

অর্থঃ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেসব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। (সূরা আল-ফাতহ, আয়াত-১৩)

নিম্নে বর্ণিত বিষয়ের উপর ঈমান আনার মাধ্যমে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে।

প্রথমতঃ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা বা জানা। কুরাইশ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ইব্রাহীম আল-খালীল এর বংশধর, তাঁর ও আমাদের নাবীর উপর সর্ব উত্তম দরুদ ও সালাম বর্ষিত হউক। তাঁর তেষট্টি বছর বয়স হয়েছিল। নবুয়াতের পূর্বে চল্লিশ বৎসর, নাবী ও রাসূল হওয়ার পরে তেইশ বৎসর।

দ্বিতীয়তঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন সে বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করা, যে বিষয় তিনি আদেশ করেছেন, তার অনুসরণ করা। যে বিষয় হতে তিনি নিষেধ করেছেন ও সতর্ক করেছেন তা হতে বিরত থাকা। তিনি যে বিধান দান করেছেন সে অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা।

তৃতীয়তঃ তিনি জ্বিন ইন্সান সকলের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল এ কথার বিশ্বাস রাখা। সবাইকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الأعراف/١٥٨]

অর্থঃ আপনি বলুন হে মানব সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত-১৫৮)

চতুর্থতঃ তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনা, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নাবী। তিনি আল্লাহর খালীল ও আদম সন্তানের সর্দার বা নেতা। তিনি মহান শাফায়াতের মালিক, এবং জান্নাতে সুউচ্চ অয়াসীলা নামক স্থান তাঁরই জন্য। তিনি হাউজে কাউসারের মালিক। তাঁর উম্মাত সর্বশ্রেষ্ঠ বা উত্তম। অধিকাংশ জান্নাতবাসী হবে তাঁরই উম্মত এবং তাঁর রিসালাত পূর্ববর্তী সকল রিসালাতের রহিত কারী।

পঞ্চমতঃ আল্লাহ তাঁকে মহান মু'জিযাহ্ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন দ্বারা সহযোগিতা করেছেন। তা হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহর বাণী যা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে সংরক্ষীত। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন;

{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: ٩]

অর্থ:- নিশ্চয় আমি কুরআন[১] নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী। (সুরা আল হিজর: ৯)

ষষ্ঠতঃ নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রিসালাত প্রচার করেছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মাতদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। সকল প্রকার কল্যাণের সন্ধান দিয়েছেন, ও তার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সকল প্রকার অকল্যাণ হতে তাঁর উম্মাতকে নিষেধ করেছেন। ও তা হতে তাদেরকে সাবধান করেছেন। জিহাদ করেছেন, জিহাদে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

সপ্তমতঃ তাঁকে (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালবাসা, ও তাঁর ভালোবাসাকে নিজের জানের ও সকল সৃষ্টিজীবের ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেওয়া। তাঁকে সম্মান করা, মর্যাদা দেওয়া, ইহ্তেরাম করা, ও তাঁর আনুগত্য করা। নিশ্চয় ইহা সে হক্ব বা অধিকার যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর নাবী (সা:) এর জন্য সাবস্ত করেছেন। কারণ তাঁর ভালবাসা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর ভালবাসা, এবং তাঁর আনুগত্য প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর আনুগত্য।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده

তোমাদের কেহই ততক্ষন পর্যন্ত মু'মিন হতে পারেনা যতক্ষন পর্যন্ত আমি তাদের নিকট তাদের ছেলে সন্তান, পিতামাতা, ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তম না হবো। (বুখারী ও মুসলিম)

---

[১] الذكر দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন।

অষ্টমতঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দরুদ ও সালাম বেশী বেশী পাঠ করা। কারণ কৃপণ ঐ ব্যক্তি যার নিকট নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম উল্লেখ্য হওয়ার পরও তাঁর উপর দরুদ পাঠ করেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب/٥٦]

"নিশ্চয় আলাহ (ঊর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দো'আ করে[২]। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।। (সূরা আল-আহ্‌যাব, আয়াত-৫৬)

নবমতঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সকল নাবী (আলাইহিমুস্‌ সালাম) তাঁদের রবের নিকট জীবিত। তবে তাঁদের কবরের জীবন, পৃথিবীর জীবনের মত নয়। তা এমন জীবন যার বিবরণ সর্ম্পকে আমরা জানিনা, সে জীবন তাঁদের হতে মৃত্যুর নামও দূর করেনা।

দশমতঃ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সামনে উচু আওয়াজ না করা, অনুরুপ তাঁর কবরে তাঁর উপর সালাম দেওয়ার সময় উচু আওয়াজ না করা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ইহ্‌তেরামের অন্তর্ভুক্ত। দাফনের পর তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মান করা, তাঁর জীবিত অবস্থায় সম্মান করার ন্যায়। অতঃপর তাঁকে আমরা সম্মান করবো যে ভাবে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে সম্মান করতেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন;

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} [الحجرات: ٢]

অর্থ:- হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না। এ আশঙ্কায় যে তোমাদের সকল আমল–নিষ্ফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না। (সুরা হুজুরাত: ২)

[২] ইমাম বুখারী আবুল 'আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন, 'রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর উপর আলাহর সালাত' বলতে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতাদের কাছে নবীর প্রশংসা এবং ফেরেশতাদের সালাত হলো দো'আ। আর ইমাম তিরমিযী সুফিয়ান সওরী থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে আলাহর সালাত বলতে রহমত এবং ফেরেশতাদের সালাত বলতে ইস্তেগফার বুঝানো হয়েছে (তাফসীর ইবন কাসীর)।

একাদশতমঃ তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদেরকে, পরিবার-পরিজনকে ও স্ত্রীদেরকে ভালবাসা ও তাঁদের সকলের সাথে বন্ধুত্ব রাখা। তাঁদের মর্যাদাহানী হতে বা তাঁদেরকে গালী দেওয়া হতে ও তাঁদের চরিত্রে কোন প্রকার আঘাত হানা হতে সাবধান থাকা। কারণ আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাজি হয়েছেন, ও তাঁদেরকে তাঁর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহচর হিসাবে নির্বাচন করে নিয়েছেন। এই উম্মাতের উপর তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

দ্বাদশতমঃ তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা হতে বিরত থাকা। কারণ অতিরঞ্জিত করা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বড় কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

عن ابن عباس سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله

"তোমরা আমার ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করনা যেমন খৃষ্টানরা ঈসা বিন মারইয়াম (আলাইহিস্ সালাম) এর ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করেছিল। (বুখারী)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্মানের ব্যাপারে বেশী-কমে সীমালংঘন না করা ওয়াজিব। তাই তাঁকে উলুহীয়াতের (মা'বুদের) গুনে গুনান্বিত করা যাবেনা। তাঁর মর্যাদা সম্মান ও ভালবাসার অধিকার কমানোও যাবেনা, যার অন্যতম বৈশিষ্ট হল তার শরীয়াতের অনুসরণ করা, তার নীতির উপর চলা ও তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুকরণ করা।

ত্রয়োদশতমঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনা পূর্ণাঙ্গ হবে তাঁকে সত্যায়িত ও তিনি যে শরীয়াত নিয়ে এসেছেন তার উপর আমল করার মাধ্যমে, এটা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্য করার অর্থ। তাঁর আনুগত্য বস্তুত আল্লাহরই আনুগত্য, আর তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাফারমানী বস্তুত আল্লাহরই নাফারমানী। আর তাঁকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস ও অনুসরণের মাধ্যমেই তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনা হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ - আমাদের নবী (সাঃ) কি মানুষ ছিলেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই মানুষ ছিলেন। এ কথা কুরআন হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন;

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [الكهف: ١١٠]

অর্থ:- বল, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ। (সুরা কাহ্ফ: ১১০)

{قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [إبراهيم: ١١]

অর্থ:- তাদেরকে তাদের রাসূলগণ বলল, 'আমরা তো কেবল তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসার সাধ্য আমাদের নেই। আর কেবল আল্লাহর উপরই মুমিনদের তাওয়াক্কুল করা উচিত'। (সুরা ইবরাহিম: ১১)

{ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا } [الإسراء: ٩٣]

অর্থ:- বল, 'পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো একজন মানব-রাসূল ছাড়া কিছু নই'? (সুরা বনী ইসরাঈল: ৯৩)

عن عبدالله : .... قَالَ « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ (صحيح مسلم)

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেন, নিশ্চই আমি তোমাদের মতই মানুষ। আমি স্বরণ করি যেভাবে তোমরা স্বরণ কর। এবং আমি ভূলে যাই তোমরা যেভাবে ভূলে যাও। (সহীহ মুসলিম ১৩১২)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ

অর্থ:- উম্মে সালমা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; রাসুল (সাঃ) বলেন, নিশ্চই আমি মানুষ। আর আমার কাছে তোমরা বিচার নিয়ে আস। হয়তো তোমাদের কেউ অন্যের তুলনায় নিজের স্বপক্ষে সাঝিয়ে গুছিয়ে দলিল পেশ করতে পারদর্শী (বাকপটু)। অতপর আমি যা শুনি সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেই। অতএব আমি যদি কারো জন্য তার অন্য ভাইয়ের কোন হক্বের ফায়সালা দেই সেটা যেন সে গ্রহণ না করে। কেননা আমি তার জন্য জাহান্নামের আগুনের একটি অশং বরাদ্দ করে দিয়েছি। (সহীহ বুখারী ৬৯৬৭)

প্রশ্ন: - আমাদের নবী (সাঃ) কিসের তৈরী ছিলেন? নূরের না মাটির তৈরী?

উত্তর:- সকল নবী রাসুলগন-ই মাটির তৈরী, আদমের সন্তান। আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ)-ও যেহেতু আদমের সন্তান। তার বংশ আছে। স্ত্রী, সন্তান ছিল। খাওয়া-দাওয়া করতেন, বাজারে যেতেন। অসুস্থ হতেন। কাজেই তিনি যখন মানুষ, তাহলে মানুষ যা দিয়ে তৈরী তিনিও সেই মাটি দিয়েই তৈরী।

{ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}

অর্থ:- নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মত, তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বললেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল। (সুরা আলে ইমরান: ৫৯)

{وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا } [الفرقان: ٢٠]

অর্থ:- আর তোমার পূর্বে যত নবী আমি পাঠিয়েছি, তারা সবাই আহার করত এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের একজনকে অপরজনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? আর তোমার রব সর্বদ্রষ্টা। (সুরা ফুরক্বান: ২০)

প্রশ্ন:- আমাদের রাসুল (সাঃ) কি আলেমূল গায়েব ছিলেন?

উত্তর:- না, তিনি বা অন্য কোন নবী রাসুল, অলী-আউলিয়া, পীর-মুর্শিদ কেউ আলেমূল গায়েব নন। শুধুমাত্র আল্লাহ (সুব:) যাকে যতটুকু জানান সে ততটুকুই জানেন। এ কথা পবিত্র কুরআনে পরিস্কার ভাবে উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দলিল সহ ২৪২-২৪৪ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন:- আমাদের রাসূল (সাঃ) কি সব জায়গায় হাজির নাজির? আমাদের দেশে অনেকেই এই আক্বীদা পোষণ করতঃ মীলাদের এক পর্যায়ে নবী (সাঃ) এর সম্মানার্থে দাড়িয়ে যায়। বিষয়টি কতটুকু সহীহ?

উত্তর:- মীলাদ অনুষ্ঠানটি একটি স্বীকৃত বিদ'আত (সওয়াবের উদ্দেশ্যে নব আবিস্কৃত ভিত্তিহীন ইবাদাত) আর এতে "আল্লাহর রাসূল (সাঃ) স্বয়ং হাজির হয়ে যান" এ আক্বীদা পোষণ করা শির্ক। আর সে জন্য দাড়ানো আরেকটি বিদ'আত। রাসুল (সাঃ) এর সাহাবায়ে কিরামগণ সরাসরি রাসুল (সাঃ) এর স্ব-শরীরে কোন মজলিসে আগমন হলেও দাড়াতেন না। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে;

عن أنس بن مالك قال : لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك . رواه الترمذي

অর্থ:- আনাস (রাযিঃ) বলেন, সাহাবায়ে কিরামের নিকট রাসুলুল্লাহ (সাঃ) অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিলো না। অথচ তাঁহারা যখন তাঁহাকে দেখিতেন তখন দাঁড়াইতেন না। কেননা, তাঁহারা জানতেন যে, তিনি ইহা পছন্দ করেন না। (তিরমিযী, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ্)

وعن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار " رواه الترمذي وأبو داود

অর্থ:- মুয়াবিয়া (রাযিঃ) বলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইহাতে আনন্দ পায় যে, লোকজন তাহার জন্য দাড়ানো অবস্থায় স্থির হয়ে থাকুক, তবে সে যেন নিজের জন্য জাহান্নামে বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়। (আবু দাউদ)

কারও আগমনে দাড়িয়ে সম্মান করা তৎকালীন সময়ের অনারব মুর্খদের কাজ ছিল। যেমন আমাদের দেশেও স্কুলের শিক্ষকদেরকে তাদের মুর্খ ছাত্ররা দাড়িয়ে সম্মান করে থাকে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে;

وعن أبي أمامة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم متكئا على عصا فقمنا فقال : " لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا " . رواه أبو داود

অর্থ:- আবু উমামা (রাযিঃ) বলেন, একদা রাসুল (সাঃ) লাঠিতে ভর করে ঘর হইতে বাহিরে আসলেন। আমরা তাঁহার সম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তখন তিনি বললেন: তোমরা (অমুসলিম) আ'জমী লোকদের ন্যায় দাঁড়াইও না। এইভাবে দাঁড়াইয়া একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করে। (আবু দাউদ)

তবে কোন প্রয়োজনে দাঁড়ানো, যেমন সা'দ (রাযি:) অসুস্থ ছিলেন বিধায় তাঁহাকে সওয়ারী হতে নামতে লোকেরা সাহায্য করেছেন, তাহা দূষণীয় নয়।

عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إليه وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للأنصار : " قوموا إلى سيدكم "

অর্থ:- আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, যখন বনু কুরাইযা সা'দ ইবনে মুয়ায (রাযিঃ) এর ফায়সালায় সম্মতি প্রকাশ করল তখন রাসূল (সাঃ) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। আর সা'দ (রাযিঃ) হুজুরের (গৃহের) নিকটেই অবস্থান করছিলেন। তিনি একটি গাধার উপরে সওয়ার হইয়া আসিলেন। যখন তিনি মসজিদের নিকটে পৌঁছলেন, তখন রাসুল (সাঃ) আনসার সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা তোমাদের সর্দারের প্রতি দাঁড়াইয়া যাও। (বুখারী ও মুসলিম)

আখিরাতের প্রতি ঈমান

❖ প্রশ্ন-১। শেষ দিবসের প্রতি ঈমান বলতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ- শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের রুক্ন সমূহের অন্যতম একটি রুক্ন। যার প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কোন বান্দার ঈমান পরিপূর্ণ হবেনা। আর যে ব্যক্তি শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, পার্থিব জীবন শেষ হয়ে মৃত্যু ও কবর জীবনের মাধ্যমে অন্য জগত শুরু হবে। এভাবে কিয়ামত সংঘটিত হবে, তারপর পুনরুত্থান, হাশর, নাশর, ও হিসাব নিকাশের পর ফলাফল প্রাপ্ত হয়ে জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাবে। এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এমন একটি দিন রয়েছে, যে দিন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করবেন। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব কর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন। একদল জান্নাতী হবে, অপর দল জাহান্নামী হবে।

❖ প্রশ্ন-২। কিয়ামতের আলামত কয় প্রকার? আলামতগুলো কি কি?

উত্তরঃ শেষ দিবসের পূর্বে কিয়ামতের আলামতকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) ছোট আলামতঃ যা কিয়ামত নিকটে হওয়া বুঝায়, ইহা অনেক রয়েছে। অধিকাংশ সংঘঠিত না হলেও অনেক সংঘঠিত হয়ে গেছে। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) প্রেরণ। আমানতের খিয়ানত করা। মাস্জিদ অধিক মাত্রায় সাজ সজ্জা ও তা নিয়ে গর্ব করা। বড় বড় অট্টালিকা নিয়ে রাখালদের গর্ব করা। ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ ও তাদের নিহত হওয়া। সময় নিকটবর্তী হওয়া, আমল কমে যাওয়া, ফিৎনা-ফাসাদ প্রকাশ পাওয়া, অধিক হত্যা হওয়া, ব্যভিচার ও অন্যায় কাজ অধিক মাত্রায় হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ [القمر/١] اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ অর্থঃ কিয়ামত আসন্ন ও চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (সূরা আল-ক্বামার-আয়াত-১)

(খ) বড় আলামতঃ যা কিয়ামতের পূর্ব মূহুর্তে সংঘঠিত হবে এবং কিয়ামত শুরু হওয়ার সতর্ক করবে। এমন বড় আলামত দশটি। একটিও প্রকাশিত হয়নি। বড় আলামত সমূহ যেমনঃ ইমাম মাহ্দীর আগমণ, দাজ্জালের আগমণ, ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর আকাশ হতে ন্যায় বিচারক হিসাবে অবতরণ, তিনি খৃষ্টানদের ক্রুসেড ভেঙ্গে দিবেন, দাজ্জাল ও শুকুরকে হত্যা করবেন। ইসলামী শরীয়াত অনুপাতে বিচার পরিচালনা করবেন। ইয়াজুজ, মা'জুজ বের হবে। তাদের ধ্বংসের দু'আ করবেন, অতঃপর তারা মারা যাবে। তিনটি বড় ভূমি কম্প হবে। পূর্বে একটি, পশ্চিমে একটি, জাজিরাতুল আরবে একটি। ধোঁয়া

বের হবে, তা হল আকাশ হতে প্রচন্ড ধোঁয়া নেমে এসে সকল মানুষকে ঢেকে নিবে। কুরআন জমিন হতে আকাশে তুলে নেওয়া হবে। পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হবে। এক (অদ্ভুত) চতুস্পদ জন্তু বের হবে। ইয়ামানের আদন (জায়গার নাম) হতে ভয়ানক আগুন বের হয়ে মানুষদের শামের দিকে নিয়ে আসবে। এটাই সর্বশেষ বড় আলামত।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ « مَا تَذَاكَرُونَ » قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ « إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ » فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ -صلى الله عليه وسلم- وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلاَثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

হুযাইফা বিন উসাঈদ আল-গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন। তিনি (হুযাইফা) বলেনঃ অর্থঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট আগমণ করলেন, এমতাবস্থায় আমরা এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ছিলাম। তিনি বল্লেন তোমরা কি বিষয় আলোচনা করতেছ? তাঁরা বল্লেন আমরা কিয়ামতের ব্যাপারে আলোচনা করতেছি। তিনি বল্লেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষন না তোমরা তার পূর্বে দশটি আলামত সংঘঠিত হতে দেখবে। অতঃপর আলামত সমূহ উল্লেখ করলেনঃ ধোঁয়া, দাজ্জাল, চতুস্পদ জন্তু পশ্চিম দিক হতে সূর্য উঠা, ঈসা বিন মারিইয়াম এর আগমণ, ইয়াজুজ-মা'জুজ আগমণ, তিনটি ভূমি কম্প- একটি পূর্বে আর একটি পশ্চিমে, আর একটি জাজিরাতুল আরবে, শেষ আলামত হল ইয়ামান হতে আগুন বের হয়ে মানুষদেরকে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে। (*মুসলিম শরীফ)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেনঃ "আমার উম্মাতের শেষ ভাগে ইমাম মাহ্দী বের হবেন, তার উপর আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষন করবেন। জমিন উদ্ভিদ জন্ম দিবে। সুস্থ্য ও সচ্ছল লোকদের মাল প্রদাণ করা হবে। চতুস্পদ জানুয়ারের সংখ্যা বেড়ে যাবে। উম্মাতের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তিনি সাত অথবা আট বছর বসবাস করবেন।" (হাকেম)

বর্ণিত আছে যে ঐ নিদর্শন গুলো পর্যায় ক্রমে সংগঠিত হবে, যেমন পুথির মালায় পুথি পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে। এগুলোর একটি সংঘঠিত হওয়ার পর পরই

অপরটি সংঘঠিত হবে। এ দশটি নিদর্শন সংঘঠিত হওয়ার পর পরই আল্লাহর আদেশে কিয়ামত সংঘঠিত হবে।

❖ প্রশ্ন-৩। কিয়ামত দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তরঃ- কিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ দিন, যে দিন মানুষ আল্লাহর আদেশে তাদের কবর হতে বের হবে, হিসাব নিকাশের জন্য, অতঃপর সৎকর্মশীল সুফল ও শান্তি এবং অসৎ কর্মশীল শাস্তি প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

{ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ} [المعارج: ٤٣]

অর্থঃ সে দিন তারা কবর থেকে দ্রূত বেগে বের হবে-যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। (সূরা আল-মাআরিজ, আয়াত-৪৩)

এ দিনের একাধিক নাম কুরআন কারীমে উল্লেখ্য হয়েছে।

যেমন- (يوم القيامة) ইয়াওমুল ক্বিয়ামাহ, (القارعة) আল-ক্বারিয়াহ, (يوم الحساب) ইয়াওমুল হিসাব, (يوم الدين) ইয়াওমুদ্দিন, (الطامة) আত্ত্বামাহ, (الواقعة) আল-ওয়াক্বিয়াহ, (الحاقة) আল-হাক্কাহ, (الصاخة) আস্সাখ্খাহ, (الغاشية) আল-গাশিয়াহ, ইত্যাদি।

❖ প্রশ্ন-৪। ফিৎনাতুল কবর বা কবরের পরিক্ষা, শান্তি বা শাস্তি কি?

উত্তরঃ- কবরের পরিক্ষা-

মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফনের পর তাকে তার রব্ব, দ্বীন ও নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হবে। অতঃপর যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আল্লাহ সত্যের উপর অটল রাখবেন। যেমন হাদীসে এসেছেঃ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) قَالَ « نَزَلَتْ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ فَيُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّىَ اللَّهُ وَنَبِيِّى مُحَمَّدٌ -صلى الله عليه وسلم-. فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الآخِرَةِ) ».

অর্থঃ যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হবে, সে বলবেঃ আমার রব্বআল্লাহ আমার দ্বীন আল-ইসলাম, আমার নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। (*বুখারী ও মুসলিম)*

ফিরিশ্তাদ্বয়ের প্রশ্ন করা ও তাঁর পদ্ধতি, মু'মিনরা ও মুনাফিকরা কি উত্তর দিবেন এ সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীসের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব।

কবরের শাস্তি ও শান্তি

কবরের শাস্তি ও শান্তির প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। নিশ্চয় ইহা (কবর) জাহান্নামের গর্তের একটি গভীর গর্ত, অথবা জান্নাতের বাগানের একটি বাগান। আর কবর আখিরাতের প্রথম ধাপ বা স্টেশন। যে ব্যক্তি কবর হতে মুক্তি পাবে (তার জন্য) কবরের পরে ধাপ গুলো হতে মুক্তি পাওয়া সহজ হবে। আর যে ব্যক্তি, কবর হতে মুক্তি পাবেনা তার জন্য এর পরের ধাপ গুলো মুক্তি পাওয়া আরো কঠিন হবে। যার মৃত্যু হল তখন হতে তার কিয়ামত শুরু হয়ে গেল। অতঃপর আত্মা ও শরীর, উভয়ে কবরে শাস্তি বা শান্তি ভোগ করবে। আর কখনো কখনো শুধু আত্মা ভোগ করবে। আর কবরের আযাব বা শাস্তি শুধু মাত্র যালেমদের জন্য, আর শান্তি শুধু মাত্র সত্যবাদী মু'মিনদের জন্য।

আর মৃত্যু ব্যক্তি কবর জীবনের শাস্তি অথবা শান্তি প্রাপ্ত হবে, চাই ভূগর্ভস্ত করা হোক বা নাই হোক। যদি ও মৃত্যু ব্যক্তিকে আগুনে জালিয়ে দেওয়া হয়, অথবা পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, অথবা হিংস্র পশু পাখি খেয়ে ফেলে তার পরও সে এ শাস্তি অথবা শান্তি ভোগ করবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِى أَسْمَعُ مِنْهُ

হায়!! যদি তোমরা (তাদেরকে) দাফন করবে না বলে আশংকা না করতাম, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানোর জন্য। (মুসলিম)

❖ প্রশ্ন-৫। শিঙ্গায় ফুৎকার কি?

উত্তরঃ- শিঙ্গা হল বাঁশী সরূপ, যাতে ইস্‌রাফীল (আলাইহিস্ সালাম) ফুৎকার দিবেন। প্রথম ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ যা জিবীত রাখবেন তা ছাড়া সকল সৃষ্টি জীব মৃত্যুবরণ করবে। দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই পৃথিবী সৃষ্টি হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টিজীবের আর্বিভাব হয়েছিল, তারা সকলেই উঠে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ [الزمر/٦٨]

অর্থঃ শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমিনে যারা আছে সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সে ব্যতীত। অতঃপর আবার ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষনাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। (*সূরা আয্‌যুমার, আয়াত-৬৮*)

❖ প্রশ্ন-৬ । পুনরুত্থান কি?

উত্তরঃ- তা হলো শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়ার সময় আল্লাহ সকল মৃতদের জীবিত করবেন। তারা সকলে সমগ্র বিশ্বের প্রতি পালকের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শিঙ্গায় ফোঁকা ও প্রত্যেক আত্মাকে স্ব-শরীরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলে সকল মানুষ তাদের কবর হতে দাঁড়িয়ে জুতা বিহীন নাঙ্গা পা, বস্ত্র-বিহীন-উলঙ্গ শরীর, খাৎনা বিহীন ও দাঁড়ি-গোঁফ বিহীন অবস্থায় দ্রুত ময়দানের দিকে ছুটে যাবে।

ময়দানের অবস্থান দীর্ঘ হবে, সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে, সূর্যের উত্তাপ বেড়ে যাবে। এ উত্তপ্ত ও কঠিন অবস্থান দীর্ঘ হওয়ায় শরীর হতে নির্গত ঘামে হাবু-ডুবু খাবে, কারো ঘাম পায়ের দু'গিঁঠা পর্যন্ত, কারো দু'হাটু পর্যন্ত, কারো মাজা পর্যন্ত, কারো বক্ষ পর্যন্ত, কারো দু'কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছবে। আর কেউ-সম্পূর্ণ ভাবে হাবুডুবু খাবে, এ সব হলো তাদের (ভাল-মন্দ) কর্ম অনুপাতে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [التغابن/٧]

কাফিররা ধারণা করেছিল যে, তারা কখনোই পুনরুত্থিত হবে না। বল, 'হ্যাঁ, আমার রবের কসম, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা আমল করেছিলে তা অবশ্যই তোমাদের জানানো হবে। আর এটি আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। (সূরা আত্তাগাবুন, আয়াত-৭)

তিনি আরো বলেনঃ

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ [الأنبياء/١٠٤]

যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত, ১০৪)

❖ প্রশ্ন-৭। হাশর, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও প্রতিফল কি?

উত্তরঃ- আমরা ঈমান আনবো যে, সকল দেহের হাশর নাশর হবে, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাদের মাঝে বিচারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং সকল সৃষ্টিজীবকে স্বীয় কৃত কর্মের প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদান করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

{وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا} [الكهف: ٤٧]

অর্থঃ এবং আমি তাদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়বনা। (সূরা আল-ক্বাহাফ, আয়াত-৪৭)

তিনি আরো বলেনঃ

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (١٩) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (٢٠) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ [الحاقة/١٩-٢١]

অর্থঃ অতঃপর যার আমল নামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে। (সূরা আল-হাক্কাহ, -১৯-২১)

অতঃপর হাশর হলঃ মানুষদেরকে তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য ময়দানে একত্রিত করা।

হাশর ও পুনরুত্থানের মধ্যে পার্থক্যঃ পুনরুত্থান হলঃ দেহ সমূহকে পুনরুজ্জীবিত করা। হাশর হলঃ পুনরুত্থিত ব্যক্তিদেরকে অবস্থান ময়দানে একত্রিত করা।

হিসাব, নিকাশ, ও প্রতিফলঃ আল্লাহু তা'বারাকা ও তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন, ও তাদেরকে তাদের সম্পাদীত কর্ম সর্ম্পকে অবগত করবেন। অতঃপর মু'মিন মুত্তাকীনদের হিসাব নিকাশ হল, শুধু মাত্র তাদের নিকট তাদের কর্ম পেশ করা হবে। যাতে তারা তাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বুঝতে পারে, যা (অনুগ্রহ) আল্লাহ তাদের নিকট হতে দুনিয়াতে গোপন রেখেছিলেন। আর আল্লাহ আখিরাতে তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। আর তাদের হাশর হবে তাদের ঈমান অনুপাতে। ফিরিশ্‌তারা তাদেরকে স্বাগত জানাবে ও জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ প্রদান করবে, আর তাদেরকে অস্থিরতা ও সকল প্রকার ভয়-ভীতি এবং এ কঠিন দিনের ভয়াবহতা হতে নিরাপত্তা দিবে, অতঃপর তাদের মূখমন্ডল উজ্জল হবে। আর মুখমন্ডল সে দিন হাসি-খুশী, আনন্দ-উৎফুল্ল সুসংবাদ প্রাপ্ত হবে।

অতঃপর বিমুখ মিথ্যাবাদীদের (কাফেরদের) হিসাব নিকাশ অত্যান্ত কঠিনভাবে হবে। শুক্ষ প্রত্যেকটি ছোট বড় কর্মের। কিয়ামত দিবসে তাদেরকে তাদের মুখের উপর টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে ফেলা হবে, তাদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য ও তাদের কৃত কর্মের ফল হিসাবে এবং তাদের মিথ্যা বলার কারণে।

কিয়ামত দিবসে সর্ব প্রথম হিসাব নেওয়া হবে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মাতের, তাদের সাথে সত্তর হাজার লোক তাদের পূর্ণ তাওহীদের বদৌলাতে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর বান্দার সর্ব প্রথম হিসাব নেওয়া হবে আল্লাহর হক্ব-সালাতের (নামাযের)। এবং মানুষের মাঝে সর্ব প্রথম ফায়সালা করা হবে রক্তপাতের।

❖ প্রশ্ন-৮ । হাউজে কাউসার কি?

উত্তরঃ- নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাউজের প্রতি ঈমান আনবো। আর ইহা বিশাল হাউজ ও সম্মানিত অবতরণ স্থান। কিয়ামতের মাঠে জান্নাতের আল-কাউসার নামক নদী হতে শরাব প্রবাহিত হবে। এতে অবতরণ করবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মু'মিন উম্মাতেরা।

হাউজের কিছু বৈশিষ্টঃ ইহার শারাব দুধের চাইতে সাদা, বরফের চাইতে ঠান্ডা, মধুর চাইতে অধিক মিষ্টি। মিশকের চাইতে সুগন্ধি, ইহা সুপ্রসস্ত যার দৈর্ঘ ও প্রস্থ সমান, এর প্রতিটি প্রান্তের আয়তন এক মাসের পথের সমান। এতে জান্নাত হতে প্রবাহিত দু'টি নালা রয়েছে। আর এর পানি পাত্র আকাশের তারকারাজির চাইতে অধিক । যে ব্যক্তি ইহা হতে একবার পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

عبد الله بن عمرو: قال النبي ﷺ (حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا

আমার হাউজের আয়তন এক মাসের পথ সমতুল্য, তার পানি দুধের চাইতে সাদা ও তার ঘ্রাণ মিশকের চাইতে সুগন্ধি, তার পানি পাত্র আকাশের তারকা রাজির সংখ্যার ন্যায়। যে ব্যক্তি ইহা হতে একবার পানি পান করবে সে আর কখনও পিপাসিত হবেনা। (বুখারী)

❖ প্রশ্ন-৯। শাফায়াত কি? শাফায়াতের শর্ত কি?

উত্তরঃ- যখন সেই মহান প্রান্তরে মানুষের বিপদ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, এবং সেথায় তাদের অবস্থান দীর্ঘ হবে। তখন তারা এ প্রান্তরের ভয়াবহ বিপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তাদের রব্বর নিকট সুপারিশ করা হোক এর প্রচেষ্টা করবে। রাসূলদের মধ্য হতে যারা উলুল আজম (নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ও ঈসা) (আলাইহিস সালাম) তাঁরা অপারগতা স্বীকার করবেন। পরে ইহা সর্ব শেষ রাসূল আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকটে পৌঁছাবে যার আগের ও পরের গুনাহ্ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন।

অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন স্থানে দাঁড়াবেন যে স্থানে আগের ও পরের সকলেই তাঁর প্রশংসা করবে। এবং এর দ্বারা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহা সম্মান ও উঁচু মর্যাদা প্রকাশিত হবে। তার পর আরশের নিচে সিজ্দা করবেন, আল্লাহ তাঁর নিকট অনেক প্রশংসা, উপযুক্ত আদেশ ইলহাম করবেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দ্বারা তাঁর (আল্লাহর) প্রশংসা করবেন, ও তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করবেন। তার পর নাবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রব্বের নিকট (তাদের জন্য) সুপারিশ করার অনুমতি চাইবেন। আল্লাহ তা'আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সৃষ্টিজীবের সুপারিশ করার জন্য ঐ অনুমতি দিবেন। যাতে বান্দাদের মাঝে অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা ভোগের পর সুষ্ট ফায়সালা করা হয়। অতঃপর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুপারিশ করবেন। যাতে সৃষ্টিজীবের মাঝে ফায়সালা সম্পন্ন করা হয়। এ মহান শাফায়াত আল্লাহ একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এ ছাড়া তিনি আরো অনেক শাফায়াতের অধিকারী হবেন। আল্লাহর নিকট শাফায়াত গ্রহণ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে।

(ক) শাফায়াত কারীর ও শাফায়াত কৃত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকতে হবে। অর্থাৎ শিরক মুক্ত হতে হবে। কেননা মুশরিকের জন্য কোন সুপারিশও নাই আর কোন ক্ষমাও নাই।

(খ) শাফায়াত কারীর শাফায়াত করার ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতি থাকতে হবে।

❖ প্রশ্ন-১০। মিযান বা মানদন্ড কি?

উত্তরঃ- মিযান বা মানদন্ড সত্য এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। আর ইহা (মিযান বা মানদন্ড) আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে স্থাপন করবেন, বান্দাদের আমল মাপার ও তাদের কর্মের প্রতিদান প্রদানের জন্য। ইহা বাস্তব মিযান বা মানদন্ড। কাল্পনিক নয়, এর দু'টি পাল্লা ও রশি রয়েছে, এর দ্বারা কর্ম অথবা আমলনামা অথবা স্বয়ং কর্ম সম্পাদন কারীকে মাপা হবে। সবই মাপা হবে, তবে ওজন ভারি-হালকার বিষয়বস্তু হবে শুধু কর্ম। কর্ম সম্পাদনকারী ও আমল নামা নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ [الأنبياء/٤٧]

অর্থঃ আমি কিয়ামত দিবসে ন্যায় বিচারের মিযান বা মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমানও হয় আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহনের জন্য আমিই যথেষ্ট। (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত-৪৭)

❖ প্রশ্ন-১১। আস্ সিরাত বা পুল সিরাত কি?

উত্তরঃ- আমরা পুল সিরাতের প্রতি ঈমান আনবো। আর তা হলো জাহান্নামের পিঠের উপর স্থাপিত পুল, যা ভয়-ভীতি সন্ত্রস্ত অতিক্রম স্থল বা পথ। এর উপর দিয়ে মানুষ জান্নাতের দিকে অতিক্রম করবে। কেউ অতিক্রম করবে চক্ষের

পলকের ন্যায়। কেউ অতিক্রম করবে বিজলীর ন্যায়। কেউ বাতাসের ন্যায়। কেউ পাখির ন্যায়। কেউ ঘোড়ার ন্যায় চলবে। কেউ মুসাফিরের ন্যায় চলবে। কেউ ঘন ঘন পা রেখে চলবে। সর্ব শেষ যারা অতিক্রম করবে তাদেরকে টেনে ফেলা হবে। সকলেই অতিক্রম করবে তাদের কর্মের ফলাফল অনুপাতে। এমন কি যার ঈমানের আলো তার পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুলের পরিমাণ হবে সেও অতিক্রম করবে। কাউকে থাবা মেরে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি পুল সিরাত অতিক্রম করতে পারবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সর্ব প্রথম আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতঃপর তাঁর উম্মাত পুল সিরাত পাড়ি দিবেন। আর সে দিন একমাত্র রাসূলগণ কথা বলবেন। রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) দের কথা হবে। (اللّٰهُمَّ سلم سلم) অর্থঃ হে আল্লাহ্ মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। জাহান্নামে পুল সিরাতের দু'ধারে হুকের ন্যায় কন্টক থাকবে, এর সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেহ্ জানেনা। সৃষ্টি-জীব হতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন তাকে থাবা মেরে (জাহান্নামে) ফেলে দেয়া হবে।

পুল সিরাতের কিছু বর্ণনাঃ ইহা তরবারীর চাইতে ধারালো, আর চুলের চাইতে সূক্ষ্ম ও পিচ্ছিল জাতীয়। ইহাতে আল্লাহ্ যাদের পা স্থীর রাখবেন, শুধু মাত্র তাদেরই পা স্থীর থাকবে, আর ইহা অন্ধকারে স্থাপিত হবে। আমানত ও আত্নীয়তা বন্ধনকে পুল সিরাতের দু'পার্শে দন্ডায়মান অবস্থায় রাখা হবে, যারা ইহা সংরক্ষন করেছেন তাদের স্বপক্ষে, আর যারা সংরক্ষন করেনি তাদের বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (٧١) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا [مريم/٧١، ٧٢]

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় (পুল সিরাতে) পৌঁছবেনা এটা আপনার পালন কর্তার অনিবার্য ফায়সালা। অতঃপর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব। *(সূরা মারইয়াম, আয়াত-৭১-৭২)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেনঃ

فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللّٰهُمَّ سلم

জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হবে, অতঃপর আমিই সর্ব প্রথম অতিক্রম করবো। আর সে দিন রাসূলদের দু'আ হবে, আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম, (হে আল্লাহ! মুক্তি দাও, মুক্তি দাও)। *(বুখারী মুসলিম)*

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি যে, পুল-সিরাত চুলের চাইতে সূক্ষ্ম আর তরবারীর চাইতে ধারালো হবে। (*মুসলিম*)

❖ প্রশ্ন-১২। আল-কানত্বারাহ্ কি?

উত্তরঃ- আমরা ঈমান আনবো এ কথার প্রতি যে, মু'মিনেরা পুল সিরাত অতিক্রম করে কানতারাতে অবস্থান করবে বা দাঁড়াবে। আর ইহা (কানত্বারাহ্) হল জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান, এখানে ঐ সকল মু'মিনদেরকে দাঁড় করানো হবে, যারা পুল সিরাত অতিক্রম করে এসেছে এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়েছে, জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে একে অপরের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে (এখানে দাঁড় করানো হবে)। অতঃপর তাদের পরি-শুদ্ধির পর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا

মু'মিনেরা জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে, তার পর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী কানত্বারাহ্ নামক স্থানে একত্রিত করা হবে। তার পর দুনিয়াতে তাদের মাঝে যে জুলুম নির্যাতন ঘটেছিল একে অপরের পক্ষ হতে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। যখন তারা এসব হতে মুক্ত হবে তখন তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর শপথ সেই সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রাণ, নিশ্চয় তাদের প্রত্যেকের দুনিয়ার বাসস্থান হতে জান্নাতের বাসস্থান উত্তম। (*বুখারী*)

❖ প্রশ্ন-১৩। জান্নাত ও জাহান্নাম এর ব্যাপারে আমাদের ঈমান কি?

উত্তরঃ- আমরা ঈমান আনবো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, এ দু'টি (জান্নাত ও জাহান্নাম) বর্তমান বিদ্যমান রয়েছে, আর ইহা কখনো ধ্বংস হবে না বরং সর্বদায় রয়েছে। আর জান্নাতবাসীদের নি'আমত শেষ ও ঘাটতি হবে না, অনুরূপ জাহান্নামীদের মধ্যে যার ব্যাপারে আল্লাহ চিরস্থায়ী শাস্তির ফায়সালা করেছেন তার শাস্তি কখনও বিরত ও শেষ হবে না। তবে তাওহীদ পন্থীরাঃ আল্লাহর রহমতে ও শাফায়াত কারীদের শাফায়াতে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবেন।

জান্নাত হলঃ অতিথীশালা, যা আল্লাহ্ কিয়ামতে মুত্তাকীনদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। তথায় রয়েছে প্রবাহিত নদী উন্নত ও সুউচ্চ কক্ষ, মনোলোভা রমণী, সমূহ। তথায় আরো রয়েছে মনঃপূত-মনোহর সামগ্রী যা কোন দিন কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ন শ্রবণ করেনি, আর কোন মানুষের অন্তরেও কোন দিন কল্পনায় আসেনি। জান্নাতের নি'আমত চিরস্থায়ী কোন দিন শেষ হবেনা। জান্নাতে কোড়া সমতুল্য জায়গাহ্ দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে উত্তম। আর জান্নাতের সুগন্ধী চল্লিশ বৎসর দূরত্বের রাস্তা হতে পাওয়া যায়। জান্নাতে মু'মিনদের জন্য সব চাইতে বড় নি'আমত হলো আল্লাহকে সরাসরি স্বচক্ষে দর্শনলাভ করা।

কিন্তু কাফেররা আল্লাহর দর্শনলাভ হতে বঞ্চিত হবেঃ আর যারা মু'মীনদের জন্য তাদের রব্বর দর্শনকে অস্বীকার করলো সে বস্তুর এই বঞ্চিত হওয়াতে মু'মিনদেরকে কাফেরদের সমকক্ষ করলো। আর জান্নাতে একশতটি ধাপ রয়েছে, এক ধাপ হতে অপর ধাপের দূরুত্ব আসমান হতে জমিনের দূরত্ব অনুরূপ। আর সবচেয়ে উন্নত ও উত্তম জান্নাত হল, জান্নাতুল ফিরদাউস আল-আলা। এর ছাদ হল আল্লাহর আরশ। আর জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, প্রত্যেক দরজার পার্শ্বের দৈর্ঘ "মক্কা "হতে "হাজার" এর দূরত্বের সমান। আর এমন দিন আসবে যে দিনে ইহা ভিড়ে পরিপূর্ণ হবে, আর জান্নাতে নূন্যতম মর্যাদার অধিকারী যে হবে তার দুনিয়া ও আরো দশ দুনিয়ার পরিমান জায়গা হবে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সম্পর্কে বলেনঃ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ অর্থঃ পরহেজগার মু'মিনদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। *(সূরা আলি-ইমরান, :১৩৩)*

জান্নাতবাসীদের চিরস্থায়ী ও জান্নাত ধ্বংস হবে না। এই সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ [البينة/٨]

অর্থঃ তাদের পালন কর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালন কর্তাকে ভয় করে। *(সূরা আল-বাইয়্যেনাহ, আয়াত-৮)*

জাহান্নামঃ ইহা শাস্তির ঘর যা আল্লাহ্ কাফের ও অবাধ্যদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। তথায় বিভিন্ন প্রকার কঠিন শাস্তি রয়েছে। তার পাহারাদার হবে নিষ্ঠুর ও নির্দয় ফিরিশতারা। আর কাফেররা তথায় চিরস্থায়ী থাকবে। তাদের খাদ্য হবে যাক্কুম (কাঁটা যুক্ত) আর পানীয় হবে পুঁজ, দুনিয়ার আগুনের তাপ

জাহান্নামের আগুনের তাপ মাত্রার সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৬৯ (উনসত্তর) গুন বেশী, এর প্রত্যেকটি অংশ দুনিয়ার আগুনের ন্যায় বা তার চাইতে আরো উত্তাপ, আর এই জাহান্নাম তার অধিবাসী নিয়ে পরিতুষ্ট হবেনা বরং বলবে যে, আরো আছে কি? তার সাতটি দরজা হবে। প্রত্যেকটি দরজার জন্য নির্ধারিত জাহান্নামীমের অংশ থাকবে। জাহান্নামীরা চিরস্থায়ী এবং তা ধ্বংস হবেনা। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম সর্ম্পকে বলেনঃ [آل عمران/١٣١] أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ কাফিরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। (সূরা আলি-ইমরান, আয়াত-১৩১)

জাহান্নামীরা চিরস্থায়ী এবং তা ধ্বংস হবেনা। এ সর্ম্পকে তিনি আরো বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (٦٤) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ([الأحزاب/٦٤، ٦٥]

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন, এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে। *(সূরা আল-আহযাব, আয়াত-৬৪-৬৫)*

❖ প্রশ্ন-১৪। শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার সুফল কি?

উত্তরঃ- শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার অনেক সূফল রয়েছে।

- ছাওয়াবের আশায় আনুগত্য ও কর্ম সম্পাদনে আগ্রহী ও উৎসাহী হওয়া।
- এ দিবসের শাস্তির ভয়ে অবাধ্যতায় লিপ্ত ও ততপ্রতি সন্তুষ্ট থাকা হতে ভয় করা।
- আখেরাতে মু'মিনরা যে নি'আমত ও ছাওয়াব পাবে এ আশা- আকাঙ্খায় দুনিয়ার ছুটে যাওয়া জিনিস হতে নিজের শান্তনা লাভ করা।
- ব্যক্তি ও সমাজিক জীবনে সৌভাগ্যের মূল উৎস হল শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা। কারণ মানুষ যখন এ কথার প্রতি ঈমান আনবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জীবকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করবেন ও তাদের হিসাব নিকাশ নিবেন, এবং তাদের কর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন। মায্লুমের (অত্যাচারিত) পক্ষে যালিম (অত্যাচার কারী) ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। তখন সে আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, সকল অকল্যাণের জড় নিঃশেষ হয়ে যাবে। সমাজে কল্যাণ বিস্তার লাভ করবে, এবং সর্বত্র সম্মান-মর্যাদা, শান্তি ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে পড়বে। প্রশান্তি ও নিরাপত্তা বেড়ে যাবে।

তাকদীরের প্রতি ঈমান

❖ প্রশ্ন-১ । কদরের (ভাগ্যের) সংজ্ঞা ও তার প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব কি?

উত্তরঃ- কদর বা (ভাগ্য) হলঃ আল্লাহর অনন্ত জ্ঞান ও হিকমাত অনুযায়ী সৃষ্টি কূলের জন্য ভাগ্য নির্ধারণ । আর ইহা আল্লাহর কুদরতের উপর নির্ভলশীল, আর তিনি সর্ব বিষয় ক্ষমতাশীল তিনি যা ইচ্ছা তাহাই করেন ।

আর ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা আল্লাহ্ তা'আলার রুবুবীয়াতের (রব্বত্তের) প্রতি ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত । আর ইহা ঈমানের ছয়টি রুক্নের অন্যতম একটি রুক্ন, এর প্রতি ঈমান আনা ছাড়া এই ছয়টি রুক্নের প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে না । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [القمر/٤٩]

অর্থঃ নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিত রুপে সৃষ্টি করেছি । (সূরা আল-ক্বামার, আয়াত-৪৯)

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « كُلُّ شَىْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ

অর্থঃ প্রত্যেক জিনিসই পরিমিত, এমনকি অপারগতা ও অলসতা অথবা অলসতা ও অপারগতাও । (মুসলিম)

❖ প্রশ্ন-২ । ভাগ্যের স্তর কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ- চারটি স্তর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবেঃ

প্রথমতঃ আল্লাহর অনন্ত জ্ঞানের প্রতি ঈমান আনা, যা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [الحج/٧٠]

অর্থঃ তুমি কি জাননা যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অবগত যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে, নিশ্চয় ইহা কিতাবে লিখিত আছে আর নিশ্চয় ইহা আল্লাহর নিকট সহজ । (সূরা আল-হাজ্ব আয়াত-৭০)

দ্বিতীয়তঃ লাউহে মাহ্ফুজে আল্লাহর জানা মোতাবেক ভাগ্য সমূহ লিখে রাখার প্রতি ঈমান আনা ।

আল্লাাহ তা'আলা বলেনঃ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ "আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি । (সূরা আন-আম আয়াত-৩৮)

তৃতীয়তঃ আল্লাহর কার্যকরী ইচ্ছা ও তাঁর ব্যাপক শক্তির প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ জগত সমূহের রব্বআল্লাহর ইচ্ছার বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পারে না। (সূরাতুত্ তাকভীর আয়াত -২৯)

চতুর্থতঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বস্তুর সৃষ্টি কর্তা ইহার প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ [الصافات/٩٦] وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন। *(সূরা আস্ সাফ্ফাত আয়াত, ৯৬)*

❖ প্রশ্ন-৩। ভাগ্যের প্রকারভেদ কি কি?

উত্তরঃ- ভাগ্যের প্রকারসমূহ হল-

- সকল সৃষ্টি জীবের সাধারণ ভাগ্য লিপিবদ্ধ করণ। আর ইহাই আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে লাউহে মাহ্ফুজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
- সারা জীবনের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করণ। আর তা হল বান্দার মাঝে রুহ্ বা আত্মা ফুঁকে দেওয়ার সময় হতে তার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে নির্ধারণ করা।
- বাৎসরিক ভাগ্য নির্ধারণ করা। ইহা হল, প্রত্যেক বৎসর যা কিছু সংঘটিত হবে তা নির্ধারন করা। আর ইহা প্রত্যেক বৎসরের মহিমান্বিত রজনীতে হতে থাকে। আর তা হলো লাইলাতুল ক্বদরে যে রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ [الدخان/٤] فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ অর্থঃ এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। (সূরা-আদ্দুখান আয়াত-৪)
- দৈনন্দিন ভাগ্য নির্ধারন করণ, আর তা হল সম্মান, অপমান, (কিছু) দেওয়া না দেওয়া জীবিত করা, মৃত্যু দান ইত্যাদি যা দৈনন্দিন সংঘটিত হবে, তা নির্ধারন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ [الرحمن/٢٩]

অর্থঃ আসমান ও যমিনে বিচরণশীল সকলেই তাঁর কাছে প্রার্থী, প্রত্যেকদিন (সময়) কোন না কোন কর্মেরত রয়েছেন। (সূরা আর-রাহ্মান আয়াত- ২৯)

❖ প্রশ্ন-৪। ভাগ্যের ব্যাপারে সালাফদের আকিদাহ বা বিশ্বাস কি?

উত্তরঃ নিশ্চয় আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা রব, তার মালিক বা অধিকারী। নিশ্চয় আল্লাহ সকল সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টির পূর্বে তাদের ভাগ্য সমূহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাদের বয়স, রুযী, কর্ম সমূহ নির্ধারন করে রেখেছেন। আরো লিখে রেখেছেন যে, সুখ অথবা দুঃখের দিকে তারা ধাবিত হবে।

প্রত্যেক জিনিসই স্পষ্ট কিতাবে হিসাব করে রেখেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। আর যা হয়েছে ও হবে তা সবই জানেন। আর যা হয় নাই যদি তা হতো কি ভাবে হতো তাও জানেন। আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন।

আর নিশ্চয় বান্দার ইচ্ছা ও শক্তি রয়েছে, যা দ্বারা তাদেরকে যে সকল কাজের সামর্থবান করেছেন তা সম্পাদন করে এই বিশ্বাস রেখে যে আল্লাহ্ যা চান শুধু মাত্র তাই হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ [العنكبوت/٦٩]

যারা আমার পথে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো। (সূরা-আল-আন্‌কাবুত আয়াত- ৬৯)

আর নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দার ও তার কর্মের সৃষ্টি কর্তা আর তারাই এই কর্ম গুলো প্রকৃত পক্ষে সম্পাদনকারী। ওয়াজেব ছাড়াতে ও হারাম কাজ করাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে কারো কোন হুজ্জাত বা দলীল দাঁড় করানোর সুযোগ নেই, বরং বান্দাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পূর্ণ দলীল রয়েছে। বিপদ-আপদে ভাগ্যকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হলেও নিন্দনীয় ও পাপের কাজে ভাগ্যের অযুহাত দেয়া বৈধ নয়।

❖ প্রশ্ন-৫। কাজ কয় প্রকার? বান্দাদের কর্ম সমূহ কি?

উত্তরঃ যে সকল কাজ আল্লাহ তা'আলা এই নিখিল বিশ্বে সৃষ্টি করেছেন তা দু' ভাগে বিভক্তঃ

প্রথমঃ আল্লাহ্ তা'আলার কর্ম সমূহের মধ্যে যে সকল কর্ম তাঁর সৃষ্টি জীবের মাঝে পরিচালনা করেন, তাতে কাহারো কোন প্রকার ইচ্ছা ও ইখ্‌তিয়ার নেই। বস্তুর সকল ইচ্ছা আল্লাহর জন্য। যেমন জীবিত করা মৃত্যু দান করা সুস্থ্য ও অসুস্থ্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ আর আল্লাহই তোমাদের ও তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আস্ সাফ্‌ফাত ৯৬) তিনি আরো বলেনঃ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ যিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদেরকে পরিক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ট? (সুরা-আল মূল্‌ক আয়াতঃ ২)

দ্বিতীয়ঃ আর যে সকল কর্ম সৃষ্টিজীব সম্পাদন করে থাকে, তা সবই ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। আর ইহা সম্পাদন কারীর ইখ্‌তিয়ার ও ইচ্ছায় সংঘঠিত হয়, কারণ ইহা আল্লাহ্ তাদের উপর অর্পণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ "যে তোমাদের মধ্যে সোজা পথে চলতে চায়।" (সূরা আল-তাকভীর, আয়াত-২৫)

তিনি আরো বলেনঃ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ "অতএব যার ইচ্ছা হয় ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফুরী করুক।" (সূরা আল-ক্বাহাফ, :২৮)

ভাল কাজ সম্পাদনের জন্য তারা প্রশংসার হক্বদার, আর খারাপ কাজ করার জন্য তারা অপমানের হক্বদার। আল্লাহ্ শুধু মাত্র ঐ কাজ করার জন্য শাস্তি দিবেন, যাতে বান্দার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ "আর আমি বান্দাদের উপর জুলুমকারী নই।" (সূরা ক্বাফ, আয়াত-২৯)

আর মানুষ ইচ্ছা ও নিরুপায়ের পার্থক্য জানে। যেরূপ কেহ ছাদ হতে সিঁড়ি বেয়ে নিজ ইচ্ছায় অবতরণ করেন, আর কখনো কেহ্ তাকে ছাদ হতে ফেলে দিতে পারে। প্রথম উদাহরণ হল ইচ্ছার, আর দ্বিতীয় উদাহরণ হল নিরুপায়ের।

❖ প্রশ্ন-৬। আল্লাহর সৃষ্টি ও বান্দার কর্মের মাঝে সমঝতা কি?

উত্তরঃ আল্লাহ্ বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন ও তার (বান্দার) কর্ম সমূহকে সৃষ্টি করেছেন। ও তাকে ইচ্ছা ও শক্তি দিয়েছেন। তাই বান্দাই প্রকৃত পক্ষে তার কর্মের সম্পাদন কারী। সারাসরি তা আদায় কারী, কারণ তার ইচ্ছা ও শক্তি রয়েছে। অতঃপর সে যদি ঈমান আনে তবে সে তার ইচ্ছায় ও ইরাদায় ঈমান আনলো। আর সে যদি কুফুরী করে তবে সে তার ইচ্ছায় ও পূর্ণ ইরাদায় কাফের হল। যেমন আমরা বলে থাকি যে, এই ফল এই গাছের আর এই ফসল এই ক্ষেতের। অর্থ হলঃ নিশ্চয় ইহা হতে উৎপন্ন হয়েছে। আর আল্লাহর দিক হতে, এর অর্থ হবেঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ ইহাকে ইহা হতে সৃষ্টি করেছেন। এই দুইয়ের মাঝে কোন প্রকারের বিরোধ নেই।

আর এর দ্বারা (শারউল্লাহ) আল্লাহর প্রনয়ণ ও তাঁর নির্ধারণ এক বলে বিবেচিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات/٩٦] অর্থঃ অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্ম সমূহকে সৃষ্টি করেছেন। *(সূরা আস্ সফ্ফাত, আয়াত-৯৬)* তিনি আরো বলেনঃ

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى [الليل/٥-١٠]

অর্থঃ অতএব যে দান করে এবং আল্লাহ্ ভীরু হয়, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব, আর যে

কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয়, এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের জন্যে সহজ পথ দান করব। (সূরা আল-লাইল, আয়াত-৫-১০)

❖ প্রশ্ন-৭। ভাগ্যের ব্যাপারে বান্দার করণীয় কি?

উত্তরঃ ভাগ্যের ব্যাপারে বান্দার করণীয় কাজ হল দু'টিঃ

প্রথমঃ সাম্ভব্য কাজ সম্পাদনের ও সতর্কিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। তাঁর কাছে (আল্লাহর কাছে) আরো চাইবে যেন তাকে সহজ সাধ্য কাজ সহজ করেদেন, আর কঠিন সাধ্য কাজ হতে তাকে বিরত রাখেন।আর তাঁর উপর ভরসা করবে ও তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে। অতঃপর কল্যাণ অর্জনের জন্য ও অকল্যাণ বর্জনের জন্য তাঁর নিকটেই মুখাপেক্ষী হবে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

তোমার কল্যাণকর কাজের প্রতি আগ্রহবান হও, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অপারগতা প্রকাশ করিওনা। আর তুমি যদি কোন কষ্টের সম্মখীন হও তবে এই রুপ বলিওনা যে আমি যদি এই কাজ করতাম তাহলে এই হত। বরং বল যে, আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন ও চেয়েছেন তাই করেছেন, কারণ যদি কথাটি শায়তানের কর্ম খুলে দেয়।

দ্বিতীয়ঃ বান্দা তার জন্য নির্ধারিত বিষয়ের উপর ধৈর্য ধারণ করবে, ঘাবড়াবেনা। অতঃপর জানবে যে, নিশ্চয় ইহা আল্লাহর পক্ষ হতে, সুতরাং সন্তোষ্ট চিত্তে মেনে নিবে। আরো জ্ঞাত হবে-যে বিপদ তাকে আক্রমন করেছে তা ভূল করে আসেনি। আর যে বিপদ তোমাকে আক্রমন করেনি তা তার জন্য আসার ছিলনা। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك

আরো জ্ঞাত হবে-যে বিপদ তোমাকে আক্রমন করেছে তা তোমাকে ভুল করে আসেনি। আর যে বিপদ তোমাকে আক্রমন করেনি তা তোমার জন্য আসার ছিলনা। (জামিউল আহাদীস: ৩৭৯৩৪, কানযুল উম্মাল: ২৯৪৬৭)

❖ প্রশ্ন-৮। ভাগ্য ও ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য কেন?

উত্তরঃ ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য। কেননা ইহা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার অন্তর্ভুক্ত। তাই সকল মু'মিনের পক্ষে আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য। কারণ আল্লাহর কর্ম ও ফায়সালা সকলই ভাল (ন্যায় পরায়ণ) ইনসাফ ভিত্তিক হিক্মাত পূর্ণ।

সুতরাং যার আস্থা থাকবে যে, নিশ্চয় যা (সুখ-দুঃখ) তাকে পৌঁছিয়াছে তা তাকে ভূল করার ছিলনা আর যা তাকে ভূল করেছে তা তাকে পৌঁছার ছিলনা সে পেরেশানী ও সন্দেহ্ হতে বেঁচে থাকবে। আর তার জীবন হতে ব্যাকুলতা ও দোদুল্যমানতা দূর হবে। চলে বা হারিয়ে যাওয়া বস্তুর উপর চিন্তিত হবে না। আর তার ভবিষ্যৎ কে ভয় পাবেনা। আর এর মাধ্যমে সে সব চাইতে সৌভাগ্য পূর্ণ হবে, আত্মার দিক দিয়ে সব চাইতে পূত-পবিত্র হবে, আর সব চাইতে শান্ত হবে।

আর যে জানতে পারবে যে, তার বয়স সীমিত, রুযী পরিমিত, সে নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারবে যে, কাপুরুষত্বা বয়স বাড়াতে পারে না। কার্পন্নতা রুযী বাড়াতে পারে না। তাহলে সবই লিখিত রয়েছে। বিপদের উপর ধৈর্য ধারণ করবে, পাপ ও ত্রুটি পূর্ণ কর্ম সম্পাদন করার কারনে ক্ষমা চাইবে। আর আল্লাহ্ যা (তার জন্য) নির্ধারণ করেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তবেই আদেশের আনুগত্য আর বিপদের উপর ধৈর্য ধারণের মাঝে সমন্বয় গড়তে সক্ষম হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [التغابن/١١]

অর্থঃ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রকার বিপদ আসে না, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। *(সূরা আত্‌তাগাবুন, আয়াত-১১)*

তিনি আরো বলেনঃ

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

অর্থঃ অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আপনি আপনার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। *(সূরা গাফের, আয়াত-৫৫)*

❖ প্রশ্ন-৯। হিদায়াত কয় প্রকার?

উত্তরঃ হিদায়াত দু' প্রকারঃ (হিদায়াতের দু'টি অর্থ)

প্রথমঃ হিদায়াত অর্থঃ সত্যের সন্ধান দেওয়া, সৎপথ প্রর্দশন করা। আর সকল সৃষ্টি জীবই এর মালিক। আর সকল রাসূল ও তাঁদের অনুসারীগণ এরই মালিক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [الشورى/٥٢]

"নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।" (সূরা আশ্‌শুরা, আয়াত-৫২)

দ্বিতীয়ঃ হিদায়াত এর অর্থ আল্লাহ কর্তৃক বান্দাদেরকে (ভাল কাজের) তাওফীক প্রদান করা ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠা বা অটল রাখা, (আর ইহা) তাঁর মুত্তাকীন বান্দাদের জন্য দয়া ও অনুগ্রহ স্বরূপ। আর এই হিদায়াতের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"আপনি যাকে ভালবাসেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন।" (সূরা আল-ক্বসাস৫৬)

❖ প্রশ্ন-১০। কুরআনে বর্ণিত (আল্লাহর) ইরাদা কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ ইরাদা দুই প্রকার,

প্রথমঃ ইরাদা কাউনিয়া ক্বাদারিয়া, তা হল সকল সৃষ্টিকূলের তরে নির্ধারিত ঘটনীয় ইচ্ছা, সুতরাং আল্লাহ্ যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। আর ইহা (ইরাদা কাউনিয়া ক্বাদারিয়া) অবশ্যই পতিত হবে। কিন্তু ইরাদা শারয়ীয়া এর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (ইহাকে) ভালবাসা ও এর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া জরুরী নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ [الأنعام/١٢٥]

"আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য খুলে দেন।" (সূরা আনআম, আয়াত-১২৫)

দ্বিতীয়ঃ ইরাদা দ্বীনিয়া শারয়ীয়া, তা হল ধর্মীয় নির্দেশ বা উদ্দেশ্য ও তার আহল অনুসারী কে ভালবাসা ও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। ইরাদা দ্বীনিয়া শারয়ীয়া বাস্ত বায়িত হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত এর সাথে ইরাদা কাউনিয়া সংযুক্ত না হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ চান, তোমাদের জন্য কঠিনতা চান না। (সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-১৮৫)

আর ইরাদা কাউনিয়া অধিক ব্যাপক, কারণ সকল শারয়ী উদ্দেশ্য যা বাস্তবায়িত হয় তা সৃষ্টিগত দিক হতেও বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য উদ্দেশ্যিত।

আর পতিত সকল কাওনী উদ্দেশ্য বা ঘটমান ইচ্ছা শরীয়াতে তা উদ্দেশ্যিত নয়। যেমন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঈমানের মাঝে উভয় প্রকার ইরাদা বা ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়েছিল। আর আবু জাহল এর কুফুরীতে শুধুমাত্র ইরাদা কাওনিয়া বা ঘটমান ইচ্ছা ছিল। আর যাতে ইরাদা কাউনিয়া পাওয়া যাবে না, যদিও তা শারীয়াতের দিক থেকে প্রত্যাশিত, যেমন আবু জাহেলের ঈমান। সুতরাং যদি ও আল্লাহ্ নাফারমানী পূর্ণ ইচ্ছা করেন ঘটবার দিক থেকে, এবং

সৃষ্টিগত দিক থেকে তা চান কিন্তু তা দ্বীন হিসাবে পছন্দ করেন না, ভালবাসেন না, ও তার প্রতি নির্দেশ ও দেন না। বরং তার প্রতি বিদ্বেষ রাখেন, অপছন্দ করেন, তা হতে নিষেধ (বান্দাদেরকে) করেন ও তা সম্পাদন কারীকে সাবধান করেন।

আর এসব তাঁরই নির্ধারণ তবে আনুগত্য পূর্ণ কর্ম ও ঈমান আনা নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে ভালবাসেন, এবং এর নির্দেশ দেন, এবং এর সম্পাদন কারীকে নেকী ও সুন্দর প্রতিদানের ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) দিয়েছেন, তাঁর ইরাদা ছাড়া তাঁর নাফারমানী করা যায় না। আর আল্লাহ্ তা'আলা যা চান শুধু তাই পতিত হয়। আল্লাহ্ তা'আল বলেনঃ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ "(আল্লাহ) তাঁর বান্দাদের জন্য কুফুরী পছন্দ করেন না। (সূরা আয্যুমার, আয়াত-৭)

তিনি আরো বলেনঃ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ [البقرة/٢٠٥] "আল্লাহ্ ফাসাদ (অশান্তি) পছন্দ করেন না। (সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-২০৫)

❖ প্রশ্ন-১১। ভাগ্যের সাথে আসবাব এর প্রভাব কি এবং ভাগ্যের রহস্য কি?

উত্তরঃ- ঐ সকল আস্‌বাব বা কারণ সমূহ যা ভাগ্য পরিবর্তন করে। আল্লাহ্ এই ভাগ্যের জন্য কিছু কারণ তৈরী করে রেখেছেন যা ইহাকে পরিবর্তন ও প্রতিরোধ করে। যেমন-দু'আ, সাদাকাহ্ ঔষধ, সতর্কতা অবলম্বন, (নিজের) কর্ম দক্ষতা ব্যাবহার করা, কারণ সবই আল্লাহর ফায়সালা ও তাঁর ভাগ্য নির্ধারণ, এমনকি অপারগতা- অক্ষমতা ও বিজ্ঞতা-বুদ্ধিমত্তা।

ভাগ্যের মাস্‌আলা বা বিষয়টি আল্লাহর সৃষ্টি জীবের মাঝে তাঁর একটি রহস্যময় বিষয়। ভাগ্য নির্ধারণ আল্লাহর গোপন রহস্য, তাঁর সৃষ্টি জীবের মাঝে এ কথাটি শুধু মাত্র ভাগ্যের গোপন দিকের জন্য প্রযোয্য। কারণ সকল জিনিসের হাকীকাত শুধুমাত্র আল্লাহ্ জানেন। মানুষ তা অবগত হতে পারে না। যেমন আল্লাহ্ পথ ভ্রষ্ট করেন, হিদায়াত করেন, মৃত্যু দান করেন, জীবিত করেন, নিষেধ করেন, ও কিছু প্রদান করেন।

যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যখন ভাগ্যের কথা স্বরণ হবে তখন তোমরা তা নিয়ে তর্ক বির্তকে লিপ্ত না হয়ে চুপ থাকবে। (*মুসলিম*)

ভাগ্যের ব্যপারে আলী (রাযিঃ) এর বক্তব্য:

فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدر فقال بحر عميق فلا تلجه قال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدر قال سر الله فلا تتكلفه

অর্থ:- ... জঙ্গে জামাল-এ অংশগ্রহণকারী এক ব্যক্তি আলী (রযিঃ) কে জিজ্ঞেস করল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাদেরকে কদর (ভাগ্য) সম্পর্কে বলুন। তখন আলী (রাযিঃ) বললেন; কদর হচ্ছে গভীর সমুদ্র তুমি তাতে প্রবেশ

করবে না। সে আবার একই প্রশ্ন করল। তখন আলী (রাযিঃ) বললেন, কদর আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে এক গোপন রহস্য, তুমি তা জানার চেষ্টা করবে না।

[কানযুল উম্মাল ১৫৬৭, জামেউল আহাদীস ৩২৭৬৬]

তবে ভাগ্যের অন্যান্য দিক ও তাঁর মহা হিক্‌মাত স্তর, মর্যাদা ও তাঁর প্রভাব মানুষের নিকট বর্ণণা করাও তা তাদেরকে জানানো বৈধ রয়েছে। কারণ ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের রুক্‌ন সমূহের একটি অন্যতম রুক্‌ন, যা শিক্ষা করাও জানা একান্ত কর্তব্য। যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন জিব্‌রীল (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ঈমানের রুক্‌ন সমূহ উল্লেখ করেন তখন বলেনঃ উনি হলেন জিব্‌রীল তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমণ করেছেন।

❖ প্রশ্ন-১২। ভাগ্যের দ্বারা দলীল দেওয়ার মাস'আলা কি?

উত্তরঃ- ভবিষ্যতে কি হবে বা না হবে এই সর্ম্পকে আল্লাহর পূর্ব জ্ঞান, (ইহা) অদৃশ্য ইহা তিনি ব্যতীত কেহ জানেনা। (ইহা) মানুষ ও জ্বিনদের অজানা। এতে কোন ব্যক্তিরই স্বীয় পক্ষ গ্রহণের দলীল নেই। আর যে বিষয় ফায়সালা হয়ে গেছে তার উপর ভরসা করে কর্ম ত্যাগ করা ঠিক নয়। সুতরাং ভাগ্য আল্লাহর বিরুদ্ধে ও তাঁর সৃষ্টির কাহারো জন্য দলীল বা হুজ্জাত নয়।

যদি খারাপ কাজ করার উপর ভাগ্যের দ্বারা দলীল দেওয়া বৈধ হতো, তাহলে অত্যাচারী শাস্তি প্রাপ্ত হতনা, মুশরিক ব্যক্তি হত্যা হতো না, হদ্ বা বিধান প্রতিষ্ঠিত হতনা, আর কেহ্ অত্যাচার করা হতে বিরত থাকতো না। আর ইহা দ্বীন ও দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করার মাধ্যম হত, যার ভয়াবহতা সকলের জানা।

আর যারা ভাগ্য দ্বারা দলীল দেয়, তাদেরকে আমরা বলবো তুমি জান্নাতী না জাহান্নামী এ ব্যাপারে তোমার নিকট নিশ্চিত জ্ঞান নেই। আর যদি তোমার নিকট এই ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান থাকত অবশ্যই আমরা তোমাকে সৎকাজের আদেশ দিতাম না ও অন্যায় থেকে নিষেধও করতাম না। বরং তুমি কর্ম সম্পাদন কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে তাওফীক প্রদান করবেন, আর তুমি জান্নাত বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কিছু কিছু সাহাবা যখন ভাগ্যের হাদীস সমূহ শুনতেন তখন বলতেনঃ এখন তুমি আমার চাইতে বেশী প্রচেষ্টাকারী নও। (অর্থাৎ আমি বেশী প্রচেষ্টাকারী)। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আত্নপক্ষ সমর্থনে ভাগ্যের দ্বারা দলীল দেওয়া সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) إِلَى قَوْلِهِ (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) (صحيح مسلم)

অর্থঃ তোমরা কর্ম সম্পাদন করতে থাকো যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজ সাধ্য হবে, সুতরাং যারা সৌভাগ্যবান হবে তাদেরকে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের যে কাজ সেই কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। আর যারা দূর্ভাগ্যবান হবে, তাদেরকে তাদের দূর্ভাগ্যবান ব্যক্তিদের যে কাজ সেই কাজ সহজ করে দেওয়া হবে। অতঃপর নিম্নের আয়াত পাঠ করলেনঃ

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى [الليل/٥-١٠]

অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয়, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয়, এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। *(সূরা আল-লাইল, আয়াত-৫-১০)*

যেমন পরীক্ষার হলে যে ছাত্র ভুল লিখে তাকেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহযোগিতা দেয়া হয়। আবার যে সঠিক উত্তর লিখে তাকেও একই রকম সহযোগিতা করা হয়। কাউকে ভুল ধরিয়ে দেয়া হয় না। কারণ এই তিন ঘন্টা তাকে স্বাধীনমত ইচ্ছামত লিখতে দেয়া হয়েছে। তারপর খাতা দেখে পরে নাম্বার দেয়া হবে। ঠিক তেমনি দুনিয়াতে আল্লাহ (সুবঃ) আমাদেরকে পরীক্ষার ময়দানে ছেড়ে দিয়েছেন। এখানে যে যা করতে চায় আল্লাহ (সুবঃ) তাকে সেই কাজ করার সুযোগ করে দেন। ফলাফল হবে কিয়ামতে।

❖ প্রশ্ন-১৩। আসবাব বা (মাধ্যম সমূহ) গ্রহণ করার ব্যাপারটি কিরূপ?

উত্তরঃ- বান্দার নিকট দু' প্রকার কাজ উপস্থিত হয়ঃ

- এমন কর্ম যাতে বাহানা বা অজুহাত রয়েছে তা সম্পাদনে সে অপারগ নয়।
- এমন কর্ম যাতে বাহানা ও অজুহাতের অবকাশ নেই, তা পালনে সে ধৈর্য ধারণ করে না। আল্লাহ্ তা'আলা বিপদ পতিত হওয়ার পূর্বেই বিপদ সর্ম্পকে জানেন।

তাঁর (আল্লাহর) বিপদ সর্ম্পকে জ্ঞান রয়েছে এর অর্থ এই নয় যে, তিনিই বিপদ গ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদে পতিত করেছেন, বরং এই বিপদ পতিত হয়েছে এর নির্ধারিত কারণ সমূহের দ্বারাই। যদি বিপদ হতে রক্ষাকারী মাধ্যম যা ব্যবহার ও গ্রহণ করার জন্য ইসলামী শরীয়াত অনুমতি দিয়েছেন পরিত্যাগ করার কারণে পতিত হয়, তবে সে নিজেকে হিফাজত না করার কারণে ও তাঁকে বিপদ হতে রক্ষাকারী মাধ্যম গ্রহণ না করার কারণে দোষী হবে। আর যদি এই বিপদ প্রতিরোধ করার তার ক্ষমতা না থাকে তবে সে মা'জুর হবে। সুতরাং মাধ্যম

গ্রহণ করা ভাগ্য ও ভরসার পরিপন্থী নয় বরং ইহা (মাধ্যম গ্রহণ করা) এরই (ভাগ্য ও ভরসারই) অন্তর্ভুক্ত।

আর যখন ভাগ্য পতিত হয়ে যায় তখন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ও তা মেনে নেয়া ওয়াজিব হয়ে যায় ও নিম্নের কথার দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করবে। قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ অর্থঃ আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন ও চেয়েছেন তাই করেছেন। তবে ভাগ্য পতিত হওয়ার পূর্বে মানুষের দায়িত্ব হল বৈধ মাধ্যম গ্রহণ করা ও ভাগ্যের দ্বারা ভাগ্যের প্রতিরোধ করা। নাবীগণ নিজেদেরকে নিজেদের শত্রু থেকে হিফাযতকারী পদ্ধতি ও মাধ্যম গ্রহণ করেছিলেন, অথচ তাঁরা আল্লাহর ওয়াহীও নিরাপত্তা দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল ভরসা কারীদের নেতা ছিলেন, তা সত্বে ও তিনি মাধ্যম গ্রহণ করতেন আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা থাকার পরও।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ».

দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা, সবল মু'মিন আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম ও প্রিয়, তবে উভয়ের মাঝে কল্যাণ নিহত রয়েছে। যা তোমাকে উপকার করবে তা আদায়ে তুমি আগ্রহী হও। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর অপারগতা প্রকাশ করিওনা। তোমাকে কোন বিপদ স্পর্শ করলে তুমি বলিওনা যে নিশ্চয় আমি এই কাজ করলে এই এই হতো বরং তুমি বলঃ আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন ও চেয়েছেন তাই করেছেন। কারণ (لو) "যদি" শব্দটি শায়তানের কর্মকে খুলে দেয়। (মুসলিম)

❖ প্রশ্ন-১৪। ভাগ্যকে অস্বীকার কারীর বিধান কি?

উত্তরঃ- যে ব্যক্তি ভাগ্যকে অস্বীকার করল সে ইসলামী শরীয়াতের মূলনীতি সমূহের একটি অন্যতম মূলনীতিকে অস্বীকার করলো। আর এর মাধ্যমে সে কুফুরী করলো। কিছু কিছু সালাফ সালেহ্ বলেনঃ "তোমরা কাদরীয়াহ সম্প্রদায়ের সাথে জ্ঞান দ্বারা মুনাযারা কর, তারা যদি অস্বীকার করে তাহলে তারা কুফুরী করলো আর যদি তারা স্বীকার করে তাহলে তারা (তোমাদের সাথে) ঝগড়া করলো।"

❖ প্রশ্ন-১৫ । ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনার ফলাফল কি?

উত্তরঃ- ফায়সালা ও ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনার অনেক শুভ-পরিনাম সুন্দর প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব রয়েছে যা জাতীয় ও ব্যক্তি জীবনে কল্যাণ নিয়ে আসে ।

(ক) নিশ্চয় ইহা (ভাগ্যের প্রতি ঈমান) বিভিন্ন প্রকার নেক আমল ও ভাল গুন অর্জন করার সুযোগ জন্ম দেয় । যেমন আল্লাহর ইখ্‌লাস বা একনিষ্ঠতা, তাঁর উপর ভরসা করা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর কাছে কিছু পাওয়ার আশা করা, তাঁর প্রতি ভাল ধারণা রাখা ধৈর্য ধারণ করা, প্রখর সহনশীলতা, নৈরাশ্যতা দূর করা, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, একমাত্র আল্লাহর শুকরিয়া করা, তাঁর অনুগ্রহ দয়া পেয়ে খুশী হওয়া । একমাত্র আল্লাহর জন্য বিনয় নম্রতা প্রকাশ করা, উদাসিনতা ও অহংকার ত্যাগ করা । আল্লাহর প্রতি ভরসা করতঃ ভাল পথে ব্যায় করার মন মানুষিকতা ও সৃষ্টি করে । বীরত্ব সৃষ্টি করে, ভাল কাজ করার দিকে অগ্রসর করে, অল্পে তুষ্ট থাকার গুন তৈরী করে, আত্ম সম্মানী করে, উচ্চাভিলাশী করে, কর্ম দক্ষতা সৃষ্টি করে, কর্ম সম্পাদনের প্রচেষ্টা তৈরী করে সুখে-দুখে মধ্য পথ অবলম্বনকারী তৈরী করে, হিংসা ও প্রতিবাদ করা থেকে নিরাপদে রাখে । বাজে গাল- গল্প বাতিল কাজ হতে বিবেককে মূক্ত রাখে । আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তির ব্যবস্থা করে ।

(খ) ভাগ্যের প্রতি ঈমান ওয়ালা ব্যক্তি তার জীবনে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত হয় । অধিক নি'য়ামত তাকে পথ ভ্রষ্ট করতে পারে না, আর বিপদে নৈরাশ হয় না । আর সে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, তাকে যে বিপদ র্স্পশ করেছে তা (তার জন্য) আল্লাহর নির্ধারণ মাত্র, তার পরিক্ষা স্বরুপ । ঘাবড়ায় না বিচলিত হয় না । বরং ধৈর্য ধারণ করে ও নেকীর আশা রাখে ।

(গ) নিশ্চয় ইহা পথ ভ্রষ্টের কারণ সমূহ ও জীবনের অশুভ সমাপনী হতে হেফাজত করে । ইহা তার জন্য (মু'মিনের জন্য) সঠিক পথে প্রতিষ্ঠা থাকার স্থায়ী প্রচেষ্টা, নেক কাজ বেশী বেশী করার সুযোগ, নাফারমানী পূর্ণ ও ধ্বংসাত্বক কাজ থেকে বিরত থাকার সুযোগ করে দেয় ।

(ঘ) নিশ্চয় ইহা মু'মিনদের জন্য সুদৃঢ় অন্তর ও পূর্ণ বিশ্বাসের দ্বারা ভয়ানক ও কঠিন কর্মকে প্রতিহত করার মনোভাব তৈরী করে দেয়, মাধ্যম বা উপকরণ গ্রহণ করার সাথে । নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

কি আর্শ্চয্য! নিশ্চয় মু'মিনের সকল কর্মই ভাল, আর ইহা শুধু মু'মিনদের জন্য খাস। যদি তাকে কোন আনন্দ স্পর্শ করে সে আল্লাহর প্রশংসা করে, ফলে তা তাঁর জন্য কল্যাণ হয়। আর যদি তাকে কোন বিপদ স্পর্শ করে সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণ হয়। (মুসলিম)

কুফর ও তার প্রকারভেদ

প্রশ্ন-১। কুফর কি?

উত্তরঃ কুফর শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন কিছুকে ঢেকে রাখা, গোপন করা। 'কুফর' হচ্ছে এক ধরনের মুর্খতা বরং কুফরই হচ্ছে আসল মুর্খতা। শরীয়তের ভাষায় কুফর বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে- রাসূল(সাঃ) যে শরীয়ত আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন তার মূল বিষয় সমূহ যেগুলি অপরিহার্য, অপরিবর্তনীয় এবং অলঙ্ঘনীয় হুকুম রূপে মেনে চলার জন্য মানব জাতির কাছে উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করা বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকে কুফরী কাজ বা কুফরী বলে। যে ব্যক্তি এই কুফরীতে লিপ্ত হবে সে কাফেরে পরিণত হবে। যেমন, ইসলাম বিরোধী কোন বিধানকে বিশ্বাস করা এবং নবী (সাঃ) এর আনীত বিধানকে কিংবা বিধানের যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের। আবার ইসলামকে মানে এবং ইসলামের বিরোধী হুকুম-গুলিকেও মানে এমন ব্যক্তিও মুশরিক কাফের।

❖ প্রশ্ন-২। কুফর কয় ধরনের ও কি কি?

উত্তরঃ কুফর দুই ধরনেরঃ ১। কুফরে আকবার বা বড় কুফরী - যে ধরনের বড় কুফর কাউকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। ২। কুফরে আসগার বা ছোট কুফরী- যে কুফরী ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

❖ প্রশ্ন-৩। বড় কুফর কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ বড় কুফর কুফরকারীকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর তা হল বিশ্বাসের মধ্যে কুফরী। তার পাঁচ শ্রেণী রয়েছেঃ

১. كفر الكذب মিথ্যার কুফরঃ

কুরআন ও হাদীসকে অস্বীকার করা; অথবা তাদের কোন অংশকে। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ [العنكبوت/٦٨

"ওর থেকে কে বড় জালেম হতে পারে যে আল্লাহ্র (সুব) উপর মিথ্যা কথা বলে অথবা সত্য তার কাছে সমাগত হলে তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। জাহান্নাম কি কাফেরদের থাকার জন্য যথেষ্ট নয়?" (সূরা আনকাবুত ২৯ঃ ৬৮)

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ [البقرة/٨٥]

"তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর?" (সূরা আল-বাক্বারা ২ঃ ৮৫)

২. كفر العناد **অস্বীকার ও অহঙ্কারের কুফরঃ** তা হল সত্যকে জেনেও তার অনুসরণ না করা যেমন ইবলিস করেছিল। তার প্রমাণ আল্লাহ্ বলেনঃ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ [البقرة/٣٤]

"যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সেজদা করার জন্য তখন সকলে সেজদা করল ইবলিস ছাড়া। ইবলিস অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা বাকারা ২ঃ ৩৪)

৩. كفر الشك **সন্দেহ জনিত কুফরঃ** কিয়ামতের দিনের সম্বন্ধে সন্দেহ বা মিথ্যা ধারণা পোষণ করা অথবা তাকে অস্বীকার করা এবং তাকে সত্য বলে না মানা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا [الكهف/٣٦، ٣٧]

"আমার মনে হয় না কেয়ামত ঘটবে এবং যদিও আমি আমার প্রতিপালকের কাছে ফেরত যাই অবশ্যই এর থেকে ভাল জিনিস সেখানে পাব। তাকে তার ঐ সাথী বলল যিনি তার সাথে কথা বলছিলেনঃ কিভাবে তুমি তাকে অস্বীকার কর যিনি তোমাকে মাটি হতে, সৃষ্টি করেছেন, তারপর মনি হতে, তার পর পূর্ণ মানুষ বানিয়েছেন।" (সূরা কাহাফ ১৮ঃ ৩৬-৩৭)

৪. كفر الاعراض **মুখ ফিরিয়ে নেয়া বা বিমুখতার কুফরঃ** ইসলাম যা দাবি করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং তাতে বিশ্বাসও না করা।

তার প্রমাণ- আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ

"যারা অস্বীকার করে ঐ সমস্ত জিনিসকে যে সম্বন্ধে তাদের ভয় দেখান হয় এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (সূরা আহ্কাফ ৪৬ঃ ৩)

৫. كفر النفاق **নিফাকীর কুফরঃ** তা হল মুখে ইসলামকে প্রকাশ করা এবং অন্তরে ও কাজে তার বিরোধিতা করা। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ [المنافقون/٣]

"এটা এজন্য যে, তারা ঈমান এনেছিল, তারপর কুফরী করেছে ফলে তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে ফলে তারা আর বুঝতে পারে না।" (সূরা মুনাফিকুন ৬৩ঃ ৩) অন্যত্র বলেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [البقرة/٨]

"মানুষদের ভিতরে অনেকে আছে যারা মুখে বলে- আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর ঈমান এনেছি কিন্তু সত্যিকার অর্থে আনেনি।" (সূরা আল বাকারা ২ঃ ৮)

❖ প্রশ্ন-৪। ছোট কুফর কি?

উত্তরঃ- ছোট কুফরী ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। এটি হচ্ছে নিয়ামতের কুফ্র। এর প্রমান আল্লাহ্র বাণী-

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

অর্থ ঃ "আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারনে স্বাদ আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির।" (সূরা নাহাল ঃ ১১২)

তাকফীর

❖ প্রশ্ন-১। তাকফীর কি?

উত্তরঃ তাকফীর মানে হচ্ছে কুফরী আরোপ করা, কাউকে কাফের বলে ঘোষনা দেয়। তাকফীর হচেছ, একজন মুসলিম যে কথা বা কাজের মাধ্যমে কুফরী করে তার ব্যাপারে ফায়সালা করা। তাকফীর করার জন্য অনেকগুলো শর্ত, মূলনীতি রয়েছে যা একজনকে অবশ্যই জানতে হবে।

❖ প্রশ্ন-২। তাকফীরের ব্যাপারে আমাদের মূলনীতি কি?

উত্তর- আহলে কিবলার অনুসারী কাউকে আমরা তাকফীর করি না পাপের কারনে, যদি সে এই পাপকাজকে হালাল মনে না করে। সুতরাং পাপী, সীমালংঘনকারীদের আমরা তাকফীর করি না ।

আমাদের কিবলার অনুসারী লোকদেরকে আমরা মুসলিম এবং ইমানদার হিসেবে গ্রহণ করি যতক্ষন না তার থেকে দ্বীন ধ্বংসকারী কোন বিষয় প্রকাশিত না হয় এবং তাকে তাকফীর করতে বাধা দেয় এমন কোন জিনিস বা কারণ বিদ্যমান থাকে।

আমরা বিশ্বাস করি যদি তাওহীদ সহ কোন বান্দা মারা যায় তার কবীরাহ গুনাহ থেকে তাওবাহ না করলেও তা যতই হোক সে তার শাস্তি ভোগ করার পর, অথবা শাফায়াতের মাধ্যমে, অথবা আল্লাহর ক্ষমার মাধ্যমে একদিন না একদিন জান্নাতে যাবে, যখন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। খাওয়ারিজদের[৩] মত কবীরাহ গুনাহের কারনে আমরা কাউকে চিরকালীন জাহান্নামী বলি না। আমরা হতাশও হই না আল্লাহর রহমাহ থেকে আবার গাফেলও হই না, বরং ভয় এবং আশার সাথে মধ্যবর্তী পথ অনুসরন করি। [আমাদের আক্বীদাহ , শাইখ মাক্বদিসী]

❖ প্রশ্ন-৩। তাকফীর কিসের উপর ভিত্তি করে করা হয়?

উত্তরঃ- বাহ্যিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই ফায়সালা করা হয়, যেহেতু গায়েবের ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত কারো জানা নেই, আমরা শুধু ফায়সালা করতে পারি যা আমরা চোখে দেখি বা কানে শুনি এর উপর ভিত্তি করে। আল্লাহ সুবঃ বলেন-

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ /٥٩]

"অদৃশ্যের কুঞ্জি তহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না।" (সূরা আন'আম ৬ঃ৫৯)

---

[৩] একটি বাতিল ফেরক্বা।

এটা সুস্পষ্ট যে আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না। আমরা কোনভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না কারো অন্তরে কি আছে। এই জন্যই আমাদের ফায়সালা করতে হবে বাহ্যিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে, কথা এবং কাজের উপর। অন্তরের ব্যাপারে ফায়সালা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এই ব্যাপারটি আল্লাহর ইখতিয়ারে। এর একটি উদাহরন হচ্ছে মুনাফিক্বরা, যেহেতু তাদের অন্তরে কি আছে তা দেখা যায় না, এই জন্য বাহ্যিকভাবে তারা মুসলিম। তাদের অন্তরের বিষয়টি আখিরাতে আল্লাহ ফায়সালা করবেন, এই ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার নেই।

সুতরাং একজন তিনভাবে ইসলামের বাইরে যেতে পারে, তার বিশ্বাসের মাধ্যমে, তার কথার মাধ্যমে এবং তার কাজের মাধ্যমে। যেহেতু একজনের অন্তরে কি আছে তা জানা নেই এই জন্য ফায়সালা করা হয় বাহ্যিক বিষয়ের উপর, এবং তা হচেছ কথা এবং কাজ।

যদি একটি কুফরী কাজ করা হয় অথবা কুফরী কথা বলা হয় এবং কুরআন সুন্নাহর দালীল থেকে কুফরীর বিষয়টি স্পষ্ট হয় তাহলে অবশ্যই এর বিরুদ্ধে আমাদের কথা বলতে হবে। সেই ক্ষেত্রে তাকফীর করা ওয়াজিব।

❖ প্রশ্ন-৪। বড় কুফরী এবং ছোট কুফরী কিভাবে সাব্যস্ত করতে হবে?

উত্তরঃ দুই শ্রেনীর কুফর রয়েছে যা বুঝা প্রয়োজন:

৪. কুফর মুতলাক্বঃ স্বয়ং ঐ কাজটি যা কুফর, যা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে জড়িত নয়। যেমন, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দোয়া করার কাজটি।

৫. কুফর বুয়াহঃ এটি হচ্ছে কারো বিরুদ্ধে ফায়সালা করা যে এ কাজটি করে। যেমন, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দোয়া প্রার্থনা করে তার বিরুদ্ধে ফায়সালা করা।

অবশ্যই ফায়সালার ক্ষেত্রে অন্য দালীল দেখতে হবে যে কাজটি বড় কুফর কিনা, যা কাউকে ইসলামের বাইরে নিয়ে যায়।

ছোট কুফরের একটি উদাহরন, রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জের সময় (লোকদের উদ্দেশ্য করে) বলেন,) لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض "আমার পরে একে অন্যের গলায় আঘাত করে (একে অন্যকে হত্যা করে) কুফরীতে ফিরে যেও না।" (বুখারী)

এই বর্ননায় পরিষ্কারভাবে রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ননা করা হয়েছে যে, তোমরা আমার পরে মুসলিমরা একে অন্যকে হত্যা করে কুফরীতে ফিরে যাবে না। যাইহোক, বিষয়টি ঐ কুফরী নয় যা একজনকে ইসলামের বাহিরে নিয়ে যায়, কেননা কুরআনে বলা হয়েছে,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন।" (সূরা, হুজরাত ৪৯ঃ৯)

আল্লাহ এই আয়াতে দুইটি দল যারা পরষ্পর যুদ্ধ করে তাদেরকে ঈমানদার ও পরষ্পরের ভাই বলেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন আক্রমনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সংশোধনের উদ্দেশ্যে। সুতরাং এই দালীল থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে অন্য মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার কাজটি ছোট কুফর।

আমাদের অবশ্যই একটি কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দালীল এনে সুষ্পষ্ট হতে হবে কাজটি বড় কুফর নাকি ছোট কুফর।

বড় কুফরের কিছু উদাহরন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ [التوبة/٦٥، ٦٦]

"আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর।" (সূরা, তাওবাহ ৯ঃ৬৫-৬৬)

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا [الكهف/٣٥

"নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল: আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে।" (সূরা, কাহফ ১৮ঃ৩৫)

- অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, কুরআনে আল্লাহ সুবঃ যেখানে কুফর শব্দ ব্যবহার করেছেন সেটি সর্বদা বড় কুফর বুঝায় যা কাউকে ইসলামের বাইরে নিয়ে যায়।

▪ কিন্তু যখন সুন্নাহতে (হাদীসে) কুফর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে আমাদের বুঝতে হবে যেখানে আরবীতে আল্ কুফর ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে বড় কুফরকে নির্দিষ্ট করার জন্য, কিন্তু যদি সেটি হয় ছোট কুফর তাহলে শুধু কুফর ব্যবহার করা হয়।

কুরআনে বর্নিত বড় কুফরের উদাহরন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ [إبراهيم: ٢٨]

"তুমি কি তাদের কে দেখনি, যারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে (আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করার মাধ্যমে) এবং স্ব-জাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আলয়ে।" (সূরা, ইবরাহীম ১৪ঃ২৮)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

"আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের(মক্কার), যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের (আল্লাহর রাসুলকে অস্বীকার করার) কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির।" (সূরা, নাহল ১৬ঃ১১২)

কখনো (دليل خاص) নির্দিষ্ট দালীল (دليل عام) সাধারন দালীলের অধীনে আসে, উদাহরন স্বরূপ, কোন নির্দিষ্ট দালীল নেই যে কবরের উদ্দেশ্যে জবাই করা কুফরী অথবা কুরআনকে সৃষ্ট বলে দাবী করা, কিন্তু এগুলো সাধারন দালীলের অধীনে আসে।

❖ প্রশ্ন-৫। তাকফীরের শর্তগুলো কি কি?

উত্তরঃ- তাকফীরের শর্ত সমূহ-

১. কথা বা কাজটি প্রমানের জন্য সুনির্দিষ্ট দালীল থাকতে হবে, সাথে অন্যান্য দালীল-প্রমান দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে কাজটি কি বড় কুফর নাকি ছোট কুফর।

২. কথা বা কাজটি পরিষ্কার কুফরী হতে হবে, সকল সম্ভাব্য ভ্রান্তি পরিষ্কার করে।

❖ প্রশ্ন-৫। যাকে তাকফীর করা হবে তার কুফরী প্রমান করার জন্য তার বিরুদ্ধে কি কি শারয়ী জিনিস প্রয়োজন?

উত্তরঃ- শারয়ীভাবে যাকে তাকফীর করা হবে তার কুফরী প্রমান করার জন্য যেসব জিনিস প্রয়োজন-

১. অপরাধী ব্যক্তি তার অপরাধ স্বীকার করা। এটা হচ্ছে শক্ত প্রমান।
২. স্বাক্ষী, অপরাধ/অবস্থার আলোকে।
স্বাক্ষীর জন্য যেসব শর্ত তা পূরন করা প্রয়োজন, যেমন প্রাপ্তবয়স্ক, ন্যায় পরায়ন, অবাধ্য বা ফাসিক্ব নয় ইত্যাদি।
যদি প্রমানসমূহ পূর্ন না হয় তাহলে কোন কাজকে গ্রহণ করা যাবে না। বিস্তারিত প্রমানের ভিত্তিতে স্বাক্ষী দিতে হবে, তার নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে নয় (যেমন স্বাক্ষী যদি তার ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে কাউকে কাফের মনে করে)।
যদি স্বাক্ষীর অভাব থাকে অথবা স্বাক্ষী দিল কিন্তু স্বাক্ষী গ্রহণ করা হল না। উদাহরন স্বরূপ, যদি জ্বিনাকারকের বিরুদ্ধে চারজন স্বাক্ষীকে একত্রিত করা হয়, একজন স্বাক্ষী অনিশ্চিত হয় তাহলে সব স্বাক্ষী বাতিল হয়ে যাবে।
যদি কুফরীর ঘোষনা জনসম্মুখে হয় তবে অনেক স্কলাররাই এটাকে প্রমান হিসেবে গ্রহণ করবেন, কিন্তু আমাদের এই সময়ে যখন রয়েছে প্রচুর প্রপাগান্ডা ইত্যাদি, স্বাক্ষীর মাধ্যমে যাচাই করার ব্যাপারে পারদর্শী হতে হবে।
বাস্তবে হতে পারে একজন ব্যক্তি তার কথা বা কাজের কারনে কাফের কিন্তু শারয়ী প্রয়োজনীয় জিনিস পূরন না করার কারনে তার কুফরী প্রমান করা যায়নি এই ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে মুসলিম হিসেবে গন্য করতে হবে এবং আল্লাহ আখিরাতে তার ফায়সালা করবেন।

- একজন ব্যক্তি কাফের হয় তার বিশ্বাসের কারনে এবং তার কুফরী প্রকাশ্য নয় তার কথা বা কাজ দ্বারা, তার হিসাব হবে আল্লাহর নিকট আখিরাতে, এই দুনিয়ায় আমরা তাকে মুসলিম হিসেবে গন্য করব যদিও সে কাফের। আল্লাহ বলেন মুনাফিক্বদের ব্যাপারে-

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ [التوبة/٦٤]

"মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন কোন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক; আল্লাহ্ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ।" (সূরা, তাওবাহ ৯:৬৪)

- একজন ব্যক্তি কাফের হয় তার কথা বা কাজের কারনে কিন্তু কোন ব্যক্তি তার স্বাক্ষী নেই, তাকেও মুসলিম হিসেবে গন্য করতে হবে এবং আল্লাহ তার হিসাব নিবেন আখিরাতে।

আল্লাহ সুবঃ বলেন-

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ [التوبة/١٠١]

"আর কিছু কিছু তোমার আশ-পাশের মুনাফেক এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফেকীতে অনঢ়। তুমি তাদের জান না; আমি তাদের জানি। আমি তাদেরকে আযাব দান করব দু'বার, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহান আযাবের দিকে।" (সূরা, তাওবাহ ৯:১০১)

• একজন ব্যক্তি কুফরী করে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কুফরী প্রমান করার প্রয়োজনীয় সব জিনিস না থাকলে (যেমন স্বাক্ষীর অভাব) তাকে কাফের বলে ডাকা যাবে না এবং পার্থিব জীবনে তাকে মুসলিম এর মত আচরন করা হবে যাইহোক আখিরাতে আল্লাহ তার হিসাব নিবেন। রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুনাফিক্বদের ব্যাপারে কথা বলেছিলেন কিন্তু তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি যতক্ষন না তাদের কথা বা কাজ দ্বারা তা প্রকাশ হয়েছে এবং শারয়ী প্রয়োজনীয় সব জিনিস পূরন হয়েছে।

• একজন ব্যক্তি কুফরী করল, সে তার কুফরী স্বীকার করল এবং প্রয়োজনীয় স্বাক্ষী রয়েছে অথবা এটা জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে গেছে, তবুও তাকে ততক্ষন কাফের বলা উচিত নয়, এমনকি যদি শারয়ী সব জিনিস উপস্থিত থাকেও তবুও দেখতে হবে সব শর্ত এবং পর্যায় অতিক্রম করে কিনা যেন কোন কিছু তাকে তাকফীর করতে বাধা না দেয়।

❖ প্রশ্ন-৬। তাকফীরের জন্য তিন প্রকারের শর্তাবলী কি কি?

উত্তরঃ তাকফীরের ৩ প্রকারের শর্তাবলী হচ্ছে,

১. **বিষয়**- যে ব্যক্তি কর্ম সম্পাদন করে।

২. **কাজ**- স্বয়ং কাজটি।

৩. **প্রমান**- ঐ ব্যক্তি কাজটি করেছে তার প্রমান।

১. **বিষয়**- ঐসব শর্তাবলী যা একজনকে তাকফীর করা বৈধ করে,

(১) মুসলিম। (২) পরিণত বয়স্ক। (৩) সুস্থ মস্তিস্ক। (৪) সে জানতে হবে তার কাজটি কুফর (যেমন নও মুসলিম, তবে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, শরীক করার ক্ষেত্রে কোন ওজর চলবে না।) (৫) স্বেচ্ছায় কাজটি করা।

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب/٥]

"এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা, আহযাব ৩৩ঃ৫)

২. **কাজটি**- স্বয়ং কাজটি,

(১) সুনিশ্চিত কুফরী। (২) সুনির্দিষ্ট প্রমান থাকা কোন প্রকার সন্দেহ ব্যতীত।

৩. **প্রমান**- ঐ ব্যক্তি কাজটি করেছে তার প্রমান,

- শারয়ী বৈধ সব প্রয়োজনীয় জিনিস পূরন করা, যেমন স্বীকৃতি, স্বাক্ষী ইত্যাদি।

❖ প্রশ্ন-৭। কি কি কারণ তাকফীর থেকে বাধা দেয় বা নিবারন করে?

উত্তরঃ ঐ পরিস্থিতি যা একজন কে তাকফীর থেকে বাধা দেয়, এর সব শর্ত জানতে হবে তাকফীর করার জন্য,

১. **বিষয়**- ঐসব শর্তাবলী যা একজনকে তাকফীর করা অবৈধ করে।

২. **কাজ**- স্বয়ং কাজটি।

৩. **প্রমান**

১. **বিষয়**- ঐসব শর্তাবলী যা একজনকে তাকফীর করা অবৈধ করে তা হচ্ছে,

(১) শিশু। (২) পাগল। (৩) অজ্ঞতা। (৪) অক্ষম। (৫) বাধ্য। (৬) ভূল/ মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া। (৭) ভূল বুঝ- নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে-যদি দালীল এর ব্যাপারে ভূল বুঝ থাকে, যেমন আয়াতের ব্যাপারে ভূল বুঝ।

২. **কাজ**- স্বয়ং কাজটি।

- ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমান না থাকা।
- কথা বা কাজটির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রমান না থাকা।

৩. **প্রমানঃ** স্বাক্ষীর স্বল্পতা ইত্যাদি...

কিছু পরিস্থিতি রয়েছে যা প্রাকৃতিক এবং আল্লাহর তরফ থেকে যখন কোন অপবাদ বা গুনাহ নেই ঐ ব্যক্তির উপর যে এরূপ পরিস্থিতিতে পড়ে। যেমন, নাবালেগ, পাগল, ঘুমন্ত ব্যক্তি, যে ভুলে গেছে ইত্যাদি। যদি ঐ ব্যক্তি কারও অধিকারের কোন বস্তু নিয়ে নেয় তাহলে ঐ ব্যক্তি, তার পিতা-মাতা, অথবা তার অভিভাবক তার মূল্য পরিশোধ করবে। যেমন, কোন পাগল কাউকে হত্যা করল, তার পিতামাতা তার দিয়াত (রক্তপন) আদায় করবে। হুদুদ প্রতিষ্ঠিত হবে ঠিকই কিন্তু ঐ ব্যক্তির কোন গুনাহ নেই।

কিছু কুফরী কথা উচ্চারন করা যখন কোন কাহিনী পড়ছে বা কারো অনুকরনে এটা কুফরী হিসেবে গন্য হবে না কিন্তু কৌতুক করা বড় কুফর।

যে তাওবাহ করে তার উপর নির্দেশ বা হুকুমটি আপতিত হবে না-
১. যদি ঐ ব্যক্তিটি তাওবাহ করে তবে সে ইসলামে পুনরায় প্রবেশ করবে।
২. যদি ব্যক্তিটি তাওবাহ করতে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের এবং তাকে হত্যা করা হবে।
যদি ঐ ব্যক্তির ভূল বুঝ থাকে তাহলে তাকে তাওবাহ করতে বলা হবে, যদি সে তাওবাহ করে তাহলে সে তার উপর মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে, যদি সে তাওবাহ না করে তাহলে তাকে কাফের হিসেবে হত্যা করা হবে।

❖ প্রশ্ন-৮। কুফরীর ক্ষেত্রে ইচ্ছা শর্ত কিনা? মানুষ ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও কুফরীতে লিপ্ত হয়ে ইসলাম থেকে কিভাবে বের হয়ে যায়?

উত্তরঃ- মানুষের এমন কিছু কথা ও কাজ রয়েছে যেগুলো দ্বারা সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, যদিও তার মাঝে ইসলাম ত্যাগ করার বা কুফরী করার কোন ইচ্ছা ছিলনা এবং সে যা বলেছে তা সে নিজে বিশ্বাস করেনা।
ইবনে হাজার আসকালানি (রহঃ) বলেছেনঃ মুসলিমীনদের মধ্যে এমন আছে যারা দ্বীন ত্যাগ করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ না করা সত্ত্বেও (তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়)।*(ফাতহুল বারি (১২/৩৭৩))*
ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেন, "বাস্তব এটাই যে, কেউ যদি এমন কিছু বলে বা করে, যেটা কুফরী, সে সেই কথা বা কাজের দ্বারা কাফের হয়ে গেল, যদিও তার কাফের হওয়ার ইচ্ছা ছিল না (লাম ইয়াকসুদ) কারণ কেউই কাফের হওয়ার ইচ্ছা রাখেনা, আল্লাহ্‌র যার ব্যাপারে ফয়সালা করেছেন সে ব্যতীত। *(আস-সারিম আল মাসলুল (পৃঃ১৭৪)*
একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবেঃ একজন ব্যক্তি যদি একটি মুর্তির সামনে সিজদা করে, তাহলে এই কাজটিই কুফর হিসেবে যথেষ্ট যা দ্বারা একজন ব্যক্তি দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায়, অবশ্য সে যদি তাকফিরের অযোগ্য হয় তাহলে ভিন্ন কথা (যেমন ইকরাহ বা যবরদস্তি বা ভুলে যাওয়া)। কিন্তু তাকফিরের ক্ষেত্রে এমন কোন শর্ত নেই যে, সেই ব্যক্তির মনে এই কাজ দ্বারা কুফরী করার (বা কাফির হওয়ার) ইচ্ছা থাকতে হবে। কারণ যেসব মুশরিকীন মৃতদেরকে ইবাদাত দেয় এবং তাদের কাছে দোয়া করা তাদের রিযক ও নিরাপত্তার জন্য- তারা কোনদিন এইসব (শির্‌কী) কাজ দ্বারা কাফির হতে চায় না; বরং তারা একে আল্লাহর নিকটস্থ হওয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। তার পরও তাদের কাজ গুলো ভয়াবহ শিরক এবং রিদ্দার (দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া) কাজ, অর্থাৎ তাকে মুশরিক হিসাবে গণ্য করা যায়।

আরেকটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) অথবা তাঁর রাসূল (সাঃ) সম্বন্ধে ঠাট্টা করে বা খারাপ মন্তব্য করে, তার উপর তাকফির করার জন্য এটা জানার প্রয়োজন নেই যে সে কুফরী করতে চেয়েছিল না চায়নি; এবং (তার ওপর তাকফির করার জন্য) এটাও শর্ত নয় যে সে তার (কুফরী) কথার উপর বিশ্বাস এনেছে। বরং সে যদি ইচ্ছা সহকারে সেই বাক্য গুলো উচ্চারণ করে, (অর্থাৎ ভুল উচ্চারণের কারণে সেই কথা গুলো তার মুখ থেকে বের হয় নি), তাহলে শুধুমাত্র এই কথাগুলোই কুফর হিসেবে যথেষ্ট যা তাকে দ্বীন থেকে বহিস্কার করে দেয়।

আসলে, 'কথা বা কাজটি করতে ইচ্ছা না থাকা' এবং 'কুফরী করার ইচ্ছা না থাকা'-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। দ্বিতীয়টা- 'কুফরী করার ইচ্ছা'-এর কোন গুরুত্ব নেই (সেই ব্যক্তির উপর তাকফিরের ক্ষেত্রে) এবং 'কুফরী করার ইচ্ছা'র উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি তাকফিরের উপর কোন প্রভাব রাখে না, (যখন কোন কথা বা কাজ কুফর আল আক্‌বার হয় যার দ্বারা একজন দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত হয়)।

কিন্তু প্রথমটা- 'কথা বা কাজটি করার ইচ্ছা'- যার অর্থ হল যে সেই ব্যক্তি ইচ্ছা সহকারে কথাটি বলেছে বা কাজটি করেছে- এই বিষয়টির উপর তাকফির নির্ভরশীল, এক্ষেত্রে পরিস্থিতি যাচাই না করে তাকফির করা নিষেধ। এবং এই ক্ষেত্রে তাকফির করার পূর্বে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে এই কাজটি বা কথাটি মৃত্যুর মুখে জোর করে করানো অথবা বলানো হয়নি; অথবা উচ্চারণের ভুলে বা জ্ঞান না থাকার কারণে বলা হয়নি।

ইবনুল কাইয়ুম বলেছেনঃ যে ঘটনাটি ঘটেছিল, যে একজন লোক তার হারিয়ে যাওয়া উট ফিরে পেয়ে অতিরিক্ত খুশিতে বলে ফেলেছিলঃ "ও আল্লাহ্! তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার রব।" যদিও সে স্পষ্ট কুফর উচ্চারণ করেছিল, সে তার এই কথা দ্বারা কাফির হয়ে যায়নি। এর কারণ হচ্ছে তার সেই কথাগুলো উচ্চারন করার ইচ্ছা ছিল না। এবং (ঠিক তেমনিই) যাকে জোর করে কুফরী কথা বলানো হয়েছে, সে অবশ্যই এমন কথা বলেছে যা কুফরী, কিন্তু সে কাফির হয়ে যায়নি কারণ তার এই কথাটি উচ্চারণ করার ইচ্ছা ছিল না। (এবং) এই ব্যক্তি তার মত নয় যে ঠাট্টা করেছে (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) অথবা দ্বীন সম্পর্কে)- কারণ যে ঠাট্টা করেছে, সে স্বেচ্ছায় কুফরী কথা উচ্চারণ করেছে, যদিও সেই কথা দ্বারা হয়তবা তার কাফের হওয়ার ইচ্ছা ছিল না। এই ক্ষেত্রে (যখন কেউ ঠাট্টা করে), তার কথার দ্বারা সে অবশ্যই কুফরী এবং রিদ্দাহ করল, যদিও সে শুধু ঠাট্টা করছিল; (এর কারণ হল যে তার সেই

কথাগুলো উচ্চারণ করার ইচ্ছা ছিল) (কাসিদুল লিতাকাল্লুম বিল লাফয) এবং যদিও সে শুধু ঠাট্টা করছিল, তার জন্য কোন ওজর নেই যেমন ওজর আছে সেই ব্যাক্তির যাকে (কুফরী করতে) বাধ্য করা হয়, অথবা যার মুখ থেকে ভূল উচ্চারণের কারণে কুফরী কথা বেরিয়েছে, অথবা যে ভূলে গিয়েছিল। *(ই'লামুল মুওয়াক্কি'ইন (৩/৬৩)*

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যাক্তি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করল, কোন প্রয়োজন (ইক্‌রাহ) ছাড়া এবং সে ইচ্ছা করে এটা উচ্চারণ করল (অর্থাৎ তার মুখ থেকে ভূলে এইকথা বেরিয়ে যায়নি) তাহলে সে ব্যাক্তি সে (কুফরী) কথা দ্বারা প্রকাশ্যে (যাহিরান) এবং গোপনে (বাতিনান) কাফের হয়ে গেল। এবং আমরা জায়েয মনে করিনা যে তার ব্যাপারে এই কথা বলা যে, "হয়তবা সে অন্তরে মুমিন"।*(সারিম আল মাসলুল (পৃঃ৫২৪)*

পূর্বোক্ত কথার সাথে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ সূরা নাহল ১০৬ নং আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, "এটা জানা বিষয় যে তিনি (আল্লাহ) এই আয়াতে কুফরী দ্বারা (ই'তিক্বাদ) বিশ্বাসের কুফরীর কথা শুধু বুঝাননি। কারণ অন্তরের ব্যাপারে কাউকে জোর করা সম্ভব নয়, (শুধু কথা বা কাজের ক্ষেত্রে সম্ভব) বলেছেন 'ইক্‌রাহ' এর অর্থ হল যে শুধু তার ক্ষেত্রে ওজর আছে যাকে কুফরী কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়েছে, শারিরিক অত্যাচার করে এবং জানের ভয় দেখিয়ে। কিন্তু ইক্‌রাহর পরিস্থিতি (অথবা ভূল উচ্চারণ বা ভূলে যাওয়া) ছাড়া যে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করল, সে কাফের হয়ে গেল সে তার বাক্যে (অন্তর থেকে) বিশ্বাস করুক বা না করুক। কারণ যদিও একজন ব্যাক্তিকে একটি কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করা সম্ভব, তাকে সেটা অন্তর থেকে কবুল এবং বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়, - এবং তাই পূর্বোক্ত আয়াতে (১৬ঃ১০৬) সেই (ইক্‌রাহ) বাধ্য করার কথা বলা হয়েছে, সেটা কথার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

এটাই প্রমাণ করে যে ইক্‌রার পরিস্থিতি ছাড়া এবং ভূল উচ্চারণ বা ভূলে যাওয়ার পরিস্থিতি ছাড়া, একজন ব্যক্তি তার কথা দ্বারা কাফের হয়ে যেতে পারে। তাই, তার কথাকে কুফরী (এবং সেই ব্যাক্তিকে কাফির) হিসেবে গণ্য করার জন্য এটা শর্ত নয় যে, সেই ব্যাক্তি তার (কুফরী) কথার উপর (অন্তর থেকে) বিশ্বাস রাখে।

❖ প্রশ্ন-৯। যারা কুফরী সরকারী সিষ্টেমে কাজ করে তারা সবাই কি কুফরীর মধ্যে আছে?

উত্তরঃ- কুফরী সরকার ব্যবস্থায় যারা কাজ করে তাদের সবাইকে আমরা ঢালাওভাবে তাকফীর করি না, তাদের কাজের শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। আমরা

শুধু তাদেরকে তাকফীর করি যারা শিরক এবং কুফরী কাজে জড়িত আছে, যেমন যারা আইন প্রণয়ন করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে, তাদের বাহিনীগুলো যারা তাদের আইন বাস্তবায়ন করে, মানুষকে কুফরী আইন মানতে বাধ্য করে, তাদেরকে রক্ষা করে।

যখন কুফরী সরকার ব্যবস্থায় কাজ করার প্রসংগ আসে আমরা বিস্তারিত দেখে নিব, কারণ এর মধ্যে রয়েছে এমন কাজ যা কুফরী, রয়েছে এমন কাজ যা হারাম এবং রয়েছে এমন কাজ যা এর চেয়ে ছোট। [আমাদের আক্বীদাহ, শাইখ মাক্বদিসী]

❖ প্রশ্ন-১০। মুরতাদ কাকে বলে? মুরতাদের হুকুম কি?

উত্তরঃ আল্লাহ সুবঃ বলেনঃ

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة/٢١٧]

"তোমাদের মধ্যে যে সব লোক নিজের দীন থেকে সরে যাবে আর দীনত্যাগী অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়ায় ও আখিরাতে তাদের সব নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা জাহান্নামবাসী এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে।" (আল-বাকারাঃ ২১৭)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا [النساء/١٣٧]

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনলো, অতঃপর কুফরী করল, পুনরায় ঈমান গ্রহণ করল, পুনরায় আবার কুফরী করল, অতঃপর কুফরী আক্বীদা বিশ্বাস ও কর্মকান্ড বাড়তেই থাকলো। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমা করবেন না এবং কখনো তাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখাবেন না।" (আন-নিসাঃ ১৩৭)

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা সেই বান্দার তাওবাহ কবুল করেন না, যে ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী প্রকাশ করে। (আহমাদ, সনদ সহীহ)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا ».

অন্ধকার রাতের মত ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে (কুফরী করে) বিকেলে কাফির হয়ে

যাবে। বিকেলে মু'মিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দীন বিক্রি করে বসবে। (মুসলিম কিতাবুল ঈমান)

উল্লেখিত আয়াতে কারীমা ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ হলো যে, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। আবার মুসলমান হবার পর কুফরী করলে সে কাফির হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তার দীন ও ঈমানকে প্রত্যাহার করে কাফির হয় শরীয়তের পরিভাষায় তাকেই মুরতাদ বলা হয়।

ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত, অপরিহার্যভাবে মেনে চলার জন্য নির্ধারিত এক বা একাধিক বিষয়কে অস্বীকার করলে মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায়। যে মুসলিম ব্যক্তি ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক অপরিহার্যরূপে মেনে চলার জন্য নির্ধারিত কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করলো বস্তুত সে আল্লাহর কিতাবের অংশ বিশেষের প্রতি ঈমান আনলো আর অস্বীকার করলো অংশ বিশেষকে এমতাবস্থায় সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত বলেই গন্য হবে। অর্থাৎ সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাবে তার শাস্তি হচ্ছে হত্যা করা, যদি না সে তাওবাহ করে ফিরে আসে। রাসুল (সা:) বলেছেন, من بدل دينه فاقتلوه "তোমাদের মধ্যে যে তার দ্বীনকে পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা করবে।" (সাহীহ বুখারী)

নিফাক্ব ও মুনাফিক্ব

❖ প্রশ্ন-১। নিফাক্ব ও মুনাফিক্ব বলতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ- নিফাক্ব শব্দটি আরবী نفق ধাতু হতে নির্গত। যেমন–نفق শব্দটির অর্থ হচ্ছে এমন একটি সুড়ঙ্গপথ যার একদিক হতে প্রবেশ করার এবং অপরদিক হতে বের হবার রাস্তা রয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় নিফাক্ব হচ্ছেঃ "দ্বীন ইসলামের এক দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরওয়াজা দিয়ে বের হয়ে আসা।" *(মুফরাদাতে ইমাম রাগেব)*

ঈমানের বিপরীত হচেছ নিফাক্ব। যে নিফাক্বী করে তাকে মুনাফিক্ব বলা হয়। মুনাফিক্বরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।

❖ প্রশ্ন-২। নিফাক্বের কারণ এবং ধরনসমূহ কি কি?

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করার পর তা থেকে আবার ফিরে আসা দু'টি কারণে হতে পারে।

প্রথমতঃ এ প্রবেশ হয়েছে শুধু লোক দেখানোর জন্য। আন্তরিকভাবে সে ইসলামকে গ্রহণ করেনি, বরং মন আত্মা তার কুফরের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এ প্রবেশ ইসলামের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস-অনুরাগ ও মহব্বত নিয়েই হয়েছে। লোক দেখানোর জন্য সে ইসলামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেনি। কিন্তু এ সম্পর্কটি এত দুর্বল যে অন্যান্য সম্পর্ক পূর্ণরূপে তার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে।

প্রথম শ্রেণীর নিফাক্বকে "নিফাক্ব ফিল আক্বীদা" (বা বিশ্বাসগত নিফাক্বী)। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নিফাক্বকে "নিফাক্ব ফিল আমাল" (বা চরিত্রগত নিফাক্বী) বলা হয়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলবী (রঃ) তাঁর স্বলিখিত "ফওযুল কবীর" কিতাবে লিখেছেনঃ –"নবুয়াতী যুগে দু'ধরনের মুনাফিক বর্তমান ছিল, (১) এক ধরনের মুনাফিক ছিল যারা মুখে কলেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতো বটে, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে কুফর, নাস্তিকতা ও বেঈমানীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা হচ্ছে সেই মুনাফিক যাদের পরিণতি সম্পর্কে আল-কুরআন কঠোর ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا [النساء/١٤٥]

"নিঃসন্দেহে এ সব মুনাফেক জাহান্নামের সর্বনিম্ন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবে।" (আন-নিসাঃ ১৪৫)

(২) আর দ্বিতীয় ধরনের হলো ঐ সকল লোক যারা আন্তরিকতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের ঈমানে দৃঢ়তা ছিল না। নানারূপ দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয়েছিল। এ দ্বিতীয় শ্রেণীর নেফাককেই নেফাকে আমলী বা চরিত্রগত মুনাফেকী বলা হয়।"

❖ প্রশ্ন-৩। নিফাক্বের প্রকারভেদগুলো কি কি?

উত্তরঃ- ১। আকিদাহ্গত নিফাক্ব ছয় প্রকার। এ শ্রেণীর মুনাফিক জাহান্নামের অতল তলের অধিবাসী ঃ

প্রথম ঃ রাসূল (সঃ) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

দ্বিতীয় ঃ রাসুল (সঃ)-এর আনীত ওয়াহীর কিছু অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

তৃতীয় ঃ রাসূল (সঃ) এর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা।

চতুর্থ ঃ রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম) আনীত বিধানের কিছু অংশের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা।

পঞ্চম ঃ রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম) এর দ্বীনের অবনতিতে খুশী হওয়া।

ষষ্ঠ ঃ রাসূলের(ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম) দ্বীনের বিজয়কে অপছন্দ করা।

২। আমলগত নিফাক্ব পাঁচ প্রকার ঃ (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। (২) যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে। (৩) যখন তাকে বিশ্বাস করা হয়, খিয়ানত করে। (৪) যখন ঝগড়া করে গালি দেয়। (৫) যখন সে চুক্তি করে, তা ভঙ্গ করে।
এর প্রমাণ রাসূলের (সাঃ) বাণীঃ

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان

"মুনাফিকের (কপটের) লক্ষণ তিনটিঃ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে। যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় সেটির খেয়ানত করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

আরেক বর্ণনায় আছে, وإذا خاصم فجر "যখন ঝগড়া করে অশ্লীল কথা বলে। যখন সন্ধি করে তা ভঙ্গ করে।"(বুখারী ও মুসলিম)

❖ প্রশ্ন-৪। মুনাফিক বনাম গুনাহগার এর পার্থক্য কি?

উত্তরঃ- মুনাফেকীর কোন একটি নিদর্শন ও আলামত কোন লোকের মধ্যে পরিদৃষ্ট হলে তাকে বিনা চিন্তায় মুনাফেক ধারণা করা উচিত নয়। মুনাফেকের যতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার অধিকাংশের উৎসমূল হচ্ছে মানুষের আত্মিক দুর্বলতা ও সীমাহীন পার্থিব লোভ-লালসা। আর এ আত্মিক দুর্বলতা ও সীমাহীন পার্থিব লোভ-লালসা সমস্ত পাপেরও উৎসমূল। এ কারণেই একজন খাঁটি মুসলমানের থেকে এ সব কার্যাবলী প্রকাশ পাওয়া অসম্ভবের কিছুই নয়। সুতরাং এখানে মুনাফেক ও গুনাহগার মুসলমানের মর্যাদা এবং তাদের উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য ভালরূপে বুঝে নেয়া উচিত।

কোন মুনাফেক যখন ইসলামের পরিপন্থী কোন কাজ সাফল্যের সাথে করে, তখন তার অন্তর এ খারাপ কাজের জন্য কোন প্রকার অনুতাপ করার পরিবর্তে বরং তার সাফল্যজনক কূটনৈতিকতার জন্য গর্ববোধ করে। কিন্তু একজন মুসলমানের দ্বারা কি এমন কাজ কখনো হতে পারে? যদি অলক্ষ্যে হয়ে যায়, তখন তার অন্তর ও মন-প্রাণের অবস্থা কি হতে পারে-কুরআনে হাকীম তার বর্ণনায় বলেছেঃ

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران/١٣٥]

"আর জান্নাত হচ্ছে সেই সকল মোত্তাকী লোকদের জন্য, যারা ভুলবশতঃ যদিও কোন অশ্লীল কাজ করে বা পাপের কাজ করে স্বীয় আত্মার উপর যুলুম করে, তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মনে আল্লাহ তায়ালার খেয়াল ও স্মরণ এসে যায়।

আর তারা নিজেদের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর এমন কে আছে যে, গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? কেহই নেই। আর এ সকল মোত্তাকী লোকেরা বুঝে শুনে জ্ঞাতস্বারে ঐ সকল কৃত গুনাহর কাজ আর দ্বিতীয়বার করে না।” *(আলে-ইমরাণ ঃ ১৩৫)*

উল্লেখিত আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কয়েকটি বিষয় আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়।

প্রথমতঃ একজন মুসলমানের থেকে পাপের কাজ হওয়া সম্ভব এবং হয়েও থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের থেকে গুনাহর কাজ প্রকাশ হয়ে পড়লে তা বুঝে-শুনে হয় না বরং অজ্ঞতা ও নফসের আকস্মিক আবেগ-উচ্ছাসের দ্বারা পরাজিত ও প্রভাবিত হবার দরুনই হয়ে থাকে।

তৃতীয়তঃ মুসলমান পাপের কাজ করার পর তাদের অন্তঃকরণ আল্লাহর ভয়ে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে উঠে। আর প্রার্থনা করতে থাকে তাঁর নিকট ক্ষমা ও মাগফেরাতের জন্য। সংশোধন হয়ে যায় ভবিষ্যতের আগত দিনগুলোর জন্য।

চতুর্থতঃ তারা নিজেদের কোন পাপের কাজের উপর স্থির হয়ে থাকে না। বরং তা পরিহার করে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায় এবং এ জন্য তাদের মন মগজ, লজ্জা ও অবমাননার ব্যাথায় ব্যাথিত হয়ে উঠে।

কিন্তু মুনাফেকদের মধ্যে এহেন গুণাবলী আদৌ বর্তমান থাকে না। তারা শরীয়তের বিপরীত কাজগুলো নফসের কোন আকস্মিক আবেগ উচ্ছাসের বশবর্তী হয়ে করে না। বরং জেনে বুঝে ও সজাগ অনুভূতি নিয়েই দ্বিধাহীন চিত্তে করে। শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ করাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নেয়। তাদের কলবে তখন আর তাওবা ও এস্তেগফার দূরের কথা, আল্লাহর ভয় ভীতির নাম-গন্ধও বিদ্যমান থাকে না।

একজন মুনাফেক ও একজন গুনাহগার মুসলমানের মধ্যে এ হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য। মুনাফেকী হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে একটি বিপরীতধর্মী বিষ। তার মধ্যে আদৌ ঈমানের কোন চিহ্ন নেই। পক্ষান্তরে গুনাহ করার পর যদি মানুষ লজ্জিত না হয় এবং নিজের সংশোধনের জন্য ব্যাকুল হয়ে না উঠে, তবে এ গুনাহই শেষ পর্যন্ত মুনাফেকীর বীজ বপন করে।

আরকানুল ইসলাম

ইসলামের প্রথম রুকনঃ শাহাদাতাইন

❖ প্রশ্ন-১। শাহাদাতাইন কাকে বলে?

উত্তরঃ- ইসলামের প্রথম রুকন হচ্ছে দু'টি বিষয়ের স্বাক্ষ্য দান:

أشهدُ أنْ لا إلٰه إلا اللهُ وأشهدُ أنَّ محمدا عبدُه ورسولُه

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। যেহেতু এখানে দুটি বিষয়ে স্বাক্ষ্য দান করতে হয় এই জন্য একে 'শাহাদাতাইন' বলা হয়।

❖ প্রশ্ন-২। ইসলামে শাহাদাতাইনের অবস্থান কি?

উত্তরঃ- এটি হচ্ছে ইসলামের প্রথম এবং মূল ভিত্তি। একজন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারবে না যতক্ষন না সে এই দু'টি বিষয়ে স্বাক্ষ্য দান করে।

আল্লাহ সুবঃ বলেনঃ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ [النور/٦٢] "প্রকৃত ঈমানদার তারাই, যারা আল্লাহর (এককত্বে) এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনে।" (সূরা, নূর ২৪ঃ৬২)

নাবী মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله

আমি আদিষ্ট হয়েছি লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষন না তারা স্বাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রাসুল, সলাত প্রতিষ্ঠিত করে এবং যাকাত আদায় করে। যদি তারা এগুলো করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপত্তা পাবে) বৈধ আইন ব্যতীত, এবং তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট। (বুখারী ও মুসলিম)

❖ প্রশ্ন-৩। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ কথার স্বাক্ষ্যদানের অর্থ কি?

উত্তরঃ এই কালিমা জেনে-শুনে ইহা মুখে উচ্চারণ করা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে এর দাবী ও চাহিদা অনুযায়ী আমল করা, আর এর অর্থ না জেনে এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল না করে শুধু মুখে পাঠ করা সকলের ঐক্যমতে কোন উপকারে আসেনা। বরং তার বিরূদ্ধে হুজ্জত হবে।

আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ হলোঃ এক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া প্রকৃত পক্ষে কোন সত্য ইলাহ নেই। কারোরই ইবাদত পাবার যোগ্যতা নেই একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত, যার কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই তাঁর ইবাদত এবং রাজত্বে। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন,

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [الحج: ٦٢]

"এটা এ কারণেও যে, আল্লাহ্ই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহ্ই সবার উচ্চে, মহান।" (সূরা, হাজ্জ ২২ঃ৬২)

এ কালেমার দু'টি দিক রয়েছে আন্নাফি-অস্বীকৃতি জানানো, ওয়াল ইছবাত-স্বীকৃতি জানানো।

অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া সব কিছুর উপাসনা অস্বীকার করা, এবং সে ইবাদত একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা, যার কোন অংশীদার নেই। আল্লাহ বলেন,

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ [البقرة/١٦٣]

অর্থঃ তোমাদের ইলাহ্-উপাস্য হলেন এক ও অদ্বিতীয়, আর সে মহান করুনাময় দয়ালু ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ- উপাস্য নেই। (সূরা বাক্বারাহ:১৬৩)

❖ প্রশ্ন-৪। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর স্বাক্ষ্য দানের দাবী কি?

উত্তরঃ- لا اله الاالله 'র দাবী বলতে এই কালেমার প্রতি ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় দাবী ও করণীয় হুকুম আহকাম পালন করা এবং ঈমানের বিপরীত যাবতীয় বিশ্বাস ও কর্ম বর্জন করাকে বুঝায়। কিন্তু দুঃখজক হলেও সত্য যে, বর্তমান মুসলিম সমাজ এ কালেমার দাবী সমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ। আসুন আমরা জেনে নেই এ কালেমার অত্যাবশ্যকীয় দাবীসমূহ সম্পর্কে-

১। যাবতীয় ইবাদত স্রেফ আল্লাহর জন্য খালেস করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেনঃ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ "তোমার রবের চুড়ান্ত ফায়সালা যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে---।" *(সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ঃ২৩)*

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة/٥]

"আর তাদেরকে ইহা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করবে।" *(সূরা বাইয়্যেনাহ ৯৮ঃ৫)*

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

"আমি তোমার পুর্বে এমন কোন রাসূল পাঠাইনি তার কাছে এই ওহী ছাড়া যে, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই সুতরাং আমারই ইবাদত কর।" *(সূরা, আম্বিয়া ২১:২৫)*

২। যাবতীয় শির্ক এবং ত্বাগুতকে বর্জন করা।

উক্ত আহ্বানই ছিল সমস্ত নবী-রাসুলদের আহ্বান। আর এটাই কালেমার চুড়ান্ত দাবী। শির্ক এবং ত্বাগুতকে বর্জন করতে না পারলে ঈমানের দাবী কোন অবস্থাতেই আদায় হবে না বরং কালেমা পাঠকারীকে মুশরিক এবং কাফের হিসেবে বেঁচে থাকতে হবে, যার পরিণাম হিসেবে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যেতে হবে। সমস্ত নবী-রাসূলদের আহ্বান সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦]

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের কাছেই এ মর্মে রাসুল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাগুত থেকে দূরে থাকবে।" *(নাহলঃ ৩৬)*

শিরক থেকে সতর্ক করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الزمر/٦٥]

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই ওহী হয়েছে তুমি আল্লাহর সাথে শরীক্ করলে তোমার আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" *(সূরা-যুমার-৩৯ঃ৬৫)*

শিরক মুক্তভাবে আল্লাহর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا [النساء/٣٦]

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক্ করবে না।" (সূরা, নিসা-৪ঃ৩৬)

৩। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশকে সকল কিছুর উর্দ্ধে অগ্রাধিকার দেয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [الحجرات/١]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রনী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।" *(সূরা হুজরাত ৪৯ঃ১)*

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا [الأحزاب/٣٦]

"কোন মু'মিন ও মু'মিন নারীর এ অধিকার নেই যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দেন, সে বিষয়ে নিজেদের কোন ইখতিয়ার পেশ করবে, কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়।" *(সূরা আহযাব ৩৩ঃ৩৬)*

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء/٦٥]

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। *(সূরা নিসা ৪ঃ৬৫)*

অতএব আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশকে সকল কিছুর উর্দ্ধে স্থান দেয়া এ কালেমার দাবী, কেউ যদি এ দাবী পূরণ না করে তবে কস্মিনকালেও সে মুসলিম হতে পারবে না।

৪। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দলের অন্ধ অনুসরণ না করা।

বিনা দলীলে (কোরআন ও সুন্নাহর বাইরে) কারো কোন কথা মানাকে অন্ধ অনুসরণ বলে। আল্লাহর নির্দেশ-

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

"তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতি পালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য আউলিয়াদের অনুসরণ করো না। (আরাফ ঃ৩)

কোরআন সুন্নাহর বাইরে কারো কথা মানা বা অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের চাইতে তাকে বেশী প্রাধান্য দেয়া, যা সুস্পষ্ট কুফরী। এরূপ ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না।

৫। কালিমার দাবীর বিপরীত অবস্থানকারীর সাথে কোনরূপ সম্পর্ক না রাখা।

কালেমার স্বাক্ষ্যদানকারী মুসলিম কখনো কোন কাফির-মুশরিকের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে পারবে না। কারণ যারা কাফের- মুশরিক তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের শত্রু। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রু কখনো কোন ঈমানদারের বন্ধু হতে পার না।

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেনঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

"ইব্‌রাহীম ও যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের জাতিকে বলল, তোমাদের ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। আমরা তোমাদেরকে মানি না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা বোধের সূচনা হল যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর।" (মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ [المجادلة/٢٢]

" যারা আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা।" *(সূরা মুজাদালা ৫৮ঃ২২)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (١٤٤ [النساء/١٤٤،]

"হে ঈমানদারগন! মু'মিনদের পরিবর্তে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমান দিতে চাও?" *(সূরা নিসা ৪ঃ১৪৪)*

❖ প্রশ্ন-৫। 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এ কথার স্বাক্ষ্যদানের অর্থ কি?

উত্তরঃ- 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এ কথার স্বাক্ষ্যদানের অর্থ হচ্ছে- সত্যিকারভাবে অন্তরে পরিপূর্ন বিশ্বাস সহকারে এই কথার বলা যে, মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা। মানুষ এবং জ্বিন সকল সৃষ্টির জন্য রাসুল।
আল্লাহ (সুবঃ) বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا [الأحزاب/٤٥-٤٦]

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। এবং আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।" (সূরা, আহযাব ৩৩ঃ৪৫-৪৬)

নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দানের অর্থ হলোঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা আদেশ করেছেন তা পালন করা, যে সব খবর দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা, এবং যেগুলি সম্পর্কে নিষেধ ও সতর্ক করেছেন সেগুলি থেকে বিরত থাকা, আর একমাত্র তিনি যেভবে দেখিয়েছেন, সেভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য বাস্তবায়ন হবে ঈমান ও পূর্ণ ইয়াকীন দ্বারা। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল, যাকে সকল মানব ও জ্বিন জাতীর নিকট প্রেরণ করেছেন। তিনি শেষ নবী ও রাসূল। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর নৈকট্যর্জনকারী বান্দা। তার মাঝে উলূহীয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট নেই। তার অনুসরণ করা, তার আদেশ নিষেধের সম্মান করা। কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে তার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا অর্থঃ বলঃ হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল। *(সূরা আল-আ'রাফ-আয়াত-১৫৮)* তিনি আরো বলেনঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ [الأحزاب/٤٠]

অর্থঃ মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নাবী। *(সূরা আল-আহ্যাব-আয়াত-৪০)*

❖ প্রশ্ন-৬। 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এ কথার স্বাক্ষ্যদান কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে?

উত্তরঃ- 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' উক্ত সাক্ষ্য নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেঃ

প্রথমতঃ তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রিসালাতের স্বীকৃতি দেওয়া ও অন্তরে তার বিশ্বাস রাখা।

দ্বিতীয়তঃ এর উচ্চারণ করা ও মুখের দ্বারা প্রকাশ্য ভাবে এর স্বীকৃতি দেওয়া।

তৃতীয়তঃ যে সত্য তিনি নিয়ে এসেছেন তা অনুসরণ করা, এবং যে বাতিল বিষয় সমূহ নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [الأعراف/١٥٨]

অর্থঃ সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তার বার্তাবাহক উম্মী নাবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হতে পার। *(সূরা আল-আ'রাফ-আয়াত-১৫৮)*

চতুর্থতঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সব খবর দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা।

পঞ্চমতঃ জান, মাল, ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা, ও সকল মানুষের ভালবাসার চাইতে তাকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে) অধিক ভালবাসা। কারণ তিনি আল্লাহর রাসূল, আর তাকে ভালবাসাই হলো আল্লাহর ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত। আর তার প্রকৃত মুহাব্বাত হল তার আদেশ সমূহের আনুগত্য করে তার নিষেধ সমূহ হতে বিরত থেকে তার অনুসরণ করা। তাকে সাহায্য করা, তার সাথে বন্ধুত্ব রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [آل عمران/٣١]

অর্থঃ বলঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। *(সূরা আল-ইমরান-আয়াত-৩১)*

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده

তোমাদের কেহ পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না যতক্ষন আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও সকল মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় না হবো। (ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসটি আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন)

ষষ্টতঃ তার সুন্নাতের প্রতি আমল করা। তার কথাকে সকলের কথার উপর প্রাধান্য দেওয়া, নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করা। তার শরী'আত মোতাবেক বিধান পরিচালনা করা এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء/٦٥]

অর্থঃ কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষন পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সমন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে উহা মানিয়া না লয়। *(সূরা আন-নিসা-আয়াত-৬৫)*

দ্বিতীয় রুক্নঃ الصلاة "আস্-সালাত" (নামায)

❖ প্রশ্ন-১। সালাত কাকে বলে? কয় ওয়াক্ত সলাত ফরয?

উত্তর- শাব্দিক অর্থঃ সালাত শব্দের শাব্দিক অর্থ দু'আ, এই অর্থ কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থঃ ইহা এমন এক ইবাদাত যা বিশেষ কিছু কথা ও কর্মকে শামিল করে, আল্লাহু আকবার দ্বারা শুরু হয়, আস্সালামু আলাইকুম দ্বারা শেষ হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয, তা হলোঃ ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ঈশা, এর উপর সকল মুসলমানদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

❖ প্রশ্ন-২। সালাত ফরযের দালীল কি?

সালাত ফরয এটা প্রমাণিত হয়েছে অনেক দালীল দ্বারা। নিম্নে তার কিছু বর্ণনা করা হলঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। *(সূরা আন-নিসা-আয়াত-১০৩)*

ইব্নে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু এর হাদীসঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুআয (রাযিআল্লাহু আনহু) কে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন এবং (তাকে) বল্লেনঃ

أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

"যে, তুমি তাদেরকে (আহলে কিতাবদেরকে) (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু–) আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দানের দিকে আহ্বান কর। যদি তারা এই দাও'আত গ্রহণ করে তোমার আনুগত্য করে তবে তুমি তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন।" *(বুখারী মুসলিম)*

সকল মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার উপর একমত হয়েছেন। আর ইহা ইসলামের ফরয সমূহের অন্যতম একটি ফরয।

❖ প্রশ্ন-৩। কাদের উপর সালাত ফরয?

উত্তর- প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক জ্ঞানী মুসলিম ব্যক্তির উপর সালাত ফরয। চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক। কাফিরের উপর সালাত ফরয নয়। আর বাচ্চাদের উপরও ফরয নয়। কারণ সে মুকাল্লাফ-প্রাপ্ত বয়স্ক নয়। পাগলের উপরও ফরয নয়। ঋতু ও নিফাস গ্রস্থ মহিলাদের উপরও ফরয নয়। কারণ শরী'আত তাদের হতে এর বিধান তুলে নিয়েছে, ইহা আদায়ে বাঁধা প্রদান কারী নাপাকির কারণে।

বাচ্চা সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তার বয়স যখন সাত বছর হবে তখন তার অভিভাবকের উপর তাকে সালাত এর আদেশ দেওয়া আবশ্যক। আর যখন তার বয়স দশ বছর হবে তখন নামায আদায় না করলে তার অভিভাবকের উপর তাকে প্রহার করা আবশ্যক।

❖ প্রশ্ন-৪। সালাত-নামায ত্যাগ কারীর বিধান কি?

উত্তর- এপ্রসঙ্গে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেন,

أحب شيء إلى الله الصلاةُ لوقتها ومن ترك الصلاة فلا دِيْنَ له والصلاةُ عِمَادُ الدِّينِ (البيهقى فى شعب الإيمان عن عمر)

অর্থ:- আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে সময় মত সালাত আদায় করা। যে সালাত ত্যাগ করল তার কোন দ্বীন নেই। আর সালাত হলো দ্বীনের স্তম্ভ। (বাইহাক্বী, অধ্যায়: ঈমান)

من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر جهارًا যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ছেড়ে দিল সে ইসলাম হতে বহিস্কৃত হয়ে গেল এবং সু-স্পষ্ট কুফরী করলো।

ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান হতে মুর্তাদ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার উপর যে বিধি-বিধান ফরয করেছেন তা ছেড়ে দিয়ে সে তার নাফারমানী করেছে। তাই তাকে তাওবার আদেশ দেওয়া হবে। যদি তাওবা করে ও সলাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফিরে আসে তবে ভাল, অন্যথায় সে ইসলাম হতে মুর্তাদ হয়ে যাবে। তার গোসল, কাফন, জানাযার নামায পড়া, মুসলমানদের কবরে দাফন করা নিষেধ। কারণ সে তাদের (মুসলমানদের) অন্ত র্ভুক্ত নয়।

سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ

জাবির বিন আব্দিল্লাহ (রা) হতে বর্নিত, তিনি বলেন আমি রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি, 'মুসলিম ব্যক্তি ও মুশরিক ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত পরিত্যাগ করা।' (মুসলিম)

❖ প্রশ্ন-৫। সলাতের শর্ত সমূহ কি কি?

উত্তর- সালাতের শর্ত সমূহ হচ্ছে-

১। ইসলাম-মুসলিম হওয়া। ২। জ্ঞানবান হওয়া। ৩। ভাল-মন্দ পার্থক্যের জ্ঞান থাকা। ৪। সলাতের সময় উপস্থিত হওয়া। ৫। নিয়াত করা। ৬। ক্বিব্লা মুখী হওয়া। ৭। সতর ঢাকা, পুরুষের সতর নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত। আর মহিলার তার সম্পূর্ণ শরীরই নামাযে সতর, তার মুখ ও হাতের তালুদ্বয় ছাড়া। ৮। মুসল্লির কাপড়, শরীর ও সলাত পড়ার স্থান হতে নাপাকি দূর করা। ৯। হাদাছ দূর করা, আর ইহা-নাপাকি হতে অযু গোসল করে পবিত্র হওয়াকে বুঝায়।

❖ প্রশ্ন-৬। সালাতের সময় কি কি?

উত্তর- সালাতের-নামাযের সময় হচ্ছে-

(১) **যোহর সলাতের সময়ঃ** সূর্য ঢলে যাওয়া হতে-অর্থাৎ মধ্য আকাশ হতে সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়া হতে নিয়ে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত। **(২) আসর সলাতের সময়ঃ** যোহর সলাতের সময় চলে যাওয়া হতে নিয়ে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুন হওয়া পর্যন্ত। এটা হল আসর নামাযের উত্তম সময়। বিশেষ প্রয়োজনে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামায পড়া যাবে।

(৩) মাগরিব সলাতের সময়ঃ সূর্য ডুবা হতে নিয়ে লালিমা দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত। আর তা হল ঐ লালচে ভাব যা পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবার পর প্রকাশিত হয়। **(৪) ঈশার সলাতের সময়ঃ** মাগরিবের সলাতের সময় চলে যাওয়া হতে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত। **(৫) ফজর সলাতের সময়ঃ** সুবেহ সাদেক বা ফজরে সানী প্রকাশ হওয়া থেকে নিয়ে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত।

❖ প্রশ্ন-৭। সালাতের নিষিদ্ধ সময় সমূহ কখন?

উত্তর– উক্ববা বিন আমির (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস, তিনি বলেনঃ

عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّىَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে তিন সময়ে সলাত পড়তে ও আমাদের মৃত্যু ব্যক্তিদেরকে দাফন করতে নিষেধ করতেন। (১) সূর্য স্পষ্ট ভাবে উদিত হওয়ার সময় হতে নিয়ে তা (উর্ধে উঠা) পর্যন্ত। (২) ঠিক দুপুরে সূর্য উঁচু হওয়া হতে নিয়ে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত। (৩) সুর্য অস্তমুখী হওয়া থেকে নিয়ে তা ডুবা পর্যন্ত। *(মুসলিম)*

❖ প্রশ্ন-৮। ফরয নামাযের রাকা'আতের সংখ্যা কত ও কি কি?

উত্তর- ফরয সলাতের রাকা'আতের সংখ্যা সর্বমোট সতের রাকা'আত। নিম্নে তার তালিকা দেওয়া হলঃ

১) যোহরঃ চার রাকা'আত; ২) আসরঃ চার রাকা'আত; ৩) মাগরিবঃ তিন রাকা'আত; ৪) ঈশাঃ চার রাকা'আত; ৫) ফজরঃ দু' রাকা'আত।

❖ প্রশ্ন-৯। জামা'আতে সালাত আদায় করার বিধান কি?

উত্তর- মসজিদে জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়া মুসলিম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। এতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ছাওয়াব অর্জন করতে পারবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا (صحيح مسلم)

আবু হযরায়রা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন; একা সলাত পড়ার চাইতে জামা'আতে নামায পড়ার ছাওয়াব সাতাশ গুণ বেশী। (মুসলিম)

তবে মুসলিম রমণীরা নিজ বাড়ীতে সলাত পড়া জামা'আতে সলাত পড়ার চাইতে উত্তম।

❖ প্রশ্ন-১০। বিদ'আতী ইমাম হলে তার পিছনে সালাত পড়ার ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তর- কোন ব্যক্তির বিদ'আত বা অপকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়লে এমতাবস্থায় অন্য কারো পেছনে সলাত আদায় করা উচিত, তবে যদি সলাত পড়ে ফেলা হয় তাহলে সলাত হয়ে যাবে, তবে মোক্তাদি এ কারণে গুনাহগার হবে। কিন্তু যদি বড় ধরনের কোন ফিত্না ঠেকাবার উদ্দেশ্যে এ কাজ করে তাহলে গুনাহগার হবে না। আর যদি অন্য ইমামও এই বিদ'আতী ইমামের অনুরূপ হয় অথবা তার চাইতে আরো খারাপ হয় তাহলে এমতাবস্থায় ঐ ইমামের পিছনেই সলাত আদায় করতে হবে। এবং এ অজুহাতে জামাত ত্যাগ করা যাবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তির কুফরী প্রকাশ হয়ে পড়লে কোন অবস্থাতেই তার পেছনে সলাত আদায় করা যাবে না।

তৃতীয় রুক্নঃ যাকাত

❖ প্রশ্ন-১। যাকাতের সংজ্ঞা কি?

উত্তর- :**الزكاة لغة**- যাকাতের শাব্দিক অর্থঃ বৃদ্ধি পাওয়া, বেশী হওয়া। কখনো প্রশংসা, পবিত্র করন ও সংশোধন এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর মালের যে অংশ বের করা হয় তাকে যাকাত বলে। কারণ এর দ্বারা বরকতের মাধ্যমে মাল বৃদ্ধি পায়, আর ক্ষমার মাধ্যমে ব্যক্তিকে পবিত্র করা হয়।

:**واصطلاحاً** - যাকাতের পারিভাষিক অর্থঃ নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ঠ গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত মালে অত্যাবশকীয় হক্ব বের করা।

❖ প্রশ্ন-২। ইসলামে যাকাতের স্থান কি?

উত্তর- যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ। আল-কুরআনে বহু স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের আলোচনা হয়েছে। যেমন-আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ [وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة/٤٣

তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর। (সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-৪৩) তিনি আরো বলেনঃ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة/٥]

এবং (তারা আদিষ্ট হয়েছিল) সালাত কায়েম করতে, এবং যাকাত প্রদান করতে। (সূরা আল-বায়্যিনাহ-আয়াত-৫)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ ». فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ لاَ. صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ.

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে যাকাত আদায় করা অন্যতম একটি রুক্ন। (এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম একত্রিত ভাবে ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেছেন)

❖ প্রশ্ন-৩। যাকাতের বিধান কি?

উত্তর- প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি মালের শর্তানুযায়ী নিসাবের মালিক হলে তার উপর যাকাত ফরয। এমনকি বাচ্চা ও পাগলদের পক্ষ হতে তাদের অভিভাবক তাদের মালের যাকাত আদায় করবেন। যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃত ভাবে

এর ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি বখীলতা ও অলসতা করে যাকাত দিবেনা এর জন্য তাকে ফাসেক ও কাবীরাহ গুনাহে লিপ্ত বলে গণ্য করা হবে। আর তার যদি এ অবস্থায় মৃত্যু হয় তবে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীনে থাকবে।

❖ প্রশ্ন-৪। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তর- যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছেঃ ১। ইসলাম ২। স্বাধীন ৩। নিসাবের মালিক হওয়া ৪। মালের পূর্ণ মালিক হওয়া ৫। এক বছর অতিবাহিত হওয়া। এক বছর অতিবাহিত না হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন মালেই যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে জমি হতে উৎপন্ন ফসল ও ফল মূল ছাড়া।

❖ প্রশ্ন-৫। যাকাত ওয়াজিব যোগ্য সম্পদ কি কি? তার নিসাব ও যাকাতের পরিমান ইত্যাদি বর্ণনা করুন?

উত্তর- পাঁচ শ্রেণীর মালে যাকাত ওয়াজিব হয়।

প্রথমঃ সোনা, রূপার ও অনুরূপভাবে তার স্থলাভিসিক্ত প্রচলিত কাগজের মুদ্রার উপর যাকাত ওয়াজিব

আর তাতে যাকাতের পরিমাণ হলো ربع العشر (রুবু'ল উ'শর) চল্লিশ ভাগের একভাগ। আর রুবু'ল উ'শরের পরিমাণ হলো শতকরা আড়াই ভাগ। এক বছর অতিবাহিত ও নিসাব পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। সোনার নিসাবের পরিমাণ হলো বিশ মিছকাল। আর এক মিছকালের ওজন (৪.২৫) গ্রাম। অতএব সোনার নিসাব হলো (৮৫) গ্রাম। রূপার নিসাবের পরিমাণ হলো দু'শত দিরহাম। আর এক দিরহামের পরিমাণ হলো (২.৯৭৫)। সুতরাং রূপার নিসাব হলো (৫৯৫) গ্রাম। বর্তমান কাগজের মুদ্রা তার নিসাবের পরিমাণ হলোঃ এক বছর অতিবাহিত কালে যাকাত বের করার সময় তার মূল্য পঁচাশি (৮৫) গ্রাম সোনার অথবা পাঁচশত পঁচানব্বই (৫৯৫) গ্রাম রূপার সমান হতে হবে।

দ্বিতীয়ঃ চতুস্পদ জন্তু : আর তা হলো, উট, গরু, ছাগল। আর ইহাতে যাকাত ওয়াজিব হবে যখন ইহা সায়েমা হবে। সায়েমা ঐ সকল পশু যা বছরের অধিকাংশ দিনগুলো (মালিকের কাছে) লালিত-পালিত হয়। যখন নিসাব পূর্ণ হবে ও এক বছর অতিবাহিত হবে তখন যাকাত ওয়াজিব হবে।

গৃহপালিত পশুর যাকাতের তালিকা। শুধু গরু ও ছাগলেরঃ

শ্রেণী	নিসাবের পরিমাণ (হতে - পর্যন্ত)	নির্ধারিত পরিমাণ
গরু	৩০-----------৩৯	এক বছরের একটি বাছুর বা বক্না দিতে হবে
	৪০-----------৫৯	দু'বছরের একটি বক্না দিতে হবে
	৬০-----------৬৯	এক বছরের দু'টি বাছুর দিতে হবে
	৭০-----------৭৯	এক বছরের একটি বাছুর এবং দু'বছরের একটি বক্না দিতে হবে।

আর যদি গরুর সংখ্যা ৭৯টির উপর হয় তাহলে প্রতি ৩০টিতে একবছরের একটি বাছুর, আর প্রতি ৪০টিতে একবছরের একটি বক্না দিতে হবে।

শ্রেণী	নিসাবের পরিমাণ (হতে – পর্যন্ত)	নির্ধারিত পরিমাণ
ছাগল	৪০----------১২০	একটি ছাগল দিতে হবে।
	১২১---------২০০	দু'টি ছাগল দিতে হবে।
	২০১---------৩০০	তিনটি ছাগল দিতে হবে।

আর যদি ছাগলের সংখ্যা ৩০০ শত এর বেশী হয় তাহলে প্রতি ১০০ শতে একটি ছাগল দিতে হবে।

তিনঃ ফসল ও ফলাফল

অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট উৎপাদিত ফসলে যাকাত ওয়াজিব হবে নিসাব পূর্ণ হলে। আর তাদের নিকট তার নিসাব হল পাঁচ ওয়াসাক। আর এক وسق (ওয়াসাক) সমান ষাট স্বা'আ। সুতরাং নিসাবের পরিমাণ হলো তিনশত স্বা'আ। আর ভাল গমের দ্বারা নিসাবের পরিমাণ হবে ছয়শত বায়ান্ন কিলো ও আটশত গ্রাম। ফসল ও ফলের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য একবছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। ফসল কাটার দিন তা আদায় করতে হবে।

যে সকল ফসল বিনা পরিশ্রমে সার, পানি সরবরাহ হয়ে উৎপন্ন হয়েছে তাতে যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ হলো দশ ভাগের এক ভাগ, আর যে সকল ফসল পরিশ্রমের দ্বারা সার, পানি সরবরাহ হয়ে উৎপন্ন হয়েছে তাতে নির্ধারিত পরিমাণ হলোঃ বিশ ভাগের এক ভাগ।

চারঃ ব্যবসা সামগ্রী

মুসলিম ব্যক্তি ব্যবসার জন্য যে মাল প্রস্তুত করেছে তাকে ব্যবসা সামগ্রী বলে। তা যে কোন শ্রেণীর মাল হোক না কেন। যাকাতের সাধারণ সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। নিসাব পূর্ণ হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। ব্যবসা সামগ্রীর মূল্য সোনা

ও রূপার নিসাবের সমান হওয়া গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যাকাত বের করার সময়ে বাজার মূল্য গ্রহণযোগ্য হবে। পূর্ণ মূল্যের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত বের করা ওয়াজিব হবে। ব্যবসার লভ্যাংশ তার আসল মালের সাথে মিলাবে, যদি নিসাব পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তার যাকাত দানে নতুন বছরের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আর যদি লভ্যাংশ ছাড়া আসল মালে নিসাব পূর্ণ না হয় তাহলে নিসাব পূর্ণ হওয়ার সময় হতে বছর শুরু/গণ্য হবে।

পাঁচঃ খনিজ সম্পদ ও রিকাযঃ বা মাটিতে পুঁতে রাখা মাল

(ক) খনিজ সম্পদঃ

খনিজ সম্পদ ঐ সকল বস্তু যা জমি হতে নির্গত হয়, তথায় জন্ম নেয় যা জমির মূল্যবান উৎপন্ন নয়, এবং উদ্ভিদও নয়, যেমন সোনা-রূপা, লৌহ, তামা, ইয়াকুত পাথর ও পেট্রোল ইত্যাদি। আর তাতে যাকাত ওয়াজিব। অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট খনিজ সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাব পূর্ণ হওয়া শর্ত। আর খনিজ সম্পদে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। সোনা-রূপার যাকাতের পরিমাণের উপর ক্বিয়াস বা তুলনা করে। তাতে এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। তা যখন সংগ্রহ হবে তখনই তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

(খ) রিকায-মাটিতে পুঁতে রাখা ধনসম্পদঃ

জাহিলি যুগের মাটিগর্ভে-গচ্ছিত সম্পদ, অথবা পূর্ববর্তী কাফির সম্প্রদায়ের সম্পদ তার উপর বা তার কিছুর উপর কুফুরের নির্দশন হয় যেমন তাদের নাম, তাদের রাজাদের নাম, তাদের ছবি, তাদের পৃষ্ঠদেশ ও শুধু তাদের প্রতিমার বক্ষদেশ থাকে (তা হলেও তা রিকায হবে)। আর যদি তার উপর বা তার কিছুর উপর মুসলমানদের নিদর্শন থাকে, যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম বা মুসলমানদের খলীফাদের কারও নাম বা কুরআন কারীমের আয়াত। তা হলে তা (লুক্বতা)-পথে পড়ে থাকা বস্তু হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি তাতে কোন নির্দশন না থাকে, যেমন পাত্র, স্ত্রীলোকের অলঙ্কার সাজ-সজ্জা, স্বর্ণের বিস্কুট তা হলেও তা লুক্বতা হবে, আর তা প্রচার করার আগ পর্যন্ত কেহই তার মালিক হবে না। কারণ তা হল মুসলিম ব্যক্তির মাল, আর তা হতে তার মালিকানা নষ্ট হয়ে যায় নাই। আর রিকাযে (মাটি গর্ভে গচ্ছিত রাখা সম্পদে) এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব।

অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট রিকায, কম হোক বা বেশী হোক তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। তাদের নিকট তা বন্টনের খাত হল ফাই (যুদ্ধ বিহিন অমুসলিম

শত্রুর সম্পদ যা মুসলমানরা অর্জন করে) বন্টনের খাত। যে ব্যক্তি তা পাবে সে বাকী রিকাযের মালিক হবে, এতে বিদ্যানগণের কোন মতনৈক্য নেই। কারণ উমার (রাযিআল্লাহু আনহু) অবশিষ্ট রিকায তার প্রাপককে দিয়েছিলেন।

❖ প্রশ্ন-৬। যাকাত বন্টনের খাত সমূহ কি কি?

উত্তর- আট শ্রেণীর লোক যাকাত পাওয়ার হক্বদার। নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হলোঃ

প্রথমতঃ الفقراء ফকীরঃ আর তারা হলেন ঐ সকল লোক যাদের কাছে জীবন যাপনের কোন কিছুই নেই, অথবা কিছুটা আছে, তাদেরকে পূর্ণ বছরের জন্য যথেষ্ট হয় এই পরিমাণ যাকাত থেকে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়তঃ المساكين মিসকীনঃ যাদের নিকট অর্ধবছর বা অর্ধবছরের চেয়ে কিছু বেশী সময়ের খাবার রয়েছে। এই অর্থে মিসকীনের অবস্থা ফকীরের অবস্থার চেয়ে ভাল। তাদেরকে তাদের পুরা বছরের জন্য যথেষ্ট হয় এই পরিমাণ যাকাত দেওয়া হবে।

তৃতীয়তঃ العاملين যাকাত আদায়কারীঃ আর তারা হলেন, ঐ সমস্ত কর্মচারী যারা যাকাত দাতাদের নিকট হতে তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং নেতার আদেশে তার হক্বদারের নিকট বিতরণ করেন। তাদেরকে তাদের কর্মের পারিশ্রমিক হিসাবে যাকাত প্রদান করা হবে।

চতুর্থতঃ المؤلفات قلوبهم যাদের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্য হবেঃ আর তারা দু' শ্রেণীর লোকঃ কাফির এবং মুসলিম।

- অতঃপর কাফিরকে যাকাত দেওয়া হবে যখন তার ইসলাম গ্রহণ করার প্রত্যাশা করা যাবে ইত্যাদি ।
- আর মুসলিম ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া হবে তার ইসলাম গ্রহণকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বা তারমত আরও একজনের ইসলাম গ্রহণের আশায়। এরকম অন্য আরো কারণে।

পঞ্চমতঃ الرقاب দাস সমূহঃ আর তারা হলেন ঐ সমস্ত মুকাতিব দাস যাদের কাছে তাদের মালিকের সাথে কৃত চুক্তি পরিশোধের পয়সা নাই। তাই মুকাতিব দাসকে যাকাত হতে যে পরিমাণ প্রদান করলে সে দাসত্ব হতে মুক্তি পেতে সামর্থ্যবান হবে সে পরিমাণ তাকে প্রদান করা হবে।

ষষ্ঠতমঃ الغارمين ঋণগ্রস্তদেরকেঃ আর তারা দু' ভাগে বিভক্তঃ নিজেদের জন্য ঋণগ্রস্ত, এবং অন্যের কারণে ঋণগ্রস্ত।

- নিজের জন্য ঋণগ্রস্তঃ সে ঐ ব্যক্তি যে নিজের অভাবের কারণে ঋণ করেছে আর তা পরিশোধে সে সামর্থ্যবান নয়। তাই যাকাত হতে তাকে যে পরিমাণ দিলে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে সে পরিমাণ তাকে প্রদান করা হবে।
- অন্যের কারণে ঋণগ্রস্তঃ সে ঐ ব্যক্তি যে পরস্পরের মাঝে সংশোধন-ফায়সালা করার জন্য ঋণী হয়েছে। তাই সে ঋণী হলে যাকাত হতে যে পরিমাণ দিলে সে ব্যাপারে তার সহযোগিতা হবে, সে পরিমাণ তাকে প্রদান করা হবে।

সপ্তমতঃ في سبيل الله **যারা আল্লাহর রাস্তায় রয়েছেন তাদেরকেঃ** এর দ্বারা মুল উদ্দেশ্য হলোঃ যারা জিহাদে রয়েছেন। সুতরাং যে সকল মুজাহিদদের বেতন বাইতুল মালের পক্ষ হতে নির্ধারিত নেই তাদেরকে যাকাত প্রদান করা হবে।

অষ্টমতঃ ابن السبيل **মুসাফিরঃ** সে ঐ মুসাফির যার সব কিছু রাস্তায় শেষ হয়ে গেছে। তার কাছে তার দেশে পৌঁছার মত খরচ নেই। সুতরাং যাকাত হতে যে পরিমাণ তাকে দিলে সে তার দেশে পৌঁছতে পারবে সে পরিমাণ যাকাত তাকে প্রদান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা এই শ্রেণীগুলো তার বাণীতে উল্লেখ করেছেনঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থঃ বস্তুতঃ সাদ্‌কা ফকীরদের, মিসকীনদের, তা আদায়কারীদের, যাদের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্য হবে তাদের, দাস মুক্তির, ঋণগ্রস্তদের, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ও মুসাফিরদের জন্য। আল্লাহর কর্তৃক ফরয। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। *(সূরা তাওবাহ-আয়াত-৬০)*

❖ প্রশ্ন-৭। যাকাতুল ফিত্বর এর ব্যাপারে আলাচনা করুন?

উত্তর- সিয়াম সাধনাকারীদেরকে অনর্থক কথা-কাজ, সহবাস ও তার আনুসাংগিক কর্ম হতে পবিত্র করার জন্য যাকাতুল ফিত্বর চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও মিসকীনদের খাদ্য হিসাবে ও তাদেরকে ঈদের দিন মানুষের কাছে চাওয়া হতে মুক্ত রাখার জন্য চালু করা হয়েছে।

(ক) যাকাতুল ফিত্বর এর হুকুম -বিধানঃ যাকাতুল ফিত্বর প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারী, ছোট বড়, স্বাধীন-ও দাস দাসীর উপর ফরয। যে শিশুর জন্ম হয় নাই পেটে রয়েছে তার পক্ষ হতে তা আদায় করা মুস্তাহাব। নিজের, নিজ স্ত্রী ও নিকটবর্তী আত্মীয় যাদের ভরণ পোষণ করা তার দায়িত্ব রয়েছে তাদের পক্ষ

হতে ফিৎরা আদায় করা ওয়াজিব। ফিৎরা শুধুমাত্র তার উপর ওয়াজিব যার খাদ্য ও ভরণ পোষণ করা তার উপর দায়িত্ব তাদের খাদ্য ঈদের দিন ও রাত্রির জন্য যথেষ্ট হয়ে বেশী হবে।

(খ) ফিৎরার পরিমাণঃ শহরের প্রধান খাদ্য যেমন-গম, যব, খেজুর, কিসমিস-মুনাক্কা, পনির, চাল ও ভুট্টা হতে যাকাতুল ফিতরের নির্ধারিত পরিমাণ হল এক স্বা'আ। আর এক স্বা'আ প্রায় দু' কিলো একশত ছিয়াত্তর গ্রাম এর সমান। আর অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট ফিৎরার মূল্য বের করা জায়েয নয়। কারণ ইহা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা আদেশ দিয়েছেন তার বিপরীত এবং সাহাবাদের আমলের পরিপন্থী।

(গ) ফিৎরা আদায় করার সময়ঃ ফিৎরা আদায় করার দুইটি সময় রয়েছেঃ (ক) জায়েয সময়ঃ আর তা হলো, ঈদের একদিন বা দু' দিন আগে আদায় করা।(খ) উত্তম সময়ঃ আর তা হলো, ঈদের দিনের ফজর উদিত হওয়া হতে - ঈদের নামায আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত ফিৎরা আদায় করা। কেউ যদি তা ঈদের নামাযের পরে আদায় করে তবে তা সাধারণ সাদ্‌কা (দান) হিসাবে গণ্য হবে। আর সে এই বিলম্বের কারণে গুনাহগার হবে।

(ঙ) যাকাতুল ফিত্বর বিতরণের খাতঃ যাকাতুল ফিত্বর ফকীর ও মিসকীন এর জন্য বিতরণ করা হয়। কারণ অন্যদের চাইতে এরাই এর অধিক হক্বদার।

চতুর্থ রুক্নঃ রামাযানের সিয়াম সাধনা

❖ প্রশ্ন-১। সিয়ামের সংজ্ঞা কি?

উত্তর- : **الصيام لغة** - সিয়ামের শাব্দিক অর্থঃ বিরত থাকা।

وشرعاً: - পারিভাষিক অর্থঃ ফাজরে সানী উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার রোযা ভঙ্গের কারণ হতে বিরত থাকা।

❖ প্রশ্ন-২। রামাযান মাসের সিয়াম সাধনের বিধান কি?

উত্তর- ইসলামের রুক্ন সমূহের অন্যতম একটি রুক্ন ও তার মহান স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة/١٨٣]

অর্থঃ হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পারো। (সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৮৩)

হিজরী সনের দ্বিতীয় বর্ষে মুসলিম উম্মার উপর রামাযানের সিয়াম সাধন ফরয হয়েছে।

❖ প্রশ্ন-৩। সিয়াম ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ কি কি?

উত্তর- নিশ্চয়ই সিয়াম সাধন প্রত্যেক বালেগ-প্রাপ্ত বয়স্ক আকেল-জ্ঞানবান সহীহ-সুস্থ্য মুকীম মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরয হওয়ার উপর সকল আলেমগণ একমত হয়েছেন। হায়েয ও নিফাসরত মহিলা ছাড়া অন্যান্য মহিলাদের উপরও সিয়াম সাধন ফরয।

❖ প্রশ্ন-৪। সিয়াম সাধনের আদাব সমূহ কি কি?

উত্তর-(ক) গিবাত করা, চুগোল খোরী করা এবং এ দু'টি ছাড়াও অন্যান্য কর্ম যা আল্লাহ হারাম করেছেন তা থেকে সিয়াম সাধন কারীর বিরত থাকা। তাই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর অপরিহার্য যে, সে তার জবানকে সকল হারাম কথাবার্তা হতে ও অন্যদের চরিত্রতে আঘাত হানা হতে বিরত রাখবে।

(খ) সিয়াম সাধনকারী সাহ্‌রী খাওয়া ছাড়বেনা। কারণ ইহা তাকে তার সিয়াম সাধনে সহযোগিতা করে। (গ) নিশ্চিতভাবে সূর্য ডুবার সাথে সাথেই ইফতার করা। (ঘ) রুত্বাব (অর্ধপক্ক খেজুর) বা খেজুর দিয়ে ইফতার করার চেষ্টা করবে, কারণ ইহা সুন্নাত। (ঙ) কুরআন পাঠ আল্লাহ তা'আলার যিকির তার প্রশংসা ও তার শুকরিয়া, দান, দয়া, নফল ইবাদাত ও অন্যান্য সৎকাজ বেশী বেশী করা।

❖ প্রশ্ন-৫ । সিয়াম বিনষ্ট কারী বিষয় সমূহ কি কি?

উত্তর- ১) দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করা। ২) রামাযান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করা। ৩) চুমু, সহবাস বা হস্ত মৈথুনে বীর্য বের করা। ৪) পাকস্থলীতে বিদ্যমান বস্তু মুখ দিয়ে বের করে ইচ্ছা কৃত বমি করা। ৫) হায়েয ও নিফাস দেখা দিলে।

❖ প্রশ্ন-৬। সিয়ামের সাধারণ বিধান সমূহ কি কি?

উত্তর- ১) চাঁদ দেখার মাধ্যমে রামাযান মাসের সিয়াম সাধন ফরয প্রমাণিত হবে। চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজন ন্যায় পরায়ণ মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষীই যথেষ্ট।

২) প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে যে ব্যক্তি রামাযান মাসকে পাবে তার উপর সে মাসের দিন গুলো তা ছোট হউক বা বড় হউক সিয়াম সাধন করা ফরয হবে।

৩) সিয়াম সাধন কারীর রাতেই সিয়ামের নিয়াত করা আবশ্যক।

৪) ওজর যুক্ত ব্যক্তি যেমন অসুস্থ্য বা মুসাফির ব্যক্তি বা হায়েয বা নিফাসরত মহিলা বা গর্ভধারিণী, বা বাচ্চাকে দুধ পান কারীনি মহিলা ছাড়া কারো জন্য রামাযান মাসের সিয়াম সাধন ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়। অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা তাদের জন্য সিয়াম ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি আছে, যদি সিয়াম সাধন তাদের পক্ষে খুব কষ্টকর হয়।

৫) আর সফর বা ভ্রমণ হল সিয়াম সাধন ছেড়ে দেওয়ার গ্রহণযোগ্য কারণ সমূহের একটি কারণ। অবশ্য পরে কাযা করতে হবে।

পঞ্চম রুক্নঃ হাজ্জ

❖ প্রশ্ন-১ । হাজ্জের সংজ্ঞা কি?

উত্তর- الحج في اللغة: - হাজ্জের শাব্দিক অর্থঃ القصد। (আলকাসদু) ইচ্ছা করা। আরবী ভাষায় বলা হয়ঃ حج إلينا فلان অমুকে আমাদের নিকট হাজ্জ করেছে। অর্থাৎ সে আমাদের নিকট আসার ইচ্ছা করেছে ও আমাদের নিকট এসেছে।

وفي الشرع: - হাজ্জের পারিভাষিক অর্থঃ নির্ধারিত শর্তসহ নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদাত করার জন্য মাক্কায় গমণের ইচ্ছা করাকে হাজ্জ বলে।

❖ প্রশ্ন-২ । হাজ্জের হুকুম কি?

উত্তর- সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর তার জীবনে একবার হাজ্জ ফরয হওয়া এবং তা পাঁচটি স্তম্ভ যার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত তার অন্যতম একটি স্তম্ভ হওয়ার ব্যাপারে উম্মাত ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران/٩٧]

মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেহ প্রত্যাখ্যান করলে সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ বিশ্ব-জগতের মুখাপেক্ষী নহেন। *(সূরা আল-ইমরান-আয়াত-৯৭)*

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেনঃ

أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا

হে মানব জাতি! আল্লাহ তোমাদের উপর বায়তুল্লাহর হাজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হাজ্জ কর। (মুসলিম)

❖ প্রশ্ন-৩ । হাজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ কি কি?

(ক) হাজ্জ ফরয হয় পাঁচটি শর্তে, এতে বিদ্যানগণের মতনৈক্য নেই। আর তা হলোঃ

ইসলাম বা মুসলিম হওয়া, জ্ঞানবান হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, স্বাধীন হওয়া, ও সামর্থ্য থাকা। তবে মহিলার উপর হাজ্জ ফরয হওয়ার জন্য হাজ্জের সফরে তার সাথে মাহ্‌রাম থাকা আবশ্যক।

❖ প্রশ্ন-৪ । হাজ্জের আর্‌কান বা রুক্ন সমূহ কি কি?

উত্তর- হাজ্জের আর্‌কান চারটিঃ (ক) ইহ্‌রাম বাঁধা। (খ) আরাফায় অবস্থান করা। (গ) তাওয়াফুয যিয়ারা। (ঘ) সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা।

আর এই চারটি আর্‌কানের কোন একটি রুক্‌ন ছুটে গেলে হাজ্জ পূর্ণ হবে না।

❖ প্রশ্ন-৫। হাজ্জের ওয়াজিব সমূহ কি কি?

হাজ্জের সর্ব মোট ওয়াজিব সাতটিঃ (১) মীকাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা। (২) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা, ইহা তাদের জন্য যারা দিনের বেলায় আরাফায় অবস্থান করবে। (৩) মুয্‌দালিফায় রাত্রি যাপন। (৪) আইয়্যামে তাশ্‌রীকের (১১, ১২ ও ১৩ই- যুলহাজ্জাহর) রাত্রি গুলোতে মিনায় রাত্রি যাপন করা। (৫) জামারাত গুলোতে কঙ্কর মারা। (৬) মাথার চুল মুন্ডানো বা ছোট করা। (৭) তাওয়াফুল বি'দা করা।

সুন্নাত ও বিদআত

❖ প্রশ্ন-১। সুন্নাত কি?

উত্তর- 'সুন্নাত' শব্দের আভিধানিক অর্থঃ الطريق। 'পথ'। কুরআন মজিদে এই 'সুন্নাত' শব্দটি বহুক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি আয়াত হলঃ

{سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} [الفتح: ٢٣]

"আল্লাহর সুন্নাত, যা পূর্ব থেকেই কার্যকর হয়ে রয়েছে। আর আল্লাহর এ সুন্নাতে কোনরূপ পরিবর্তন দেখবে না কখনো।" *(ফাতাহ্ঃ ২৩)*

এ আয়াতে ব্যবহৃত সুন্নাত শব্দের শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ **طريقه** পথ, পন্থা এবং পদ্ধতি। এভাবে দেখা যায় যে, 'সুন্নাত'শব্দটি যেমন আল্লাহর ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়েছে, তেমনি করা হয়েছে নবী ও রাসূলদের ক্ষেত্রেও।

আল্লাহর সুন্নাত ও নবীর সুন্নাতঃ ইমাম রাগেব ইসফাহানী বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালার সুন্নাত বলা হয় তাঁর কর্মকুশলতার বাস্তব পন্থাকে, তাঁর আনুগত্যকারীর নিয়ম পদ্ধতিকে। আর নবীর সুন্নাত হচ্ছে সেই নিয়ম, পন্থা ও পদ্ধতি, যা তিনি বাস্তব কাজে ও কর্মে অনুসরণ করে চলতেন।

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد (ضعيف)

অর্থঃ- আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যাক্তি আমার উম্মতের ক্রান্তিলগ্নে আমার সুন্নাহকে শক্ত ভাবে ধারন করবে তার জন্য একশত শহীদের সওয়াব। (দুর্বল হাদীস) (মিশকাত)

হাদীস-বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় 'সুন্নাত' হচ্ছে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর মুখের কথা, কাজ ও সমর্থন। অনুমোদনের বর্ণনা যাকে প্রচলিত কথায় বলা হয় 'হাদীস'। আর ফিকাহ্শাস্ত্রে 'সুন্নাত' বলা হয় এমন কাজকে, যা ফরজ বা ওয়াজিব নয় বটে; কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তা প্রায়ই করেছেন।

আমাদের আলোচ্য সুন্নাত হল সেই মূল আদর্শ, যা আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশ্ব-মানবের জন্যে নাযিল করেছেন, যা রাসূলে করীম (সাঃ) নিজে তাঁর জীবনে দ্বীনি দায়িত্ব পালনের বিশাল ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন; কেননা নবী করীম (সাঃ) যা বাস্তবভাবে অনুসরণ করেছেন, তার উৎস হল ওহী, যা আল্লাহ্র নিকট থেকে তিনি লাভ করেছেন। এ 'ওহী' দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে আল্লাহ্র কালাম কুরআন মজীদ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ওহীয়ে খফী, বিশেষ পন্থায় আল্লাহ্র জানিয়ে দেয়া বিধান ও নির্দেশ। রাসূলে করীম (সাঃ) এর কর্মজীবনে এ দুটোরই

সমন্বয় ঘটেছে পুরোপুরিভাবে। ওহীর সূত্রে নাযিল হওয়া আদর্শই রাসূলে করীম (সাঃ) বাস্তব কাজে ও কর্মে অনুসরণ করেছেন, তা-ই হচ্ছে আমাদের আলোচ্য 'সুন্নাত'। এই সুন্নাতেরই অপর নাম ইসলাম।

❖ প্রশ্ন-২। البدعة বিদআত কি?

উত্তর- সুন্নাতের বিপরীতই হচ্ছে বিদআত। ইমাম রাগেব 'বিদআত' শব্দের অর্থ লিখেছেনঃ কোনরূপ পূর্ব নমুনা না দেখে এবং অন্য কিছুর অনুসরণ না করেই কোন কার্য নতুনভাবে সৃষ্টি করা।

শারয়ী পরিভাষায় বেদআত বলা হয়- كل ماحدث في الدين ما لا اصل له في الشرع "শরীয়াতে ভিত্তিহীনভাবে নব আবিস্কৃত সকল এবাদতকেই বিদআত বলা হয়।" ইমাম শাত্বেবী (রাহঃ) বলেন;

البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليهاما يقصد بالطريقة الشريعة

ইসলামের ভিতরে নব আবিস্কৃত এমন সব এবাদত যা শরীয়তে স্বীকৃত এবাদতের মতই সওয়াবের উদ্দেশ্যে পালন করা হয়।

শরীয়াত প্রবর্তক যে কথা বলেন নি সে কথা বলা এবং তিনি যা করেন নি এমন কাজকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা, তা-ই হচ্ছে বিদআত। এমন সব কাজ করা বিদআত, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। 'দ্বীনের মধ্যে রাসূল সা. ও সাহাবা কর্তৃক প্রবর্তিত আক্বিদা ও আমল পরিপন্থী নতুন আক্বিদা ও আমলের প্রচলন ঘটানো।' সূরা 'আল-কাহাফ'-এর এক আয়াতে 'বিদআত' শব্দের এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤) [الكهف/١٠٣-١٠٥]

"বল হে নবী, আমি আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের কথা কি তোমাদের বলব? তারা হচ্ছে এমন লোক, যাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনাই দুনিয়ার জীবনে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে আর তারাই মনে মনে ধারনা করে যে, তারা খুবই ভাল কাজ করেছে।" (আল কাহাফঃ ১০৩-১০৪)

বিদয়াতপন্থীরাও ঠিক এমনি। তারা যেসব কাজ করে, আসলে তা আল্লাহ্‌র দেয়া নীতির ভিত্তিতে নয়। তা সত্ত্বেও তারা তাকেই নেক আমল এবং বড় সওয়াবের কাজ বলে মনে করে।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد

'যে আমাদের দ্বীনে নতুন কিছু সংযোজন ও সৃষ্টি করবে যা মূলত তাতে নেই সেটি পরিত্যাজ্য।' (বুখারী ও মুসলিম)

কুরআন মজীদে দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا [المائدة/٣]

"আজকের দিনে তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ -পরিণত করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম-মনোনীত করলাম।" (আল-মায়েদা ৩)

এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ। তাতে নেই কোন অসম্পূর্ণতা, কোন কিছুর অভাব। না তাতে কোন জিনিস বৃদ্ধি করা যেতে পারে, না পারা যায় তা থেকে কোন কিছু বাদ দিতে। এ দুটোই দ্বীনের পরিপূর্ণতার বিপরীত এবং আল্লাহ্‌র উপরোক্ত ঘোষণার স্পষ্ট বিরোধী। ইসলামী ইবাদতের ক্ষেত্রে সওয়াবের কাজ বলে এমন সব অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করা, যা নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের জামানায় চালু হয়নি এবং তা দেখতে যতই চাকচিক্যময় হোক না কেন তা স্পষ্টই বিদয়াত, তা দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতার কুরআনী ঘোষণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

❖ প্রশ্ন-৩। দ্বীনের ভিতর বেদআতে হাসানাহ বলে কিছু আছে কি ?

উত্তর- দ্বীনের ভিতর সকল বেদআতই হারাম। যারা বেদআতকে হাসানাহ ও সাইয়্যেআহ বলে বিভক্ত করে, তারা ভুল করে থাকেন। এবং রাসূল সা.এর বাণী كل بدعة ضلالة 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক বেদআত গোমরাহি' এর বিরোধিতাকারী। কেননা, রাসূলুল্লাহ সা. বেদআত প্রসঙ্গে রায় দিতে গিয়ে বলেছেন প্রত্যেক বেদআতই গোমরাহি আর এরা বলছে, না প্রত্যেক বেদআত গোমরাহি নয় বরং কিছু বেদআত আছে হাসানাহ (ভাল)।

আল্লামা হফেয ইবনে রজব বলেন : নবী আকরাম সা.-এর বাণী (প্রত্যেক বেদআত গোমরাহি) ব্যাপক অর্থ বোধক বাক্য। কোন কিছুই তার বহির্ভূত নয়। সকল প্রকারই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটি দ্বীনের একটি বিশেষ মূলনীতি। এটি

রাসূলের নিম্নোক্ত বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বক্তব্য। আল্লাহর রাসূল বলেন (যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটি পরিত্যাজ্য হবে)

সুতরাং যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করবে এবং তাকে দ্বীনের দিকে নিসবত (সম্বন্ধযুক্ত) করবে অথচ দ্বীনে তার কোন মূল ভিত্তি নেই যার দিকে সে ফিরতে পারে, সেটিই গোমরাহি ও ভ্রষ্টতা। দ্বীন এ সকল বস্তু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

এরূপ বিভক্তকারীদের যুক্তি প্রমাণ ও তার খণ্ডন :—

সাহাবি ওমর রা. একবার সালাতে তারাবীহ সম্পর্কে বলেছিলেন : قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (কত না সুন্দর বেদআত এটি) বেদআতকে হাসানাহ ও সাইয়্যেআহ দ্বারা বিভক্তকারীদের নিকট ওমর রা. এ উক্তিটি ব্যতীত তাদের মতের স্বপক্ষে আর কোন দলিল নেই।

তারা আরো বলে যে, এরূপ আরো অনেক নতুন নতুন বিষয়ের প্রবর্তন হয়েছিল কিন্তু সালাফের কেউ সে গুলোকে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করেননি, যেমন কোরআনুল কারীমকে এক মাসহাফে একত্রিত করা, (যা রাসূলের যুগে ছিল না) হাদিস লেখা ও সংকলন করা এটিও রাসূল সা. নিজে করে যাননি।

উত্তর :- আপত্তি উত্থাপিত বিষয়গুলো বেদআত নয় বরং শরিয়তের এগুলোর একটি ভিত্তি আছে। আর ওমর রা. এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য বিদয়াতে শারয়ী নয়। সুতরাং যে সকল বিষয়ের একটি শরয়ি ভিত্তি থাকবে যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়, সে গুলো সম্পর্কে যখন বিদয়াত বলে মন্তব্য করা হবে তখন শাব্দিক বেদআত বুঝতে হবে শরয়ি নয়। আর সালাতে তারাবীহ তো রাসূলুল্লাহ সা. নিজেই সাহাবিদের নিয়ে পড়ে ছিলেন। শেষ দিকে এসে ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তিনি তাদের থেকে পিছিয়ে গেছেন। তবে সাহাবারা বিক্ষিপ্ত ভাবে রাসূলের জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পর ধারাবাহিক ভাবে পড়েছেন। এক পর্যায়ে এসে ওমর রা. সকলকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করে দিয়েছেন যেমন তারা রাসূলের পিছনে পড়ে ছিলেন। সুতরাং এটি দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন বেদআত ছিল না। এখনও নয়।

আর এক মাসহাফে কোরআন শরীফ একত্রিত করাও শরিয়তের একটি ভিত্তি আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. নিজে কোরআন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেগুলো বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তাকারে ছিল পরে সাহাবায়ে কেরাম সংরক্ষণের নিমিত্তে সবগুলোকে এক মাসহাফে জমা করেছেন। হাদিস লিপিবদ্ধ করারও একটি শরয়ি ভিত্তি আছে। রাসূল সা. কতিপয় সাহাবিকে অনুমতি

প্রার্থনা করার পর কোন কোন হাদিস লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে তার জীবদ্দশায় কোরআনের সাথে গায়রে কোরআন মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ব্যাপক হারে লেখার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু তার ওফাতের পর উক্ত নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। কেননা তিনি জীবিত থাকা অবস্থায়ই কোরআন পূর্ণতা লাভ করে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে সম্পূর্ণ হয়। এরপর মুসলমানগণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য হাদিস সংকলনে হাত দেন।

❖ প্রশ্ন-৪। বিদ্‌আ'ত থেকে সতর্ক থাকার অপরিহার্যতা কি?

উত্তর- দ্বীনে ইসলামী একটি পরিপূর্ণ দ্বীন। আল্লাহ তায়া'লা স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত প্রবর্তন করেছেন তা স্বয়ং-সম্পুর্ন বিধায় আমাদেরকে তা অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিদ'আত বা নতুন কোন প্রথার সংযোজন থেকে নিষেধ করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول ﷺ : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد

'আমাদের এই ধর্মে (দ্বীনে) যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যান হবে। এই হাদীসটি বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র এরশাদ করেছেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

'তোমরা সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খেলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করবে। আর, তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে। সাবধান! কখনও ধর্মে (দ্বীনে) নব প্রবর্তিত কোন বিষয় গ্রহণ করবে না। কেননা প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদআ'ত এবং প্রত্যেক বিদআ'তই পথভ্রষ্টাত।'

রাসূল (সঃ) জুম'আর দিন খুৎবায় বলতেন

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হেদায়াত হলো মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হেদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো মনগড়া নব প্রবর্তিত বিষয় বিদআ'ত এবং এরূপ প্রতিটি বিদাআ'ত-ই পথভ্রষ্টতা।

وعن حسان قال : " ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة . " رواه الدارمي

অর্থ:- হাস্‌সান (রাযিঃ) বলেন, যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটায় তখন আল্লাহ (সুব:) ঐ পরিমাণ সুন্নাত তাদের থেকে তুলে নেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো ফিরে আসে না। (দারেমী, সহীহ)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল (সঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা বিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর-৭) আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"যারা তাঁর (রাসূল (সঃ)-এর) হুকুমের বিরোধীতা করে তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর কোন ফেৎনা বা কোন মর্মন্তুদ শাস্তি আসতে পারে।" (সুরা নুরঃ ৬৩) আল্লাহ পাক আরও বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب/٢١]

"প্রকৃতপক্ষে, তোমাদের মধ্যে যারা পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে খুব বেশী স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের জীবনের এক সর্বোত্তম নমুনা বর্তমান রয়েছে।" (সুরা আহ্‌যাবঃ ২১)

বিদাআত বা দ্বীনে নতুন কিছু যোগ করার মানে যে, আল্লাহ তা'য়ালা এই উম্মতের জন্য ধর্ম (দ্বীন) কে পূর্ণতা দান করেননি এবং যা যা করণীয় তার বার্তা রাসূল (সঃ) উম্মতের নিকট পৌছাননি। তাই, এইসব পরবর্তীকালের লোকেরা এসে এমন কিছু প্রবর্তন করেছেন যার অনুমতি আল্লাহ তা'য়ালা তাদের দেননি, অথচ তারা ভাবছেন এতে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হবে। নিঃসন্দেহে এতে মারাত্মক ভয়ের কারণ রয়েছে এবং তা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূল (সঃ) উপর আপত্তি উত্থাপনের শামিল। এজন্য ইমাম মালেক (রাহঃ) বলেন,

قال الإمام مالك : من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا ﷺ خان الرسالة لأن الله يقول : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } (سورة المائدة:٣) فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا (محبة الرسول بين الاتباع والابتداع - (ج ١ / ص ٢١٨،٢٢٥)

অর্থ:- যে ব্যাক্তি ইসলামের মধ্যে কোন বিদআত চালু করল। অতপর সেটিকে "বিদআতে হাসানাহ" বলে আখ্যায়িত করল। সে যেন দাবী করল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানত করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলছেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।" সুতরাং যা ঐ সময় (দ্বীন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করার সময়) দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। তা আজকেও দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। (মহাব্বতুর রাসুল পৃ: ২১৮)

❖ প্রশ্ন-৫। বিদআত সনাক্ত করার উপায় কি?

উত্তরঃ- যে কোন কিছু পরিমাপের জন্য একটি মাপকাঠি বা স্কেল রয়েছে। যেমন ঘরের মেঝের লম্বা মাপার জন্য মিটার এবং গজের ফিতা রয়েছে। রোগীর জ্বর পরিমাপের জন্য থার্মোমিটার রয়েছে। ঠিক তেমনি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইসলাম দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোগ করা যে কোন বিষয় (বিদ'আত) সনাক্ত করার জন্য একটা মাপকাঠি বা স্কেল দিয়েছেন। আর এই মাপকাঠি হল আল কুরআন ও সহীহ হাদীস।

বড় আলেম, বুযুর্গ, পীর বাবা, মুরুব্বী যা কিছু বলল বা করলো বা করতে উপদেশ দিল আমার কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে যে মাপকাঠি বা স্কেল (কুরআন ও সুন্নাহ) দেয়া আছে তাতে যাচাই করে দেখবো। যদি তা কুরআন ও সুন্নাহতে কোথাও না পাওয়া যায় , যদি কোন দলিল না থাকে তবে আমি নিশ্চিত হতে পারি এগুলো সব বিদ'আত। কারণ বুযুর্গ, আলেম, পীরবাবা যা বলে তাই দলিল না, তারা যা বলছে বা করছে বা করতে বলছে তা প্রমাণের জন্য কোরআন আর সুন্নাহর দলিল দরকার।

❖ প্রশ্ন-৬। প্রচলিত কিছু বিদআতের উদাহরন কি কি?

উত্তরঃ- প্রচলিত বেদআত সম্পর্কে সামান্য আলোচন করব।

(১) ঈদে মিলাদুন্নবী সা. উদযাপন: এসব অনুষ্ঠানাদি বেদআত ও খ্রিস্টানদের সাদৃশ্যাবলম্বন। এই মিলাদুন্নবী রাসুল (সাঃ) নিজে করেন নাই, কোন সাহাবী করেন নাই, তাবেঈ করেন নাই, কোন ইমামগণ করেন নাই, কোন মুহাদ্দিসীন করেন নাই।

(২) মৃত বা জীবিত ব্যক্তিবর্গ, পুণ্যভূমি ও নিদর্শন থেকো বরকত লাভ করা: নব প্রবর্তিত বেদআতের একটি হচ্ছে মাখলুক দ্বারা বরকত প্রার্থনা করা, এটি পৌত্তলিকতার একটি ধরন। মাজার, পীর, ফকিরদের সাথে জড়িত এই ধরনের অসংখ্য বিদয়াতের ছড়াছড়ি মানুষের মধ্যে।

(৩) ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্যার্জনের ক্ষেত্রে বেদআত: বর্তমান যুগে ইবাদতের ক্ষেত্রে নব প্রবর্তিত বেদআতের সংখ্যা অনেক, যেমন (১) উচ্চে কণ্ঠে

নামাজের নিয়্যত করা। (২) নামাজের পর জামাতবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চস্বরে জিকির করা। (৩) বিভিন্ন উপলক্ষে, দোয়ার পূর্বে পরে এবং মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সূরা ফাতেহা পড়তে বলা। (৪) মৃতদের জন্য তাজিয়া ও মাতম অনুষ্ঠান করা, খাবার দাবার ও ভোজের আয়োজন করা, পয়সার বিনিময়ে কোরআন তেলাওয়াতের আয়োজন করা। (৫) ধর্মের নামে বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠান ও উৎসব উদযাপন করা। (৬) রকমারি বেশে, নানাবিধ ঢংয়ে বহুবিধ আওয়াজে সুরে সুর মিলিয়ে তালে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন জিকির আযকার করা, যা আজকালকার সুফীরা করে থাকে। (৭) শাবান মাসের মধ্য রজনীকে রাত জাগরণ এবং দিনকে রোজা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। (৮) প্রচলিত বেদআতের আরও একটি হচ্ছে কবরের উপর সৌধ জাতীয় কিছু নির্মাণ করা, তাকে সেজদার স্থান বানানো, বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে জিয়ারত করা, মৃত ব্যক্তিদের ওসীলা দেয়াসহ এজাতীয় শিরকী কাজ-কারবার। (৯) খতমে খাজেগান। (১০) দুরুদে হাজারী। (১১) ৩১৩ বদরী সাহবীদের নামে চাঁদা কমিটি। (১২) বোখারী শরীফের খতম পড়া। (১৩) ফরজ নামাজের পড় ইমাম মুক্তাদী মিলে সম্মিলিত ভাবে দু-হাত তুলে প্রচলিত মুনাজাত করা। (১৪) তাবিজ-কবজ, তাগা-সুঁতা ইত্যাদি।

সংশয় নিরসন:-

বিদআতপন্থীরা বলে যে, বিদআতে হাসানা যদি না থাকে তাহলে মোবাইল ব্যাবহার করা, মাইক ব্যাবহার করা, প্লেনে হজ্ব করা ইত্যাদিও বিদআত হওয়া উচিৎ। কারণ এগুলো নবীর যুগে ছিল না।

উত্তর:- এরা মূলত: বিদআত কাকে বলে তাই জানে না। বিদআত হলো "সওয়াবের উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন ভাবে নতুন কোন ইবাদত তৈরী করা।" মোবাইল, মাইক ইত্যাদি তো কোন সওয়াবের জন্য ইবাদত আকারে ব্যাবহার করা হয় না। আর এগুলোকে যদি বিদআত বলতে হয় তাহলে আপনিও বিদআত, আমিও বিদআত। কারণ আমরা কেউ নবীর যুগে ছিলাম না।

কবিরাহ গুনাহ

❖ প্রশ্ন-১। কবিরাহ গুনাহ কাকে বলে?

উত্তরঃ- অনেকেই মনে করেন,কবীরা গুনাহ মাত্র সাতটি যার বর্ণনা একটি হাদীসে এসেছে। মূলতঃ কথাটি ঠিক নয়। কারণ, হাদীসে বলা হয়েছে, উল্লিখিত সাতটি গুনাহ কবীরা গুনাহের অর্ন্তভুক্ত। এ কথা উল্লেখ করা হয়নি যে, কেবল এ সাতটি গুনাহই কবীরা গুনাহ, আর কোন কবীরা গুনাহ নেই।

একারণেই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- কবীরা গুনাহ সাত হতে সত্তর পর্যন্ত -(তাবারী বিশুদ্ধ সনদে)।

ইমাম শামসুদ্দিন আয-যাহাবী বলেন, উক্ত হাদীসে কবীরা গুনাহের নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করা করা হয়নি।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রহ. বলেন, কবীরা গুনাহ হল: যে সব গুনাহের কারণে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক শাস্তির বিধান আছে এবং আখিরাতে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, যে সব গুনাহের কারণে কুরআন ও হাদীসে ঈমান চলে যাওয়ার হুমকি বা অভিশাপ ইত্যাদি এসেছে তাকেও কবীরা গুনাহ বলে।

[কিতাবুল কাবায়ের, সামুসুদ্দীন আয যাহাবী]

❖ প্রশ্ন-২। কবিরাহ গুনাহগুলো কি কি?

উত্তরঃ- কবিরাহ গুনাহগুলো হচ্ছে-

(১) আল্লাহর সাথে শরীক করা। (২) নর হত্যা করা। (৩) যাদুটোনা করা। (৪) সালাত পরিত্যাগ করা। (৫) যাকাত না দেওয়া। (৬) বিনা ওযরে রমযানের সিয়াম ভঙ্গ করা। (৭) হজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা। (৮) মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। (৯) আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করা। (১০) ব্যাভিচার করা। (১১) সমকামিতা। (১২) সুদ। (১৩) ইয়াতিম এর মাল আত্মসাৎ করা এবং তার উপর জুলুম করা। (১৪) মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা:)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা। (১৫) যুদ্ধের ময়দার থেকে পলায়ন করা। (১৬) ইমাম বা নেতা কর্তৃক প্রজাদের ধোঁকা দেওয়া এবং তাদের উপর জুলুম করা। (১৭) অহংকার ও বড়াই করা। (১৮) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। (১৯) মদ্যপান। (২০) জুয়াখেলা। (২১) সতী-সাধ্বী নারীকে ব্যাভিচারের অপবাদ দেওয়া। (২২) গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা। (২৩) চুরি করা। (২৪) ডাকাতি এবং ছিনতাই করা। (২৫) মিথ্যা কসম খাওয়া। (২৬) জুলুম বা অত্যাচার। (২৭) বিক্রয়কর বা তোল আদায় করা। (২৮) হারাম খাওয়া তা যেভাবেই হোক। (২৯) আত্মহত্যা করা। (৩০) কথায় কথায় মিথ্যা বলা। (৩১) দুর্নীতিপরায়ণ

বিচারক। (৩২) বিচারের জন্য (বিচারকের) ঘুষ গ্রহন। (৩৩) পোশাক-পরিচ্ছদে নারী ও পুরুষের মাঝে সাদৃশ্য সৃষ্টি। (৩৪) দাইয়ুস এবং যে দুজনের মধ্যে বিবাদ ঘটাবার চেষ্টা করে। (৩৫) হিলাকারী এবং যার হিলা করা হয়। (৩৬) পেশাব থেকে পবিত্র না থাকা যা খৃষ্টানদের স্বভাব। (৩৭) রিয়া (লোক দেখানো কাজ)। (৩৮) পার্থিব উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অর্জন এবং ইল্‌ম গোপন করা। (৩৯) খিয়ানত বা বিশ্বসঘাতকতা। (৪০) খোঁটা দেওয়া। (৪১) তাকদিরকে অবিশ্বাস করা। (৪২) কান পেতে অন্য লোকের গোপন কথা শোনা। (৪৩) চোখলখোরী করা। (৪৪) লা'নত করা বা অভিশাপ দেয়া। (৪৫) ওয়াদা করে তা রক্ষা না করা। (৪৬) গণক বা জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা। (৪৭) স্বামীর অবাধ্য হওয়া। (৪৮) প্রতিকৃতি বা চিত্রাংকন করা। (৪৯) বিপদে অধৈর্য হওয়া। (৫০) সীমালংঘন করা। (৫১) দুর্বল, দাস-দাসী, স্ত্রী এবং পশুর প্রতি কঠোর হওয়া। (৫২) প্রতিবেশীকে কষ্ট ও গালি দেওয়া। (৫৩) মুসলমানদের কষ্ট ও গালি দেওয়া। (৫৪) আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের কষ্ট দেওয়া এবং তাদের ওপর হস্তক্ষেপ করা। (৫৫) অহংকার ও গৌরব প্রকাশের উদ্দেশ্যে লুঙ্গি, জামা ইত্যাদি পোশাক পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়া। (৫৬) পুরুয়ের স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় পরিধান করা। (৫৭) ক্রীতদাসের পলায়ন। (৫৮) মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করা। (৫৯) যে পিতা নয় তাকে জেনেশুনে পিতা বলে পরিচয় দেয়া। (৬০) ঝগড়া, আত্মম্ভরিতা ও বিতন্ডা। (৬১) প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে না দেওয়া। (৬২) মাপে এবং ওজনে কম দেওয়া। (৬৩) আল্লাহর দেয়া অবকাশকে নিরাপদ মনে করা। (৬৪) আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। (৬৫) বিনাওজরে জামা'আত তরক করে একা একা সালাত পড়া। (৬৬) ওজর ছাড়া জুমু'আ এবং জামা'আত তরক করার ওপর অটল থাকা। (৬৭) ওসীয়ত দ্বারা অনিষ্ট করা। (৬৮) প্রতারণ এবং ধোঁকাবাজি। (৬৯) মুসলমানদের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করা এবং তা ফাঁস করে দেয়া। (৭০) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে গালমন্দ করা। [কিতাবুল কাবায়ের, সামুসুদ্দীন আয যাহাবী]

❖ প্রশ্ন-৩। কবিরাহ গুনাহ থেকে কিভাবে পরিত্রান লাভ করা যায়? কবিরাহ গুনাহ মুক্ত জীবনের সুফল কি?

উত্তরঃ- তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার ফলে কোন কবীরা গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر/٥٣]

বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা, যুমার ৩৯ঃ৫৩)

মুলত একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে গুনাহ থেকে পরিত্রান লাভ করা যায়। তবে এর জন্য চারটি শর্ত রয়েছে-

১। আন্তরিকভাবে খালিস নিয়্যাতের সাথে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া।

২। ভবিষ্যতে এ গুনাহ আর না করার সংকল্প।

৩। অবিলম্বে উক্ত গুনাহ একেবারেই পরিত্যাগ করা।

৪। গুনাহের সাথে মানুষের অধিকার জড়িত থাকলে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জীবিত থাকে তাহলে তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়া, প্রয়োজনে তাকে বা তার উত্তরাধিকারকে সন্তোষজনক ক্ষতিপূরন দেয়া।

এ চারটি শর্ত পূরনপূর্বক মাফ চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ কবীরাহ গুনাহ মুক্ত জীবন-যাপনকারীদের সম্পর্কে বলেনঃ

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

[النجم/٣٢]

যারা বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীলকার্য থেকে বেঁচে থাকে ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত। (সূরা, আন নাজম ৫৩ঃ৩২)

[কিতাবুল কাবায়ের, সামুসুদ্দীন আয যাহাবী]

ইসলামী আক্বীদার কতিপয় গুরুত্বপূর্ন দিক

❖ প্রশ্ন-১। আক্বীদাহ কি?

উত্তরঃ- আভিধানিক দিক থেকে আক্বীদাহ শব্দ উৎকলিত হয়েছে, আক্দুন, তাওসীকুন, ইহকামুন, ইত্যাদি শব্দ থেকে। অর্থাৎ বাধাঁ, দৃঢ় করা ইত্যাদি।

পরিভাষায় আক্বীদাহ বলতে বুঝায়ঃ সন্দেহাতীত প্রত্যয় এবং দৃঢ় বিশ্বাসকে।

তাহলে ইসলামী আক্বীদাহ বলতে বুঝায়ঃ আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা অনিবার্য কারণেই আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর আনুগত্যকে মেনে নেওয়া, এবং ফিরিশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, সকল রাসূল, কিয়ামত দিবস, তাকদীরের ভালোমন্দ, কুরআন হাদীসে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত সকল তত্বমূলক বা কর্মমূলক বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।

❖ প্রশ্ন-২। সালফে সালেহীন কাকে বলে?

উত্তরঃ- সালফে সালেহীন বলতে বুঝায় প্রথম তিন সোনালী যুগের লোকদের অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীন ও আমাদের সম্মানিত হেদায়েতপ্রাপ্ত ইমামগণ।

❖ প্রশ্ন-৩। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত কারা? আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র পরিচয় এবং প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

উত্তরঃ- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত বলা হয় ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ পথের অনুসারী। তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ বলা হয় এ কারণে যে, তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের অনুসারী এবং তাঁর সুন্নাতের অনুগত এবং তাদেরকে আল জামায়াত বলা হয় এ কারণে যে, তাঁরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, দ্বীনের ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে হেদায়েতপ্রাপ্ত ইমামদের ছত্রছায়ায় একত্রিত হয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হননি, এছাড়া যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের পূর্বসূরী সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ একমত হয়েছেন তারা তাঁর অনুসরণ করে, তাই এই সমস্ত কারণেই তাদেরকে আল জামায়াত বলা।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআর পরিচয় এবং প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতকে পরিত্রাণপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত দলও বলা হয়। এ জামায়াতের লোকদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা পাথক্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে তাদের কিছু নিদর্শন আছে যা তাদেরকে চিহ্নিত করা যায়। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলঃ

১. তারা কুরআন তিলাওয়াত, অধ্যায়ন ও গবেষণার মধ্যদিয়ে ইহার গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এমনিভাবে রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসকে জেনে বুঝে এবং সহীহ

হাদীসকে দুর্বল হাদীস হতে চিহ্নিত করে হাদীসের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এর কারণ হলো কুরআন ও সুন্নাহই তাদের জ্ঞানের মূল উৎস। এছাড়া তারা জ্ঞান অর্জন করে উহাকে আমলে পরিণত করেন।

২. পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করা এবং পুরো কুরআনের উপর বিশ্বাস করা অর্থাৎ তারা কুরআনে আলোচিত শাস্তি পুরস্কার--- আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনাকারী সমস্ত আয়াতের উপর বিশ্বাস রাখেন। এবং তারা সমন্বয় সাধন করেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভাগ্য ও বান্দার ইচ্ছা এবং কর্মের মধ্যে তেমনি সমন্বয় বজায় রাখেন ইলম ও ইবাদত, শক্তি ও রহমত, উপায় অবলম্বন ও উহার বর্জনের মধ্যে।

৩. তারা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করেন এবং বিদ'আতকে পরিহার করেন, সংঘবন্ধ জীবন যাপন করেন এবং ধর্মের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী সকল পথ বর্জন করেন।

৪. তারা হেদায়েত পাওয়ার জন্য সাহাবা এবং তাবেয়ীন যারা ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও হেদায়েতের ধারক ও বাহক তাদের পথকে অনুসরণ করেন এবং যারা সাহাবায়ে কেরামদের বিরোধিতা করে তাদেরকে পরিহার করেন।

৫. তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারীঃ অর্থাৎ আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয়ে না তারা অতিরঞ্জিতকারীদের মত না এ বিষয়কে তুচ্ছ ও অনীহা পোষণকারীদের মত। এভাবে সমস্ত কাজকর্ম এবং আচার ব্যবহারে তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী।

৬. সব সময় তারা মুসলমানদের সত্য পথে এবং তাওহীদের উপর একত্রিত করার জন্য এবং তাদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টিকারী সমস্ত কিছুকে দূরীভূত করার জন্য সচেষ্ট থাকেন। কাজেই দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলিতে মুসলিম উম্মার মধ্যে তাদের বৈশিষ্ট্য শুধু সুন্নাত ও সংঘবন্ধ জীবন যাপনের মাধ্যমে। আর তারা শুধুমাত্র ইসলাম ও সুন্নাতের ভিত্তিতেই শত্রুতা বা বন্ধুত্ব করেন।

৭. তাদের আরো বৈশিষ্ট্য হলো তারা আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করেন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করেন। আল্লাহর পথে জিহাদ করেন। রাসূলের সুন্নাতকে জীবিত করেন, দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কাজ করেন এছাড়া ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল পর্যায়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

৮. ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাঃ তারা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থের চাইতে আল্লাহর অধিকারকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তারা না কারো ভালোবাসায় অতিরঞ্জিত করেন এবং না কারো দুশমনিতে সীমালঙ্ঘন করতঃ তাদের সাথে অশুভ আচরণ করেন এবং না কোন মহৎ ব্যক্তির মহত্বকে অস্বীকার করেন।

৯. জ্ঞান আহরণের মূল উৎস কুরআন সুন্নাহ হওয়ার কারণে তাদের চিন্তা-চেতনা এবং প্রত্যেক অবস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে, যদিও তাদের যুগ বা ভুখন্ড ভিন্ন হোক।

১০. সকল মানুষের সাথে অনুগ্রহ, দয়া এবং উত্তম আচরণ করা তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১১. আল্লাহ তাঁর কিতাব-আল-কুরআন, রাসূল (সাঃ), মুসলমানদের নেতাগণ এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য নসীহত[৪] করাও তাদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

১২. মুসলমানদের সমস্যাদির গুরুত্ব দেয়া এবং তাদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকাও তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

❖ প্রশ্ন-৪। তাইফাহ আল মানসুরাহ কারা? তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তরঃ-আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك

"আমার উম্মাহ থেকে এমন এক দল (তাইফাহ্‌) থাকবে, যারা আল্লাহ্‌র হুকুম প্রতিষ্ঠা করতে বিরত হবে না, তারা সেইসব লোক থেকে নিরাপদ যারা তাদের সাথে প্রতারণা করে অথবা বিরূদ্ধাচারণ করে, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র হুকুম আসে যখন তারা মানুষের ওপর প্রাধান্য লাভ করে।"

অধিকাংশ সালাফগণের মতে এই 'সফলকাম দল (আত্‌-তাইফাহ্‌ আল-মানসুরাহ্‌)' হল সকল উলামাহ এবং হাদীসের অনুসরণকারী (সুন্নাহর অনুসরণকারী যেরূপ আল-বুখারী এবং আহমেদ বিন হাম্বল বর্ণনা করেছেন)। এ সংক্রান্ত "..এই দ্বীন, প্রতিষ্ঠা হবে এর ওপর যুদ্ধ করার মাধ্যমে.. " রাসুলুল্লাহর (সাঃ) এই বাণী ঠিক অন্যান্য বর্ণনার মতই যুদ্ধের কথা (আল–কিতাল) স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছে; যা তাদের জন্য একটি সমস্যার কারণ। জাবীর বিন আব্দুল্লাহ এবং ইমরান বিন হুসায়ন এবং ইয়াজীদ বিন আল-আসলাম এবং মুআবীয়া এবং উক্ববা বিন আমর (রা.) প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই কিতালই হলো সাহায্যপ্রাপ্ত দলের অন্যতম সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য।

---

৫) আল্লাহর জন্য নসীহতের অর্থ হলো তাঁর জন্য শিরকমুক্ত ইবাদত করা, তাঁর নাম ও গুণবাচক নামসমূহের উপর বিশ্বাস রাখা, কুরআনের জন্য নসীহতের অর্থ কুরআনের পথ ধরে চলা রাসূলের জন্য নসীহতের অর্থ তাঁর রিসালাতের স্বীকার করে তাঁর দেয়া সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গঠন করা।

সুতরাং এই দলকে শুধুমাত্র উলামাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। বরং তারা উলামা এবং মুজাহদিদের সমন্বিত একটি গোষ্ঠী। এবং এ ব্যাপারে ইমাম আন-নব্বী, আল-বুখারী এবং আহমাদ এবং অন্যদের বক্তব্য তুলে ধরেন এবং বলেন, "এটা হতে পারে যে, বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাসীদের মাঝে এই দল ছড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী যোদ্ধা এবং তাদের মাঝে রয়েছে ন্যায় বিচারকগণ এবং তাদের মধ্যে আরো রয়েছে হাদীস বিশারদগণ এবং তাদের মাঝে আরো একদল রয়েছে যারা গভীর ইবাদতে মগ্ন এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তারা নিজেদেরকে পার্থিব জীবনের সামগ্রী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এবং তাদের মাঝে অন্যান্য ভাল প্রকৃতির মানুষও রয়েছে। এবং এটা আবশ্যক নয় যে, তাদেরকে একসাথে থাকতে হবে বরং হতে পারে যে, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়েও থাকতে পারে। (সহীহ মুসলিম বি শারহ্ আন-নব্বী)

এবং একই ভাবে, ইমাম ইবনে তইমিয়্যাহ্ (রাঃ) তাঁর, তাঁতারদের সাথে যুদ্ধ বিষয়ক ফাতাওয়ায় বর্ণনা করেন যে, যারা ঈমাণের দু'টি বিষয়ের ওপর সাক্ষ্য দেয় (আশ–শাহাদাতাইন), তারপরও ইসলামের শরীয়া ছাড়া অন্য বিধান দ্বারা শাসন করে - সেই (তাঁতারদের বিরুদ্ধে) জিহাদরত গোষ্ঠীরা الطائفة المنصورة "আত্ তাইফাতুল মানুসরা"-য় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিক উপযুক্ত। যেমন তিনি বলেন, উদাহরণস্বরূপ, শাম ও মিসরের তাইফা এবং তাদের মত অন্যরা; তারা এ সময়ের দ্বীন ইসলামের জন্য জিহাদরত যোদ্ধা, এবং আত্ তাইফাহ্ আল মানসুরাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তারাই সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত, যা রাসূল (সাঃ) তাঁর বর্ণনাতে তুলে ধরেছেন, যা বিশুদ্ধ এবং প্রায়ই বর্ণিত হত এবং তিনি বর্ণনা করতেন- আমার উম্মাহ্র মধ্যে একটি দল যারা সত্যের ওপর অবিচল থাকবে, (এ থেকে) তারা কখনই বিরত হবে না। যারা তাদের (তাইফাহ্) সাথে প্রতারণা করবে বা তাদের বিরুদ্ধচারণ করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবেনা যতক্ষণ না (শেষ) সময় আসবে। এবং মুসলিমের বর্ণনাতে রয়েছে- পশ্চিমের গোষ্ঠী কখনই থামবে না। (মাজমুআ আল-ফাতাওয়া, খন্ড ২৮/৫৩১)

এবং এতেই কোনই সন্দেহ নেই যে, যেসব উলামা (ইলম অনুযায়ী) আমল (জিহাদ) করে, তারাই প্রথম যারা এই দলে (সফলকাম দল) অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরবর্তীতে মুজাহিদিনদের মধ্যে হতে অবশিষ্টরা, এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করে। (এই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়)।

এবং সালাফগণ 'তাইফাহ্' বলতে উলামাহ্দের বুঝিয়েছেন এই কারণে যে, জিহাদ এমনই একটা বিষয় ছিল যা সম্পর্কে মুসলমানদের কোনই দ্বিমত ছিল না

এবং সীমান্তগুলো সিপাহী এবং যোদ্ধা দ্বারা সুসজ্জিত ছিল, যারা শত্রুভূমির অভিমুখী ছিল এবং তাদের সময়ে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল এতে নতুন বিষয়ের অনুপ্রবেশ এবং ধর্ম বিমুখ বিপথগামীরা, এবং এই যুদ্ধক্ষেত্রের (বিদাত বিরোধী যুদ্ধ) সৈনিক ছিলেন ওলামাগণ।

কিন্তু আজ, যার যার যুদ্ধক্ষেত্রে উলামা এবং মুজাহিদীন উভয়ের প্রচেষ্টা আমাদের বড়ই প্রয়োজন। যেহেতু শুধুমাত্র জ্ঞান দ্বারা অথবা শুধুমাত্র জিহাদ দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন প্রতিটির সম্মিলিত প্রয়োগ। আল্লাহ (সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা), সূরা আল- হাদীদ-এ বর্ণনা করেনঃ

قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ [الحديد/٢٥]

"নিশ্চয়ই, আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" (সূরা আল-হাদীদ ৫৭ঃ ২৫)

এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, "আল্লাহ্র কিতাব, ইনসাফ, এবং লৌহ ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে না" কিতাব, পথ প্রদর্শনের জন্য; লৌহ, তা বজায় (Support) রাখতে হবে। ঠিক যেভাবে আল্লাহ্ সুবাহানহু ওযা তা'আলা বলেছেন- নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ প্রেরণ করেছি। সুতরাং কিতাব এর জ্ঞান দ্বারা এবং লৌহ দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং ইনসাফ, যা দ্বারা চুক্তি বাস্তবায়ন, অর্থ ও সম্পদ আদায়করণ প্রভৃতি সম্পাদিত হবে (হক আদায় হবে), এবং লৌহ, যা দ্বারা আইনের শাস্তি (আল-হুদুদ) প্রতিষ্ঠিত হবে। (মাযমুওয়া আল-ফাতাওয়া, খন্ড ৩৫/৩৬)

তিনি আরও বলেছেনঃ "এবং মুসলমানদের তালোয়ার এই শরীয়াকে বিজয় দিবে এবং এটাই কিতাব এবং সুন্নাহ, যেমন জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) আমাদের আদেশ দিয়েছেন 'এটি দিয়ে আঘাত করতে'- যা দ্বারা তলোয়ার বুঝায়। যে এর অধীনস্ততা পরিত্যাগ করে- যা মুসহাফ বুঝায় (কুরআন বুঝায়)। (মাজমুওয়া আল-ফাতাওয়া, খন্ড ৩৫/৩৬৫)

এবং তিনি আরো বলেছেনঃ "যেহেতু, নিশ্চয়ই, পথ প্রদর্শনকারী কিতাব এবং বিজয় দানকারী লৌহ সেটাই যা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে। যেরূপ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন।" (মাযমুওয়া আল-ফাতাওয়া ২৮/৩৯৬)

এবং এটা ছাড়াও বিভিন্ন অধ্যায় (তার ফাতাওয়ার) আলোচনার ভিত্তিতে আমি বলি যে, 'সফলকাম দল' হল সেই দল যারা জিহাদ পালন করে এবং সেই সকল শরীয়া ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে, যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন- আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআ'। [Al Bayah Wal Imarah, ইমাম আঃ ক্বাদির ইবনে আঃ আযিয]

❖ প্রশ্ন-৫। মুসলিম হিসেবে আমাদের আক্বীদাহ কি?

উত্তরঃ- মুসলিম হিসেবে এই হল আমাদের আক্বীদাহ

▶ ঈমান হল জিহ্বার দ্বারা একটি ঘোষণা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা। ঈমান আনুগত্যের কাজ দ্বারা বর্ধিত হয় এবং অবাধ্যতাজনিত কাজের মাধ্যমে হ্রাস পায়, এবং এই অনুযায়ী ঈমানদারগণ বিভিন্ন ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হন।

▶ গুনাহ এবং অবাধ্যতাজনিত কাজ দ্বারা ঈমান হ্রাস পায়, কিন্তু এর নির্যাস অকার্যকর করে দেয় না, যেখানে বড় অবিশ্বাস (আল-কুফর আল-আকবার) এটিকে সমূলে উৎপাটন করে।

▶ কুফর (অবিশ্বাস) দুই ধরনেরঃ ১) বড় কুফর ২) ছোট কুফর। প্রথমটির মাধ্যমে যে কাউকে সম্পূর্নরূপে ইসলামের বহির্ভূত করে এবং অবিশ্বাসী হিসেবে চিহ্নিত করে। দ্বিতীয়টি হল অবাধ্যতামূলক কোন কাজকে সংকেত প্রদান ও ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে একটি অতিরঞ্জিত নামে অভিহিত করা। 'বড় কুফর' ও 'ছোট কুফর' এর মতো একই ভাবে প্রযোজ্য শিরক, নিফাক, যুল্ম এবং ফিস্ক।

▶ একজন মুসলিম আল্লাহ্র কোন হুকুমের অমান্য করলে কাফির (অবিশ্বাসী) হয়ে যায় না, হোক তা সংখ্যায় অনেক বা কম, ও সে তার জন্য অনুশোচনা করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্তর দ্বারা সেকাজকে বৈধ মনে করে। একজন ফাসেক যে গুনাহ ও অসৎ কাজ যা সে সম্পাদন করে তার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও– এ অবস্থাতে তাকে কাফির বলা যায় না। যদিও সে তা চালিয়ে যায় এবং তার জন্য অনুশেচনা করে না এবং ঐ অবস্থাতেই মারা যায়। তার তাকদীর আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর কিয়ামতের দিন নির্ভর করবে। তিনি তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন অথবা জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দিতে পারেন এবং এক পর্যায়ে সেখান হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

▶ যখন ঈমান ও ইসলাম একত্রে উল্লেখ করা হয়, তখন প্রথমটি অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করাকে এবং পরবর্তীটি কাজের দ্বারা সম্পাদন করাকে বুঝানো হয়। যখন আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয় তখন উভয়টিই ইসলামের দ্বীন-এর কথা সম্পূর্ণভাবে বোঝায়।

▶ আমরা কাউকে কাফির হিসেবে গননা করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সম্পাদিত কাজটি পরিষ্কারভাবে 'কুফর' বোঝা যায় এবং অবিসম্বাদীত প্রমান তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করা যায় যাতে করে এটা পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে প্রমানিত হয় যে, সে জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং স্বেচ্ছায় কাজটি সম্পাদন করেছে।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, জীবন দানকারী ও জীবন গ্রহণকারী, পুনরুত্থানকারী, উত্তরাধিকারী সমস্ত ভাল এবং ক্ষতি করার অধিকারী, আমরা তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ মানি না।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ [الأنعام/١٦٤]

" তুমি জিজ্ঞাস কর– আমি কি আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য রবের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হচ্ছেন প্রতিটি বস্তুর রব।" (সূরা আনআম:১৬৪)

▶ তিনি মহিমান্বিত এবং সুউচ্চ, তাঁর কোন সাদৃশ্য, পুত্র, অংশীদার বা প্রতিযোগী নেই। আল্লাহ (সুব:) বলেন,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

" বলঃ তিনিই আল্লাহ্ একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন, এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (আল-ইখলাস)

▶ একমাত্র মহান আল্লাহ্ই ইবাদতের যোগ্য এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, তাঁর বান্দাদের সমস্ত কিছু তাঁর কাছেই একমাত্র সমর্পন করতে হবে: ভয়, আশা, স্মরণ, আবেদন, ভালবাসা ও আত্মসমর্পন, সাহায্য ও আরোগ্য, অনুরোধ, নির্ভরতা, উৎসর্গ, সিজদা এবং ইবাদতে অন্যান্য সকল উপায়ে।

▶ আমরা গাছপালা, পাথর বা কবরের কাছে রহমত চাই না। আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্র কাছে তাঁর নামের গুনাবলী ব্যবহার করে, আমাদের সম্পাদিত ভালো কাজে বা জীবিত কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মাধ্যমে আমরা সাহায্য চাই। আমরা কবরের চারদিকে মৃতদের নিকট হতে রহমতের আশায় হেটে বেড়াই না, আর না জিন বা মৃত ভালো লোকদের কাছে সাহায্যের জন্য বলি, না আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও সিজদা করি। যে কেউই এর যে কোন একটি কাজ সম্পাদন করে, সে সুস্পষ্ট শিরক-এ-আকবার (বড় শিরকে) লিপ্ত হয়।

▶ আমরা আল্লাহ্‌র পার্শ্বে অন্য কোন ইলাহ্ নেই না, আল্লাহ্ ছাড়া আমরা অন্য কোন বিধানের কাছে বিচার চাই না, কারণ আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ্‌র সেই সার্বভৌমত্ব আছে এবং তাই তিনি বিচার করেন, আদেশ দেন, নিষেধ করেন, রায় দেন এবং আইন প্রণয়ন করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী এবং সর্বজান্তা।

▶ যে কেউই আল্লাহ্‌র আইনের উপর আইন প্রণয়ন করে এবং তাঁর আইন অন্য কারও আইন দ্বারা পরিবর্তন করে, সে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যায়, এরকম ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র অংশীদার এবং বিচারকার্যে সমান হিসেবে দাঁড় করায়, এর ফলে সে ইসলামের বাইরে চলে যায়। যদি এই ব্যক্তি কোন শাসক হয় তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করতে হবে এবং তাকে পদচ্যুত করতে হবে।

▶ কোন রকম উপেক্ষা, অর্থ বদলানো বা কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বোঝানো - ইত্যাদি ব্যতীতই আল্লাহ্‌র সকল নাম ও গুনাবলী যা তিনি কোরআনে বা তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন তা সমর্থন করি। আমরা আল্লাহ্‌র গুনাবলীর মতো কোন জ্ঞানের দাবীও করিনা, কারণঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى/١١]

"কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"(সূরা-শুরা:১১)
তাঁর সদৃশ কেউ নেই, সেটা তাঁর নামে, তাঁর গুনাবলীতে বা কোন কাজে যেটাতেই হোক।

▶ আমরা আল্লাহ্‌র ঐ সমস্ত গুনাবলী সমর্থন করি যা তিনি তাঁর নিজের জন্য ঘোষনা দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) ও স্বীকার করেছেন, যথাঃ জ্ঞান, যোগ্যতা, শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, মুখমন্ডল, হাত এবং অন্যান্য গুনাবলী যা কোনটাই তাঁর সৃষ্টির সদৃশ নয়।

▶ আমরা বলি যেভাবে আমাদের রব বলেছেনঃ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
"দয়াময় (আল্লাহ্) আরশে সমাসীন।" (সুরা ত্বাহা:৫)
আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে এবং সুউচ্চে তাঁর আরশে সমাসীন। তিনি আরশে আসীন রয়েছে তা আমরা জানি, কিন্তু কিভাবে আসীন রয়েছেন তা আমাদের অজানা। এতে বিশ্বাস করা একটি আবশ্যকতা (ওয়াজিব), এবং কিভাবে আসীন আছেন তা সম্পর্কে বলা একটি বিদ'আত।

▶ আল্লাহ্ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং যখন ও যেভাবে ইচ্ছা করেন। কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আনন্দিত হন, হাসেন, ভালবাসেন, ঘৃণা করেন, সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং ক্রোধান্বিত হন (যেভাবে

তিনি ইচ্ছা করেন)। তাঁর কর্মে তিনি তাঁর কোন সৃষ্টির সদৃশ নন এবং কিভাবে এসব কর্ম সম্পাদিত হয় তা সব মরনশীলদের অজানা।

▶ কোরআন হল আল্লাহ্র তরফ থেকে নাযিলকৃত সত্য কিতাব যাকে সৃষ্ট বলা যায় না এবং যা কোন দিক দিয়েই মানব জাতির কথোপকথনের সদৃশ নয়, এটি তাঁর দ্বারা এমনভাবে কথিত যার কোনকিছুই আমাদের জ্ঞাত নয়।

▶ আমরা ফেরেশতা, নবী এবং রাসূল দের বিশ্বাস করি।

▶ আমরা রাসূলদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহে বিশ্বাস করি এবং তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করি না।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র দাস ও রাসূল। তিনি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, সর্বশেষ নবী এবং সকল ধার্মিক ব্যক্তির নেতা।

▶ আমরা বিশ্বাস করি, সজাগ অবস্থায় এবং সশরীরে মক্কার আল-হারাম মসজিদ হতে তাকে জেরুযালেমের আল-আক্সা মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং জান্নাত হতে যতটা উচুতে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন ততটা উপরে তিনি অধিষ্ঠিত হন।

▶ আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, প্রতীক্ষিত মাহদী (অথবা সত্যানুসারী ইমাম) এই পৃথিবীতে শেষ জামানায় রাসূল (সাঃ) এর উম্মাতের ভেতর হতেই আসবেন।

▶ আমরা ঐ সময়ের সংকেত বিশ্বাস করি। আদ-দাজ্জাল (মিথ্যা মসীহ) এর আর্বিভাব। স্বর্গ হতে মরিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) এর অবতরন। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়, পৃথিবী হতে হিংস্র জন্তুর আর্বিভাব এবং কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য সংকেত।

▶ আমরা বিশ্বাস করি কবরে দুই ফেরেশতা কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ, মুনকার এবং নাকীর, একজনের রব, দ্বীন ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ব্যাপারে।

▶ আমরা মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি, আমরা শেষ বিচারের দিন, আমলনামা পাঠ, মানদন্ড (যার উপর সম্পাদিত কাজ পরিমাপ করা হবে), আস-সীরাত (জাহান্নামের আগুনের উপর স্থাপিত পুল) এবং শাস্তি ও পুরষ্কারে বিশ্বাস করি।

▶ আমরা পাপীদের জন্য কবরের আজাবে বিশ্বাস করি। আল্লাহ্ আমাদের তা হতে রক্ষা করুন। কবর হল হয় জান্নাতের একটি চারণভূমি নতুবা জাহান্নামের আগুনের জন্য গর্ত সরূপ এবং প্রতিটি বান্দা তাই পায় যার সে উপযুক্ত।

▶ আমরা বিশ্বাস করি সেই মধ্যস্থতায় যা রাসূল (সাঃ) কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মতের জন্য সংরক্ষণ করেছেন।

▶ আমরা আল-হাওস-এ বিশ্বাস করি যা আল্লাহ্ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা রাসূল (সাঃ)-কে সম্মান সরূপ কিয়ামতের দিন প্রদান করবেন, তাঁর উম্মতের পিপাসা মেটানোর জন্য ।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই সত্য । এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কখনও তা অদৃশ্য হবে না ।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে সকল জান্নাতবাসী কোন প্রকার পরিবেষ্টন ছাড়া এবং খালি চোখেই তারা তাদের রবের সরাসরি সাক্ষাত পাবে । আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন: [القيامة/٢٢،٢٣] وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ "সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে । তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে ।" (সূরা-কিয়ামত:২২-২৩)

▶ আমরা আল-ক্বাদার (আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত রায়)-এর ভালো ও মন্দে বিশ্বাস করি এবং বলিঃ [النساء/٧٨] قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ "------ তুমি বলঃ সমস্তই আল্লাহ্‌র নিকট হতে----- ।" (আন-নিসা:৭৮)

ভালো এবং মন্দ উভয়ই আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত রায় । পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই তাঁর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় ।

▶ আমরা বিশ্বাস করি মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর দাসদের অবিশ্বাসকারী বা অবাধ্য হতে আদেশ দেন না, না তিনি এরকম ব্যক্তিদের উপর সন্তুষ্ট হন:

وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ "তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না ।" (যুমার:৭)

এবং যদি তিনি নাস্তিকদের জন্য নাস্তিকতা নির্ধারন করে দেন, তিনিই শুধুমাত্র এর কারণ জানেনঃ আল্লাহ্‌র তরফ হতে ন্যায় বিচার, বান্দার নিজের আত্মার বিরুদ্ধে কৃত পাপকর্ম এবং তার পূর্বে সম্পাদিত পাপের শাস্তি হিসেবে এটি হতে পারে ।

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا [النساء/٧٩]

"তোমার নিকট যে কোন কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহ্‌র তরফ হতে এবং তোমার উপর যে অকল্যাণ নিপতিত হয় তা তোমার নিজ হাতে হয়ে থাকে-- ।" (সুরা-নিসা:৭৯)

এ সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সংঘটিত হয় । তিনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তাই হবে এবং যা ইচ্ছা করেন না তা হবে না । এবং আল্লাহ্ তার কোন বান্দার প্রতি কখনো অন্যায় করেন নাঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ [النساء/٤٠] "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না----- ।"(সুরা-নিসা:৪০)

▶ আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্ তাঁর বান্দার কার্যাদি সৃষ্টি করে থাকেনঃ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات/٩٦] "প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও ।" (সুরা-আস-সাফ্ফাত:৯৩) এবং বান্দারা নিজেদের কাজ সম্পাদন করে থাকে বাস্তবে, রূপক অর্থে নয় ।

▶ আমরা রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবাদের ভালোবাসি, আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তারা সকল উম্মাতের শ্রেষ্ঠ উম্মাত । আমরা তাদের জ্ঞানকে স্মরণ করি, তাদের শ্রদ্ধা করি এবং তাদের সাথে মিত্রতা পোষণ করি । আমরা সেসব জিনিষ হতে বিরত থাকি যেসবে তাঁরা অমত পোষণ করেছেন । তাদের প্রতি ভালোবাসা ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান (উৎকৃষ্ট ব্যবহার)-এর অংশ । তাদের ঘৃণা করা হল মুনাফেকী এবং অবিশ্বাস ।

▶ আমরা সমর্থন করি আবু বকর আস্-সিদ্দিককে প্রথম খলিফা হিসেবে, সমস্ত উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট হবার জন্য । এরপর উমর বিন আল-খাত্তাব এরপর উসমান বিন আফ্ফান এবং এরপর আলী বিন আবী তালিবকে - আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের উপর সন্তুষ্ট থাকুন । তাঁরা হলেন সত্যের অনুসারী খলিফা এবং ন্যায়পরায়ণ নেতৃবৃন্দ যাদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (حسن صحيح)

"তোমাদের অবশ্যই আমার সুন্নাতের এবং সত্যের অনুসারী খলীফাগনের সুন্নাত অনুসরন করতে হবে, এটি শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাক ।" (আবু দাউদ এবং তিরমিযী- আবু নাযিহ আল-'ইরবাদ বিন সারিয়াহ বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ)

▶ আস-সালাফ-এর উলামাগণ (এই উম্মাতের প্রথম প্রজন্ম এবং যারা তাদের পদানুসরণ করেন) সর্বোত্তম উপায়ে কথা বলেছেন । তাঁদের মধ্যে যারা খারাপ কথা বলেন তারা অবশ্যই সঠিক পথে নেই ।

[In pursuit of Allah's Pleasure, from the 2nd Chapter]

বাতিল ফিরকাসমূহ

❖ প্রশ্ন-১। শীয়া সম্প্রদায় এবং উহাদের মূল উৎসের স্বরূপ কি?

উত্তরঃ- হিজরীর পয়ত্রিশ সনে ওসমান (রাঃ) এর শাহাদতের পর আলী (রাঃ) এর বায়আত সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে মুসলিম জাতির মধ্যে দলীয় কোন্দল ও ঘরোয়া বিবাদের সুত্রপাত হয়। ঐ সময় মুসলিম সমাজে দলীয় কোন্দলের ইন্ধন যোগানোর জন্য এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য যে দুষ্ট শ্রেণীর লোক ইসলামে অনুপ্রবেশ করে উহাদের অধিকাংশ অগ্নিপূজক ও ইয়ামানের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল।

ইসলামে অনুপ্রবেশকারীগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের আকীদা, সাহাবাগণ (রাঃ) সম্পর্কে এবং তাওহীদী আকিদায় গন্ডগোল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মতামত যাহির করে এক কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে। এরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর মতে- আলী (রাঃ) হচ্ছেন স্বয়ং খোদা (নাউযু বিল্লাহ)। এরা আলীর (রাঃ) আমলেই আত্ম প্রকাশ করে।

আলী (রাঃ) এদের মুখচেনা পান্ডাগুলিকে ধরে আগুনে পুড়িয়ে মারেন। কিন্তু আবর্জনা শেষ হয়নি। এই দলের সদস্যরা যুগ যুগ ধরে এই ধরনের বিভ্রান্তি মূলক কথা প্রচার করে আসছিল। সে সময় হিন্দুদেরকে বুঝানোর জন্য এরা বলেছিল যে, আলী হলেন বিষ্ণুর দশম অবতার। এরা আলীর নামে একখানা কিতাব রচনা করে নেয়। উহার নাম রাখা হয় মাহদী পুরান। উহাতে উমাচারী বুদ্ধমত এমন কতগুলি শ্লোক, মন্ত্র ও টীকা লিখানো হয় যা সাধারণের বোধগম্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দুদেরকে উহা গ্রহণে আগ্রহী করা।

অপর দলের মতে আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের অংশীদার। আলীর নিকট এমন অনেক গোপন ইলম বা তথ্য ছিল যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল মাত্র তাকে দিয়ে গেছেন। এই সংবাদ প্রমাণ করার জন্য তারা নিম্নের তথ্য রচনা করেছে।

"আমি ও আলী একই নূরে সৃজিত হয়েছি"। এই হাদিসটি জাফর ইবনে আহম্মদ ইবনে আলী নামক ব্যক্তির প্রস্তুতকৃত। হারুন (আঃ) মুসা (আঃ) এর যেমন নবুয়তের অংশীদার ছিলেন, এই হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত গোপন কথা আলী (রাঃ) নিকট বা মাধ্যমে বলেছেন। তারা এই প্রসঙ্গে কুরআন চল্লিশ পারা বলে দাবী করে তন্মধ্যে দশ পারা আলীর (রাঃ) নিকট ওয়াহী হয় অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দিয়ে যান। এই সুবাদে তারা একটি হাদীস বানিয়েছে যা বহুল প্রচারিত।

أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه

"আমি ইলমের শহর, আলী উহার দরজা। অতএব ইলমের ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশপ্রার্থী যেন দরজায় এসে পৌঁছায়।" অর্থাৎ আলীর (রাঃ) মাধ্যমে উহা অর্জন করে। এবং উক্ত ইলম কেবলমাত্র আলীর (রাঃ) ভক্ত শীয়াদের নিকটই আছে।

এই হাদীস সম্পর্কে হাদীসশাস্ত্রে পন্ডিতগণ মন্তব্য করেছেন।

(رواه الترمذي في المناقب من جامعه وقال إنه منكر وكذا قال البخاري إنه ليس له وجه صحيح وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال ابن دقيق العيد هذا الحديث لم يثبتوه وقيل إنه باطل)

ইমাম বুখারী (রাঃ) বলেনঃ উহার কোনও সঠিক সূত্রই নেই। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেনঃ উহা প্রত্যাখ্যাত কথা। (মিরক্বাত ফি শরহে মিশকাত: ১৭/৪৪৩) ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শীয়া মতবাদের আবিস্কার করেছে, তার ধর্ম্মীয় মনোভাবের ভিত্তি আদৌ ছিল না, বরং তার উদ্দেশ্য বড়ই অসৎ ছিল। বলা হয়, সে যিনদীক ও মোনাফেক ছিল, উপরে ইসলাম স্বীকার করে তলে কুফরী মত প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। এদের মাযহাবের ভিত্তি হল মিথ্যা কথার উপর। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম দিয়ে মিথ্যা কথা শরীয়তের বাণী বলে প্রচার করা এবং সহীহ হাদীস সমূহকে অস্বীকার করা। (মাজমু আতুল ফাতাওয়া ত্রদোদশ খন্ড ৩১ পৃষ্ঠা)

শীয়াদের বদনীতির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক নীতি হল, ব্যক্তি বিশেষকে বাড়াতে বাড়াতে এতদূর পৌছানো যে, যেন তারা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এজেন্ট বা মাধ্যম স্বরূপ। তাই এরা এদের বোযর্গ নামীয় শ্রেণীকে এমন সব উপাধিতে উল্লেখ করে যা কেবল অতিরঞ্জিতই নয়, বরং ইসলামী রীতির বর্হিভূত।

এ পরিপেক্ষিতে শীয়ারা তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে বাবুল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহ আয়াতুল্লাহ ইত্যাদি খেতাবে ভুষিত করে অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পৌছানোর জন্য এরাই সোপন স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলাকে পাবার জন্য এদের দরজায় ধর্ণা দিতে হবে; পরিত্রাণ পাওয়া; হক না হক পথের সবকিছুর এরাই মাধ্যম; এমনকি জগতের সবাই এদের মুখাপেক্ষী, তাই এদের কতিপয় লোককে গাউস উপাধী দেয় কাউকে কুতুব বলে থাকে। শীয়ারা মুসলিমদের আকীদা লন্ডভন্ড করার জন্য বিভিন্ন কথা জাল করেছে এবং হাদীসের নামে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে যার ফলে সাধারণ লোক তো দূরের কথা, অনেক আলেমও ধোঁকা খাচ্ছে।

❖ প্রশ্ন-২। خوارج খারেজী কারা, এই সম্প্রদায়ের স্বরূপ কি?

উত্তরঃ- শীআ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মতবাদের অধিকারী দলটি ছিল খারেজী। এরা ইসলামে সর্বপ্রথম বিদআতী দল এদের বক্তব্যের মধ্যে ছিল। মু'মিন হবে নিখুত খাটি। যে ব্যক্তি ঐরূপ না হবে সে কাফির-চিরজাহান্নামী। তাদের মতে পাপ কুফরীর সমার্থক। সকল কবীরা গুণাহকারীকে এরা কাফের বলে আখ্যায়িত করে (যদি তারা তওবা করে গুণাহ থেকে প্রত্যাবর্তন না করে) উপরন্তু সাধারণ মুসলমানকেও এরা কাফের বলতো। কারণ, প্রথমত, তারা পাপমুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত সাহাবীদেরকে তারা কেবল মুমিনই স্বীকার করতো না, বরং নিজেদের নেতা বলেও গ্রহণ করতো।

কুরআনকে তারা ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস হিসেবে মানতো। কিন্তু হাদীস এবং ইজমার ক্ষেত্রে তাদের মত সাধারণ মুসলমান থেকে স্বতন্ত্র ছিল।

এদের সবচেয়ে বড় দল আযারেকা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মুসলমানকে মুশরিক বলতো। এদের মতে নিজেদের ছাড়া আর কারো আযানে সাড়া দেয়া খারেজীদের জন্য জায়েজ নয়। অন্য কারো জবাই করা পশু তাদের জন্য হালাল নয়; কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও জায়েয নয়। খারেজী আর অ-খারেজী একে অন্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরা অন্য সব মুসলমানের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরযে আইন মনে করতো। তাদের স্ত্রী-পুত্র হত্যা করা এবং ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করাকে 'মোবাহ' মনে করতো। তাদের নিজেদের মধ্যকার যেসব লোক এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করে না, তাদেরকেও কাফের মনে করতো। তারা তাদের বিরোধীদের ধন-সম্পদ আত্মসাত করাকে হালাল মনে করতো। মুসলমানদের প্রতি তাদের কঠোরতা এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় তাদের কাছে অমুসলিমরা অধিক নিরাপত্তা লাভ করতো।

❖ প্রশ্ন-৩। المرجئة মুর্জিয়া কারা, এই সম্প্রদায়ের স্বরূপ কি? জাহমিয়াদের সাথে এদের মিল কোন দিক থেকে?

উত্তরঃ- শিআ এবং খারেজীদের চরম পরস্পর-বিরোধী মতবাদের প্রতিক্রিয়া একটি তৃতীয় দলের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এ দলটিকে মুর্জিয়া বলে অভিহিত করা হয়।

একঃ কেবল আল্লাহ এবং রাসূলের تصديق بالجنان (তাসদীক্ব) অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাসের নামই ঈমান। আমল ঈমানের মূলতত্ত্বের পর্যায়ভূক্ত নয়। তাই, ফরয পরিত্যাগ এবং কবিরা গুণাহ করা সত্ত্বেও একজন লোক মুসলমান থাকে। তারা বলে المعصية لا تضرمع الايمان كما ان الطاعة لا تنفع مع الكفر অর্থাৎ

ঈমান থাকলে পাপ করা কোন ক্ষতি নাই। যেমনভাবে কাফের অবস্থায় ইবাদত করলে কোন লাভ নাই। আমাদের দেশে যারা বলে "নামাজ না পড়লে কি হবে ঈমান ঠিক আছে" তারাও আধুনিক মুর্জিয়া।

দুইঃ নাজাত কেবল ঈমানের ওপর নির্ভরশীল। ঈমানের সাথে কোন পাপাচার মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। কেবল শিরক থেকে বিরত থেকে তাওহীদ বিশ্বাসের ওপর মৃত্যু বরণই মানুষের নাজাতের জন্য যথেষ্ট।

কোন কোন মূর্জিয়া আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলে যে, শিরক থেকে নিকৃষ্ট যতবড় পাপই করা হোক না কেন, অবশ্যই তা ক্ষমা করা হবে।

এসব চিন্তাধারা পাপাচার ফাসেকী ও অশালীন কার্যকলাপ এবং যুলুম নির্যাতনকে বিরাট উৎসাহ যুগিয়েছে। মানুষকে আল্লাহর ক্ষমার আশ্বাস দিয়ে পাপাচারে উৎসাহী করে তুলেছে। এ চিন্তাধারার কাছাকাছি আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, আমর বিল মারূফ এবং নাহী আনিল মুনকার-ভাল কাজের নির্দেশ এবং খারাপ কাজে নিষেধ-এর জন্য যদি অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়-তা হলে এটা একটা ফেতনা। সরকার ছাড়া অন্যদের খারাপ কাজে বাধা দেয়া নিঃসন্দেহে জায়েয-কিন্তু সরকারের যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ খোলা জায়েয নয়। যেমন বর্তমানেও অনেক আলেমগণ বলেন, "দেশের আইন মানা ফরজ জিহাদ করা জায়েয নাই"। আল্লামা আবুবকর জাসসাস এ জন্য অত্যন্ত কঠোর ভাষায় অভিযোগ করে বলেন, এসব চিন্তা যালেমের হস্ত সুদৃঢ় করেছে। অন্যায় এবং ভ্রান্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তিকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

মুরজিয়া ও জাহমিয়া মতবাদ তারা একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক। মুরজিয়ারা 'আমলের দিক দিয়ে ইসলামকে পঙ্গু করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে প্রকাশ করল যে, নামায, যাকাত, রোযা ইত্যাদি ইসলামী আদেশ সংক্রান্ত আমল সমূহের সাথে ঈমানের কোনই সম্পর্ক নেই। ফলে নামায, যাকাত বা রোযা আদায় করলে ঈমানের কোনও উন্নতি সাধিত হয় না বা এসব পুন্য কর্মের দ্বারা ঈমান বাড়ে না। অনুরূপ ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, চুরি ইত্যাদি অন্যায় কাজ ঈমানের জন্য ঈমান কমে যায় না। অতএব আমল সমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করার পর কোন গোনাহই মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়। মুরজিয়ারা এভাবে শরীয়াতের অনুশাসন বাতিল করে ঈমান কেবল মুখে মুখে উচ্চারণ ও মনে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট বলে প্রচার করল। অতএব যদি কেহ নামাযও পড়ে তার ফজিলত হবে ঈমানের সাথে সম্পর্কহীন পৃথক। অর্থাৎ

নামায না পড়লে বা মদ্যপান করলে ঈমানের কোন ক্ষতি হবে না। এভাবে এরা ইসলামের বিধিনিষেধ পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শিথিলতা ও সুবিধার আমদানী করল।

এদের পর জাহমিয়া গোত্ররা বললঃ ঈমান মুখে উচ্চারণের প্রয়োজন হয় না, অন্তরে المعرفة মারেফত হাসিল হলেই চলবে। মারেফতের চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলে আর কোন ইবাদত বন্দেগীর প্রয়োজন হয় না। দলিল পেশ করে;

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ [الحجر/٩٩]

"আর ইয়াকীন (~~মারেফতের শীর্ষস্তর~~) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।" (সুরা আল হিজরঃ ৯৯)

তারা এখানে اليقين "ইয়াক্বীন" শব্দের অর্থ করে মারেফতের শীর্ষস্তর। অথচ এখানে রাসুল (সাঃ) "ইয়াক্বীন" অর্থ করেছেন, "মৃত্যু"।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) তাদের আক্বীদা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ তাদের বিশ্বাস কালেমা শাহাদাত একবার পাঠ করার পর যত প্রকার অন্যায় করুক ঐ অন্যায়ের শাস্তি ভোগের জন্য আদৌ জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে না।

❖ প্রশ্ন-৪। মুতাযিলা কারা, এই সম্প্রদায়ের স্বরূপ কি?

উত্তরঃ- এ সংঘাত মুখর যুগে একটি চতুর্থ মতবাদও জন্ম নেয়। খারেজী এবং মুর্জিয়াদের মধ্যে কুফর এবং ঈমানের ব্যাপারে যে বিরোধ চলে আসছিল, সে ব্যাপারে এদের নিজস্ব ফায়সালা এই ছিল যে, পাপী মুসলমান মুমিনও নয়, কাফেরও নয়, বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। منزلة بين منزلتين এরা কুরআনের ভাষায়; مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ অর্থঃ- তারা এর মধ্যে দোদুল্যমান, না এদের দিকে আর না ওদের দিকে। (সুরা নিসাঃ ১৪৩)

এছাড়াও অনেক মু'তাযিলা ইসলামী আইনের উৎসের মধ্য থেকে হাদীস এবং ইজমাকে প্রায় বাতিলই করে। বর্তমানে এরা আহলে কুরআন নামে কাজ করে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ বলেছেন, খাওয়ারেজ ও মুতাযেলী উভয়ের বক্তব্য হল- "আমি নিশ্চিতরূপে স্বীকার করছি যে, ধর্মীয় অনুশাসনগুলি সমস্তই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যখন ধর্মীয় অনুশাসনগুলি কিয়দংশ ছেড়ে দেয়া হল তখন ঈমানের কিছু অংশ চলে গেল। অতএব যখন কিছু অংশ নষ্ট হল তখন তার ঈমান সম্পূর্ণভাবে চলে গেল। যেহেতু ঈমান অংশযুক্ত বস্ত নয়; উহার কিছু অংশ পরিত্যাগ করলে অন্যান্য অংশগুলি পালন সত্ত্বেও সে মু'মিন থাকবে না,

কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে; বিধায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ হবে” মু‘তাযিলীদের মতে সে মু‘মিনও নয়, কাফিরও নয়। এই মাসআলায় মু‘তাযিলীদের সাথে খারেজীদের মতপার্থক্য হয়েছে।

মুতাযেলীগণ আবূ বকর (রাঃ), ওসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এই ৪ জন খলিফার খিলাফত স্বীকার করে থাকে। খারেজীগণ আবূ বকর ও ওমরের (রাঃ) খিলাফত স্বীকার করে। ওসমান ও আলীর (রাঃ) খিলাফত স্বীকার করে না। রাফেযীগণ কেবল মাত্র আলী (রাঃ) ছাড়া প্রথম তিনজন খলীফার খেলাফত আদৌ স্বীকার করে না।

ইসলাম আমাদের জাতীয়তা!

❖ প্রশ্ন-১। আমাদের পরিচয় এবং জাতীয়তা কি?

নিশ্চয়ই এটা আমাদের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদেরকে প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত যা দিয়ে তিনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন; যে তিনি আমাদেরকে একটি অবিচ্ছেদ্য জাতিতে পরিণত করেছেন, এবং আমাদের জন্য একটি নাম পছন্দ করেছেন..... একটি নাম যা এই জাতির প্রতিটি মানুষের পরিচয় বহন করে, কারো ক্ষেত্রে এর ব্যাতিক্রম নেই।

শাঈখ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল লতিফ বলেন, "এবং তোমার পরিচয় মুসলিম। এবং তুমি অন্য সমস্ত ধর্মের মানুষদের মধ্যে এই নামে আখ্যায়িত। এবং এটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ রহমতসমুহের একটি। যেভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ "তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম....." [আল-হাজ্জ ২২:৭৮]" (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ ৮/৫২)

সুতরাং যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে এই আখ্যায় সম্মানিত করেন এবং আমাদেরকে বিশেষভাবে এই নামের জন্য পছন্দ করে থাকেন- তবে এটা পরিবর্তন অথবা পরিত্যাগ করা আমাদের জন্য অবৈধ, আমাদের জন্য এটাও বৈধ নয় যে, এটি ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তির উপর আমাদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা স্থাপিত হবে; এবং এসব হবে এই পরিচয়ের দাবী অনুসারে।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, "এবং মহিমান্বিত আল্লাহ্ কোরআনে আমাদেরকে আখ্যায়িত করেছেন 'মুসলিমিন', মু'মিনীন' (বিশ্বাসীগণ) এবং 'ই'বাদুল্লাহ'" (আল্লাহ্র দাস) হিসেবে। সুতরাং আল্লাহ্ আমাদের যে নামে আমাদের আখ্যায়িত করেছেন তা আমরা পরিবর্তন করিনা ঐ সকল আখ্যার বিনিময়ে যা মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত- যা দ্বারা তারা তাদের নিজেদেরকে এবং তাদের পূর্বপরুষদের আখ্যায়িত করেছে, যার কোন অধিকার আল্লাহ্ দেননি- যেটার উপর তারা তাদের (বন্ধুত্ব এবং) শত্রুতা স্থাপন করে থাকে। শুধু তাই না, বরং আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ন্যায়পরায়ণ, তারা যে দলেরই হোক না কেন।" (মাজমু আল-ফাতাওয়া ৩/৪১৫)

❖ প্রশ্ন-২। শত্রু এবং মিত্রতার মানদণ্ড কি?

উত্তর- 'কে শত্রু আর কে মিত্র' তা যাচাই করার জন্য আমরা যে মানদণ্ড ব্যবহার করি, তার ভিত্তি হলো ইসলাম। এবং এই মানদন্ড ব্যতীত অন্য যে কোন মানদন্ড হল জাহিলী (মূর্খ পৌত্তলিক) মানদন্ড, এবং কোনভাবেই তা ইসলামের

সাথে সম্পৃক্ত নয়। এবং এই কারণে, একজন আমেরিকান মুসলিম যে ইসলামের আন্তর্গত সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ত্বগুত বর্জন করে- সে আমাদের আপন ভাই। আমরা সম্প্রীতির একই বন্ধনে আবদ্ধ এবং তার সাহায্য এগিয়ে আসা আমাদের দায়িত্ব। অনুরূপভাবে, আরব মুরতাদ হল আমাদের শত্রু- যদিও সে 'ইরাকি' হয়ে থাকে। এবং নিশ্চয়ই, শুধুমাত্র একটি জাতীয়তাই এই উম্মাহ-র শরীরকে এক করতে পারে, তা হল ইসলাম . . . এবং ইসলাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

❖ প্রশ্ন-৩। একজন থেকে আরেকজন কিসের ভিত্তিতে উত্তম হতে পারে জাতীয়তা নাকি অন্য কিছু?

উত্তরঃ জাতীয়তা কখনই ব্যক্তির সম্মান বা মর্যাদার তারতম্য করে না, মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া।একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতেই একজন মানুষ অপরজনের চেয়ে উত্তম হতে পারে। আল্লাহর হক্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিথীলতার কোন সুযোগ নেই, এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রেও নয়, যখন উসামা ইবন যাঈদ রাদিআল্লাহু আনহু একবার একজন মহিলার ব্যাপারে সুপারিশ করতে আসেন যে কিনা চুরি করেছিল, যেন তার হাত কেঁটে দেওয়া না হয়- আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) তাকে বললেন:

فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا (صحيح البخاري)

"তুমি কি আল্লাহ্‌র বিধান গুলোর মধ্যকার একটি বিধানের বিরুদ্ধে ওকালতি করার চেষ্টা করছ?! আমি সেই সত্ত্বার নামে শপথ করছি যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মুহাম্মাদের কণ্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেঁটে দিতাম!"

আল্লাহ কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর নিকট সেই সম্মানিত, যে বেশী তাকওয়াবান।

❖ প্রশ্ন-৪। মুসলিম জাতীয়তার বিপরীত কিরূপ কুফরী চিত্র দুনিয়ায় দেখা যাচ্ছে?

উত্তরঃ আজকে মুসলিম দুনিয়ায় মুসলিম জাতীয়াতাবোধের বিপরীত চিত্র দেখা যাচেছ। ইয়াহুদী, খ্রিষ্টানরা মুসলিম ভূমিগুলো দখল করে নিয়েছে, মুসলিমদের উপর চালাচ্ছে অত্যাচারের স্টীম রোলার, তাদেরকে হত্যা করছে, বন্দী করছে,

মুসলিম শিশু-নারীদের হত্যা করছে, বোনদের ইজ্জত নষ্ট করছে, মুসলিমদের দ্বীন ভুলষ্ঠিত অথচ অধিকাংশ মুসলিমরা নিশ্চুপ। তারা তাদের দ্বায়িত্ব্য কর্তব্য অবহেলা করে দুনিয়ার বিলাসিতার পেছনে ছুটছে। কেউ বা ইয়াহুদী, খ্রিষ্টানদের গোলামে পরিণত হয়েছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করছে। তাদের পরস্পরের সম্পর্কের মানদণ্ড ইসলামকে ভূলে, মুসলিম জাতীয়তাবোধের বিপরীত কুফরী জাতীয়তাবোধ দানা বেধেছে, আমি বাংলাদেশী, আমি পাকিস্তানী, আমি ইরাকী, আমি আফগানী এসব আওড়াচ্ছে।

আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, আমরা এমন অনেক মানুষ দেখতে পাই যারা দাবী করে, যে তারা আলেম এবং সুন্নাহর অনুসারী - অথচ তারা মুর্তাদদের রক্তকে পবিত্র ঘোষণা করে যারা আর্মি ও পুলিশের সদস্য। যারা ক্রুসেডারদের (খ্রীষ্টান ধর্মযোদ্ধা) পাশাপাশি অস্ত্র তুলে নিয়েছে, এবং তাদেরকে তাওহীদের মানুষ ও মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে সাহায্য করছে। তর্কের জন্য তারা শুধু এতটুকুই বলতে পারে যে তারা হল "ইরাকি', তারা 'আফগানি' তারা 'ফিলিস্তিনি'এবং তাদের রক্ত হল "ইরাকি/ আফগানী"- সুতরাং পবিত্র। এমনকি কাফিররাও এ বিষয়ে তাদের সাথে একমত নয়; কারণ আশেপাশে তাকালে দেখা যায় পৃথিবীর সকল দেশেই শত্রু ও আগ্রাসী বাহিনীকে সহায়তা করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "মুসলিমদের রক্তপাত হালাল নয় (তাদের হত্যা করা যাবে না) তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া; যা হল বিবাহিত যেনাকারী, হত্যাকারী এবং সেই মুর্তাদ যে তার দ্বীন ত্যাগ করে জামা'আ থেকে আলাদা হয়ে যায়।" সুতরাং এই তিনটি প্রকার ছাড়া তিনি (সাঃ) মুসলিমদের রক্তের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। তিনি (সাঃ) "ইরাকি/আফগানি ইত্যাদিদের" জন্য কোন বিশেষ রায় দেননি; এমনকি তিনি ঐ রায় কোন রাষ্ট্র , কোন গোত্র, অথবা জাহিলী (মূর্খ পৌত্তলিক) দেশাত্ববোধের ভিত্তিতে দেননি।

এতদনুসারে, কোন বিবাহিত ব্যক্তি যেনা (ব্যাভিচার) করলে, তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়- যদিও সে "ইরাকি" হয়ে থাকে অথবা অন্য কোন দেশের। এবং যে ব্যক্তি কোন যথার্থ (শরীয়া অনুমোদিত) কারণ ছাড়া হত্যা করে, তবে তার বিধান হল হত্যা- যদিও সে একজন "ইরাকি বা অন্য কোন দেশের" হয়ে থাকে। এবং যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিত্যাগ করে, মুসলিমদের দেহ থেকে আলাদা হয়ে, তবে তার রক্তপাত বৈধ এবং এক্ষেত্রে একজন ইরাকি অথবা অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হবে না। "দেশের সন্তান" বলে কেউ পার পাবে না।

এবং যদি এই সকল মুরতাদদের নূন্যতম চরিত্র, নৈতিকতা এবং ফিতরাহ্ থাকত -ইসলামের কথা না হয় দূরেই থাকল- তবে তারা কখনই তাদের নিজেদের

ভূমির মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নাস্তিক ক্রুসেডারদের (ধর্মযোদ্ধা) পতাকার নিচে, তাদের পরিখার উপর দাঁড়িয়ে অস্ত্র তুলে ধরতনা। সুতরাং প্রকৃতপক্ষেঃ তারা জাতীয়তাবাদের চেতনারও বরখেলাফকারী, যাকে তারা ইসলামের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সুতরাং কেমন পবিত্রতার (রক্তের) যোগ্য তারা?

সুতরাং ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্র অনুধাবন করা সেইসব প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য, যারা তাদের দীনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট। 'ইরাকিদের রক্তপাত হারাম' এই চেতনা তাদের আরেকটি কৌশল এবং ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা মাত্র। যেহেতু ক্রুসেডাররা (ধর্মযোদ্ধা) দুই নদের এই দেশে (ইরাক) নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই তারা এই সকল মুরতাদদের- এই আর্মি ও পুলিশের সহায়তা চাচ্ছে। এবং যখন তারা দেখল যে মুজাহিদীন ভাইদের হাতে মুরতাদরা ভেড়ার মত নিহত হচ্ছে, তখন তারা সত্যের আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য, এই সকল এজেন্ট ও তাদের মিত্রের জন্য রক্ষক খুঁজতে লাগল- ফলে তারা তাদের রক্তপাত যে হারাম- তা দাবী করল। তাদের এই দাবীর ভিত্তি হলো যে, তারা একই ভূমির অধিবাসীঃ "ইরাকী"।

শাইখ 'আব্দুল লাতিফ ইবন আবদির-রাহমান বলেন, "নিশ্চয়ই, সকল নীতির (একজনের ইসলাম) ভিত্তি অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং এর কোন দৃঢ়তা থাকে না। যদি না আল্লাহ্‌র শত্রুদের বর্জন করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়, তাদেরকে অস্বীকার করা হয় এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রার্থণা করা হয়– তাদেরকে ঘৃণার সাথে পরিহার করে এবং প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতার মাধ্যমে।" (*আর-রাসায়ীল আল-মুফীদাহ* পৃ ৬০)

❖ প্রশ্ন-৫। জাতীয়তাবাদের ধারণাকে মুসলিমদের মধ্যে প্রবেশ করানোর জন্য কাফেররা কিরূপ তৎপর? জাতীয়তাবাদের কুফলগুলো কি কি?

উত্তরঃ- শরীয়া মোতাবেক প্রত্যেক মুসলিমই যে বাঁধনে আবদ্ধ তা হলো ইসলামের বাঁধন। এবং এই বাঁধনের কিছু দায়িত্ব আছে, যেমন- সাহায্য করা, অপরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, অন্যের পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি। এই সুদৃঢ় বাঁধনকে ধ্বংস করার জন্য কাফিররা সবসময় তৎপর। তাই তারা মুসলিমদের মধ্যে অন্যান্য কিছু ভ্রান্ত বাঁধনের চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের মন থেকে এই ইসলামের বাঁধন মুছে

ফেলতে চেষ্টা করছে। যেমনঃ দেশের প্রতি বন্ধন বা "জাতীয়তা"। অর্থাৎ তারা বলে যে মানুষের একটি পরিচয় হলো তার দেশ এবং শুধু তাই না, একটি দেশের সব অধিবাসীই সমান- তাদের ধর্ম যাই হোক না কেন। এবং এই মতবাদের মূল কথা হলো, অন্য সব বন্ধন বা দায়িত্বের উপর স্থান পাবে

জাতীয়তার বন্ধন এবং দেশের প্রতি দায়িত্ব। অথচ, ইসলামী শারীয়াহ মোতাবেক এই ধরনের বন্ধন সম্পূর্ণ অবৈধ।

কারণ মুসলিমের আনুগত্য কখনও একখন্ড ভৌগোলিক এলাকার প্রতি হতে পারে না। কারণ, যে কোন মুসলিমকেই একদিন হিজরত করতে হতে পারে। যে তার নিজের দেশকে আল্লাহ্ ও রাসূলের (সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) খুশির চেয়ে উপরে স্থান দেয়, তাকে হুশিয়ার করে দিয়ে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [التوبة/٢٤]

“বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয়– তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য; যার ক্ষতির আশঙ্কা কর, এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস; তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন না।” (সূরা আত-তাওবাহ ৯ঃ ২৪)

এই আয়াতে [التوبة: ٢٤] { وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ } “....তোমাদের আবাসস্থল যাকে তোমরা পছন্দ করো....।” বলতে স্বদেশের প্রতি টানকেই বোঝানো হয়েছে।

রাসূলুলাহ (সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) বলেছেন,

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ

“যেসব মুসলিম মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।” (জাবীর থেকে আবু দাউদে বর্ণিত)

এছাড়া জাতীয়তাবাদ একটি অঞ্চলের মুসলিম ও অমুসলিম উভয়কে সমান মনে করে, যেটা খুবই ভয়ংকর অপরাধ।

রাসূলুলাহ (সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) বলেছেন, “ইসলামই কর্তৃত্ব করে এবং এর উপর কেউ কর্তৃত্ব করতে পারে না।” (দারকুতনীতে বর্ণিত, আলবানী কর্তৃক হাসান হিসেবে স্বীকৃত)

একইভাবে জাতীয়তাবাদ দাবী করে যে, একজন মুসলিম যদি অপর এক মুসলিমের মতো একই দেশে জন্মগ্রহণ না করে, তাহলে সে হলো ভিন্ন জাতি।

এটাও ইসলাম বিরোধী বক্তব্য। কারণ, দুইজন মুসলিম ভাই-ভাই, তাদের দেশ যত দূরেই হোক না কেন।

জাহিলিয়াতের এসব বন্ধনের মাঝে জাতীয়তাবাদ ছাড়াও আছে গোত্রবাদ বা ক্বওমিয়্যাহ অর্থাৎ, নিজেকে কোন নির্দিষ্ট গোত্র বা নির্দিষ্ট জাতের কিছু মানুষের সাথে সম্পর্কিত মনে করা। যারা এই ভ্রান্তির মাঝে আছে তারা এটাকে অন্য সব বন্ধনের উপরে স্থান দেয় এবং এই গোত্রের স্বার্থেই যুদ্ধ করে। এটা হলো ইসলাম-পূর্ব যুগের জাহিলিয়াত যার ব্যাপারে রাসূলুলাহ বলেছেনঃ "এটা ছেড়ে দাও, কারণ এটা নোংরা।" (জাবীর (রদিয়ালাহু আনহু) থেকে বুখারীতে বর্ণিত) এবং যে এই গোত্রবাদের জন্য যুদ্ধ করে তার ব্যাপারে রাসূলুলাহ (সা:) বলেছেনঃ "তার মৃত্যু হলো জাহিলিয়াতের মৃত্যু।" (মুসলিম)

এবং পূর্বের আয়াতে {وَعَشِيرَتُكُمْ} [التوبة: ٢٤] "... তোমার আত্মীয়স্বজন ..." বলতে এই গোত্রবাদের বাঁধনের কথাই বলা হয়েছে, এবং আল্লাহ্ আমাদের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে উলেখ করেছেন নাবীদের কথা যারা তাদের মুশরিক স্বজনদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেনঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

"তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে, তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল– তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্ র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে, যদি না তোমরা এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন কর। ...." (সূরা মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে শারীয়াহ অনুযায়ী একমাত্র বাঁধন হলো ইসলামের বাঁধন এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের বাঁধন। এবং এ ছাড়া অন্য কোন বাঁধনের কথা চিন্তাও করা যাবে না। সুতরাং ভালবাসা এবং শত্রুতা শুধু ঈমানের উপরই নির্ভর করে ঃ "....যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনো।" জাহিলিয়াহ্র বন্ধনের মাঝে আরো আছে ভাষা, বর্ণ, বা সুযোগ সুবিধার ভিত্তিক বন্ধন। এগুলোর সবই নিষিদ্ধ, এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্র বাণীঃ

"…. যে সম্পদ তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের ব্যবসা যার ক্ষতি তোমরা আশংকা কর…. ।" (সূরা আত-তাওবাহ ৯ঃ ২৪)

এসব কোন বন্ধনই মুসলিমদের চিন্তায় আসতে পারে না, বিশেষতঃ এগুলো যখন ইসলামী শারীয়াহর বিরুদ্ধে যায়। এবং এইসব বন্ধনের ধারণা তৈরী করেছে কাফিররা যাতে তারা মুসলিমদের বিভক্ত করতে পারে এবং মুসলিমদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা তৈরি করে দিতে পারে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٠١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [آل عمران/١٠٠-١٠٥]

"যদি তোমরা তাদের এক দলের অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের বিশ্বাসের পর আবার কাফিরে পরিণত করবে। কিরূপে তোমরা কুফরী করতে পার- যখন আল্লাহ্র নির্দেশনাবলী তোমাদের নিকট পঠিত হয়, এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল বিদ্যমান আছেন। এবং যে কেউ আল্লাহ্র পথ অবলম্বন করবে, সে সরল পথে পরিচালিত হবে। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আলাহ্কে যথার্থভাবে ভয় কর, এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মরো না। এবং তোমরা সকলে আল্লাহ্র রশি দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ কর। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি-সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হলে। তোমরা অগিড়ব-কুন্ডের প্রান্তে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদের তা হতে উদ্ধার করেন; এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন। যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও। তোমাদের মধ্যে এরূপ

একদল হওয়া উচিত- যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম। তোমরা তাদের মতো হবে না, যাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ও নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।" (সূরা আলি 'ইমরান ৩ঃ ১০০-১০৫)

এতক্ষণ যা যা বলা হয়েছে, তার সারমর্ম হলো যে, মুসলিমদের বুঝতে হবে যে তাদের আনুগত্য, তাদের প্রচেষ্টা, তাদের সাহায্য- সহযোগিতা এই সবকিছুরই ভিত্তি হলো তাদের ঈমানের বাঁধন। এবং এটা ছাড়া একজন মুসলিমের জন্য আর কোন বন্ধন নেই, কারণ অন্য সব বন্ধনই হলো জাহিলিয়াহ। সুতরাং অন্যসব বন্ধনের উপর ভিত্তি করে বন্ধুত্ব করা বা ঐসব বন্ধনের জন্য যুদ্ধ করা হারাম। এবং সবচেয়ে পূর্বে অবস্থানকারী মুসলিমও সবচেয়ে পশ্চিমে অবস্থানকারী মুসলিমের ভাই, তাদের গায়ের রং, তাদের ভাষা, তাদের গোত্র যতো ভিন্ন হোক না কেন। এবং এই ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানো, দ্বীনের খাতিরে তাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরই তার নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ফরয।

❖ প্রশ্ন-৬। দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর/ হারব কি?

উত্তরঃ- ইসলামের সংস্পর্শে বিদ্বেষ ও বিভেদের সকল শ্লোগান বন্ধ হয়ে যায়। বংশ, গোত্র ও আঞ্চলিক পার্থক্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট জাতীয়তা দুর্গন্ধময় লাশ হিসেবে পরিত্যক্ত হয়। দেশ, মাটি, রক্ত ও মাংসের সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে মানুষের দৃষ্টি ঊর্ধমূখী হয়। যেদিন থেকে মুসলমানের দৃষ্টিভংগী সংকীর্ণতার গন্ডী ভেঙ্গে দিয়ে দিগন্ত রেখা পর্যন্ত প্রসারিত হয়, সে দিনই মুসলমানদের আবাসভূমি নাম ধারণ করে। কারণ সেখানে ঈমানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতি লাভ করে।

ইসলামের এ সুশীতল ছায়াতলে যারা বসবাস করেন, তাঁরাই এ দেশের নিরাপত্তা বিধান করেন। এ দেশের প্রতিরক্ষা ও ইসলামী শাসনাধীন এলাকার সীমানা সম্প্রাসারনের প্রচেষ্টায় যারা প্রাণত্যাগ করেন, তাঁরাই হন শহীদ। যাঁরাই ইসলামী আকীদার রত্নহার নিজেদের গলায় পরিধান করেন এবং ইসলামী শরীয়াতকে তাঁদের জীবনের প্রতিপালনীয় বিধান হিসেবে মেনে নেন, তাঁদের সকলেরই আশ্রয়স্থল হচ্ছে দারুল ইসলাম। এমন কি যারা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ না করেও ইসলামী শরীয়াতের শাসন ব্যবস্থা মেনে নেয় তারাও জিম্মি হিসেবে এ রাষ্ট্রের সকল সুখ-সুবিধা ভোগ করতে পারে।

কিন্তু যে দেশে ইসলামী শাসনের পতাকা উত্তোলন করা হয়নি এবং যেখানে ইসলামী শরীয়াত বাস্তবায়িত নয়, সে দেশ মুসলিম ও জিম্মি উভয়ের জন্যেই

দারুল **কুফর** /দারুল হরব। মুসলমান সর্বদায়ই দারুল হরবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। এ দারুল হরবের সাথে কোন প্রকারের স্বার্থে জড়িত থাকে, তবুও প্রয়োজনবোধে সে দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে মুসলমান কখনো পশ্চাদপদ হবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। অথচ মক্কা ছিল তাঁর পবিত্র জন্মভূমি। তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও স্ববংশের লোকেরা সেখানেই বসবাস করছিল। তিনি ও তাঁর প্রিয় সহচরগণের বাড়ী-ঘর ও ক্ষেত-খামার মক্কাতেই ছিল। মদীনা অভিমুখে হিজরাত করার সময় তাঁরা এসব বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে গিয়েছিলেন। তথাপি ইসলামের সামনে নতি স্বীকার করে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের শাসন মেনে না নেয়া পর্যন্ত মক্কার মত পবিত্র শহরও দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি।

এটাই হচ্ছে ইসলাম। মুখে কিছু শব্দ উচ্চারণ, বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান পালন অথবা বিশেষ কোন বংশে বা দেশে জন্ম গ্রহণের নাম ইসলাম নয়। এ আদর্শেরই নাম ইসলাম এবং এ আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রই দারুল ইসলাম। কোন দেশের মাটি, কোন বিশেষ গোত্র, কোন বিশেষ বংশে বা পরিবারের নাম ইসলাম বা দারুল ইসলাম নয়।

ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে যে, মুসলমান যে মাতৃভূমিকে ভালবাসবে এবং যার প্রতিরক্ষার জন্যে জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাবেব- তা নিছক একখন্ড ভুমি নয়। যে জাতীয়তা মুসলমানের পরিচয় ঘোষণা করবে, তা কোন গভর্নমেন্ট প্রদত্ত সংজ্ঞা মুতাবিক গঠিত জাতি নয়। মুসলমানের আত্মীয়তা ও ঐক্যসূত্র রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠে না। যে পতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্যে মুসলমান জীবন দান করতেও গৌরববোধ করবে; তা কোন নির্দিষ্ট দেশের প্রতীক নয়। যে বিজয়ের জন্যে মুসলমান সর্বদা সচেষ্ট থাকবে এবং যা অর্জিত হলে মুসলমান আল্লাহর দরবারে মাথা নত করবে, তা নিছক সামরিক বিজয় নয় বরং তা হবে মহাসত্যের বিজয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا [النصر/١-٣]

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে তখন তুমি জনগণকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। সে সময় নিজের রবের প্রশংসা ও গুণকীর্তন কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।" (সূরা নাসর)

এ বিজয় শুধু ঈমানের পতাকা তলেই অর্জিত হয়। অপরাপর পতাকার বিদ্বেষাত্মক শ্লোগান এখানে ব্যবহৃত হয় না। আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও তাঁরই শরীয়াতের বাস্তবায়নের জন্যে এখানে জিহাদ অনুষ্ঠিত হয়। অন্য কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে নয়। উপরে যে দারুল ইসলামের পরিচয় পেশ করা হয়েছে তারই প্রতিরক্ষার জন্যে জিহাদের প্রয়োজন- জন্মভূমি বা জাতির মর্যাদা রক্ষা মনোভাব নিয়ে নয়। বিজয়ের পর বিজয়ী সেনাবাহিনী শুধু গণিমতের সম্পদ হস্তগত করণের জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে না।

পার্থিব খ্যাতি অর্জন বা বীরত্ব প্রদর্শনও এ বিজয়ের উদ্দেশ্য নয়। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই মু'মিনের পরম কাম্য। এ জন্যে, বিজয়ী বাহিনী তাসবীহ ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে পরম করুণাময় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে উঠে। দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ জিহাদের প্রেরণা জাগ্রত করে না। পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদির নিরাপত্তা বিধানও জিহাদের লক্ষ্য নয়। তবে দেশ, জাতি, পরিবার ও সন্তানদেরকে বাতিল আদর্শের আক্রমণ থেকে মুক্ত করা এবং তাদের দ্বীন ও ঈমানের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে জিহাদ অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه و سلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله ؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, অপর এক ব্যক্তি মর্যাদা লাভের জন্যে। আবার কেহবা লোক দেখানোর জন্যে। বলুন তো, এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়েছে? উত্তরে তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উচ্চমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করে, একমাত্র সে-ই আল্লাহর পথে লড়েছে।"

শুধু আল্লাহর পথে লড়াই করার মাধ্যমেই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা যেতে পারে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে লড়াই করে এ মর্যাদা হাসিল করা যায় না।

যে দেশ মুসলমানদের ঈমান-আকীদার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়, দ্বীনি আদেশ নিষেধ প্রতিপালনে বাধা দেয় এবং যে দেশে আল্লাহর শরীয়াত পরিত্যক্ত হয়েছে, সে দেশ দারুল হার্‌ব।

এ দেশে যদি মুসলামনদের আত্মীয়-স্বজন, পরিবার ও বংশের লোকজন বাস করে, সেখানে যদি মুসলমানের ব্যবসা-বানিজ্য অথবা জায়গা-জমি থাকে এবং

এ দেশের নিরাপত্তার সাথে যদি মুসলমানদের আর্থিক স্বার্থের প্রশ্নও জড়িত থাকে তখাপি তার দারুল হরবের চরিত্র পরিবর্তন করা যাবে না। পক্ষান্তরে যে দেশে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা সর্বপ্রকার চাপমুক্ত ও তার প্রাধান্য স্বীকৃত এবং যে দেশে ইসলামী শরীয়াত বাস্তবে রূপ লাভ করে, সে দেশ দারুল ইসলাম আখ্যা লাভ করবে। সে দেশে মুসলমানগণ তাদের পরিবার-পরিজনসহ বসবাস না করুক, তাদের বংশ ও গোত্রের লোক সেখানে না থাকুক এবং সে দেশের সাথে মুসলমানদের ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য কোন অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত না থাকুক, তবুও সে দেশ দারুল ইসলাম।

যে দেশে ইসলামী আকীদার শাসন চলে, ইসলামই যে দেশে জীবন বিধানরূপে স্বীকৃতি লাভ করে এবং আল্লাহর শরীয়ত যে দেশে কার্যকর হয়, সে দেশই মুসলামদের স্বদেশ। স্বদেশের এ অর্থই মানবতার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। অনুরূপভাবে আকীদা-বিশ্বাস এবং জীবন বিধানের ভিত্তিতেই ইসলামী জাতীয়তা গড়ে উঠে এবং মানুষের মনুষ্যত্বকেই সেখানে বিকশিত করে তোলা হয়।

❖ প্রশ্ন-৭। দারুল কুফর থেকে হিজরতের হুকুম কি, এব্যাপারে বিস্তারিত বিধান সমূহ কি কি?

উত্তরঃ দ্বীন রক্ষা করে মুশরিকদের থেকে নিরাপদে হিজরত ওয়াজিব যখন দ্বীনের ওপর ফিৎনার আশংকা থাকে। আর এটাই হল

'দারুল কুফর' থেকে 'দারুল ইসলাম' অথবা 'দারুল আমান'-এ হিজরত করা, যার পক্ষে সম্ভবপর।

রাসূলুলাহ (সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) বলেছেনঃ

أَنَا بَرِىءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ

"সেইসব মুসলিমদের কারো সাথে আমার সম্পর্ক নেই যারা মুশরিকদের ভেতরে অবস্থান করে।" (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আতা ইবনে আবি বারাহ (রহঃ) থেকে বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি উবাইদ ইবনে উমাইর আল লাইছিকে সাথে নিয়ে আয়েশা (রাযিঃ)-এর সাথে দেখা করি। এরপর আমরা তাদের হিজরতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বললেনঃ

لا هجرة بعد اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه و سلم مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية

“আজ আর হিজরত নেই, -মু’মিনগণের ভেতরে যে ব্যক্তির দ্বীনের উপর ফিৎনা আসবে সে যেখানে খুশী আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারে; তবে জিহাদ এবং এর নিয়্যত ব্যতীত ।”

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار। “হিজরত বন্ধ হবে না যতদিন পর্যন্ত শত্রুদের সাথে যুদ্ধ চলবে।” [আহমাদ, আব্দুল্লাহ ইবনে সাদী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত]

অন্য এলাকায় হিজরতের হুকুম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইবনে কুদামাহ (রহিমাহুল্লাহ) “হিজরত সংক্রান্ত অধ্যায়ে বলেনঃ আর এটি হলো ‘দারুল কুফর’ ত্যাগ করে ‘দারুল ইসলামে’ আসা”-

আল্লাহ্ বলেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء/٩٧]

“নিশ্চয়ই যারা নিজেদের জীবনের প্রতি যুলুম করেছিল, ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ হরণ করতে গিয়ে বলবেঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম। তারা বলবেঃ আল্লাহ্‌র দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তন্মধ্যে হিজরত করতে? অতএব তাদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।” (সূরা নিসা ৪ঃ ৯৭)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যে, “সেইসব মুসলিমদের কারো সাথে আমার সম্পর্ক নেই যারা মুশরিকদের ভেতরে অবস্থান করে।”

(আবু দাউদ, তিরমিযী)

মুহাজির তিন প্রকারেরঃ

প্রথমতঃ যার ওপর হিজরত ওয়াজিব এবং সে এ ব্যাপারে সক্ষম। যখন সে তার দ্বীন প্রকাশ করতে পারে না, বা যখন সে দ্বীনের হুকুম মানতে পারে না অথবা যখন সে কাফিরদের মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং এই ব্যক্তির ওপর হিজরত ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء/٩٧]

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের জীবনের প্রতি যুলুম করেছিল, ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ হরণ করতে গিয়ে বলবেঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম। তারা বলবেঃ আল্লাহ্‌র দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তন্মধ্যে হিজরত করতে? অতএব তাদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।" (সূরা নিসা ৪ঃ ৯৭)

আর এটা সত্যিই একটি ভয়াবহ হুমকি, যা হিজরত এর আবশ্যকতা তুলে ধরে। এটা এই কারণেই যে প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির জন্য 'দারুল কুফর' থেকে হিজরত করা অবশ্যকরণীয়। আর হিজরত হলো এসব আবশ্যক প্রয়োজনসমূহের একটি, যা এগুলোকে পরিপূর্ণতা দেয়, এবং যা ছাড়া হুকুমসমূহ পালন করা সম্ভব নয়; সুতরাং এ বিষয়টিও ওয়াজিব।

দ্বিতীয়তঃ যার ওপর হিজরত ওয়াজিব নয়। যে হিজরত করতে সক্ষম নয়- অসুস্থতার কারণে, অথবা সেখানে থাকতে বাধ্য

হলে অথবা তার স্ত্রী সন্তানদের বা অনুরূপের (শারীরিক) দুর্বলতার কারণে। আল্লাহ্‌র আয়াতঃ

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

"কিন্তু পুরুষ নারী ও শিশুদের মধ্যে অসহায়গণ ব্যতীত। যারা কোন উপায় করতে পারে না বা কোন পথ প্রাপ্ত হয় না। ফলতঃ তাদেরই আশা আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।" (সূরা নিসা ৪ঃ ৯৮-৯৯)

আর এক্ষেত্রে হিজরতকে উত্তম বা সুপারিশমূলকও বলা যাবে না কারণ, এটি সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ সেই ব্যক্তি যার জন্য এটি প্রশংসনীয় কিন্তু ওয়াজীব নয়। ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি হিজরত করতে সক্ষম আবার প্রকাশ্যে তার দ্বীন পালনেও সক্ষম। সুতরাং দারুল কুফরে তার বসবাসে ইতি টানা প্রশংসনীয় হবে যাতে সে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে সক্ষম হয় এবং মুসলিমদের সংখ্যা বাড়াতে পারে এবং তাদের সাহায্য করতে পারে। সেই সাথে কাফিরদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের কুকর্মের সাক্ষী হওয়া থেকেও রেহাই পায়। কিন্তু এটি তার ওয়াজিব নয় কারণ সে হিজরত না করেই সেখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে সক্ষম।

নু'আইম আন নুহাম যখন হিজরত করতে চান তখন তার কওম বনু আদি তার কাছে এসে বলে, আমাদের সাথে থাকুন, আপনি আপনার দ্বীনের ওপর থাকবেন এবং তাদের থেকে আপনাকে রক্ষা করবো যারা আপনার দ্বীনের ওপর থাকবে না এবং তাদের থেকে

আপনাকে রক্ষা করব যারা আপনার ক্ষতি করতে চায়। আমাদের জন্য দায়িত্বশীল থাকুন যেভাবে আপনি (বর্তমানে) আমাদের প্রতি দায়িত্বশীল আছেন।' আর তিনি বনু আদির ইয়াতিম ও বিধবাদের দেখাশোনা করতেন। সুতরাং তিনি কিছুদিন হিজরত থেকে বিরত থেকে পরবর্তী সময়ে হিজরত করেন। রাসূলুলাহ (সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) তাকে বলেনঃ "তোমার কওম তোমার প্রতি তার চেয়ে উত্তম যেমনটি ছিল আমার কওম আমার প্রতি। আমার কওম আমাকে বহিষ্কার করে এবং আমাকে হত্যা করতে চায় এবং তোমার কওম তোমাকে রক্ষা করে এবং (ক্ষতি থেকে) বাচায়। তখন তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুলাহ', আপনার কওম তো আপনাকে আল্লাহর আনুগত্য ও তার শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের দিকে বহিষ্কার করেছে। আর আমার কওম আমাকে হিজরত ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে আটকে রেখেছে। অথবা এর কাছাকাছি কোন বক্তব্য।" (আল মুগনি ওয়াশ শারহ্ আল কাবীর) [জিহাদের মৌলিক নীতিমালা-আঃ ক্বাদির ইবনে আঃ আযিয]

❖ প্রশ্ন-৮। দারুল কুফর থেকে যতক্ষন হিজরত করতে না পারবে ততক্ষন একজন মুসলিমের দ্বায়িত্ব্য কি?

উত্তরঃ- দারুল কুফরে একজন ব্যক্তির বসবাসের অনুমতি নেই। এখান থেকে হিজরত করা তার জন্য ওয়াজিব। যতক্ষন এই পাপের স্থান থেকে হিজরত করতে না পারবে ততক্ষন করনীয় হচ্ছে-

ক. দাওয়াহ এবং

খ. অর্থ উপার্জন করে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা। [মাসারী আল আসওয়াক - ইবনু আন্ নুহাস]

দ্বীনের শীর্ষচুড়া

❖ প্রশ্ন-১। দ্বীনের শীর্ষ চুড়া কি? এর হুকুম কি?

উত্তরঃ- মুআজ বিন জাবাল বর্ণনা করেন, আমরা তাবুক হতে ফেরার পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম তিনি আমাকে বললেন,

قال ألا أدلك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد

"তুমি যদি চাও আমি তোমাকে এই বিষয়ের মূল, স্তম্ভ এবং চূড়া সম্পর্কে বলতে পারি।" আমি বললাম, "অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।" তিনি বলেন, "সব ষিয়ের প্রধান হল ইসলাম; এর খুঁটি হল সালাহ এবং এর চূড়া হল জিহাদ।" (আল হাকিম-আহমেদ-আল তিরমিযী ইবনে মাযাহ) আল্লাহ সুবঃ নির্দেশ দিয়েছেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [البقرة/٢١٦]

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা, বাক্বারাহ ২ঃ২১৬)

ইমাম আব্দুল ক্বাদির ইবনে আঃ আজিজ বলেন, জিহাদ একটি ফরযে কিফায়া ইবাদত, তবে ক্ষেত্রবিশেষে এটি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরয হতে পারে।

[জিহাদ বিষয়ক মৌলিক আলোচনা]

ইবনে কুদামাহ বলেনঃ "তিনটি ক্ষেত্রে জিহাদ নির্দিষ্টভাবে (ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর) ফরয হয়ঃ

প্রথমতঃ, যখন দুইটি বাহিনী পরস্পর মিলিত হয় এবং মুখোমুখী অবস্থান করে।

দ্বিতীয়তঃ, কাফিররা কোন দেশ আক্রমন করলে ঐ দেশে অবস্থানকারী সকলের উপর জিহাদ ফরয।

তৃতীয়তঃ, ইমাম যদি সকলকে জিহাদের ডাক দেয় তবে সকলের জন্য এতে অংশ নেয়া বাধ্যতামূলক। (আল্ মুগনী ওয়াশ শারহ্ আল কাবীর / দশম খন্ড)

শাইখ আঃ আযযাম আরও একটি পরিস্থিতিতে ফারদুল আইন বলেন, ' যদি কাফেররা মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু মানুষকে বন্দী করে ফেলে।' [মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা]

❖ প্রশ্ন-২। ঈমান আনার পর সর্ব প্রথম ফারদ কি?

উত্তরঃ এই বিষয়ের উপর ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, "প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ, যার মাধ্যমে আগ্রাসী শত্রুদের (মুসলিমদের ভূমি থেকে) বের করে দেয়া হয়, এটি জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিহাদ। সর্বজন স্বীকৃত যে, দ্বীন এবং নিজেদের সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে একটি আবশ্যক দায়িত্ব। ঈমান আনার পর প্রথম ফারদ দায়িত্ব হল আগ্রাসী শত্রুদেরকে পার্থিব ও দ্বীনের উপর আগ্রাসনকে প্রতিহত করা। এক্ষেত্রে কোন ওজর-আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই; যেমনঃ সরবরাহ অথবা পরিবহন, বরং যার যতটুকু সামর্থ্য আছে তা নিয়েই জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। আলেমগণ, আমাদের সহকর্মীগণ এবং অন্যান্যরাও এ বিষয়ের উপর একমত।"

একটি সহীহ হাদীসের বর্ণিত হয়েছে, ইবাদ বিন আসামাত (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম) বলেছেন,

على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره الي اخر الحديث

'মুসলিমদের উপর বাধ্যবাধকতা যে, তাকে শুনতে ও মানতে হবে কঠিন এবং সহজ সময়ে, তার পছন্দ হোক বা অপছন্দ এবং যদিও তার অধিকার তাকে না দেয়া হয়।' তাই এই আবশ্যক দায়িত্বের একটি খুটি হচ্ছে জিহাদে বেরিয়ে পরতে হবে, যদিও আমাদের কঠিন অথবা সহজ সময় হয়। কিন্তু প্রতিরোধমূলক জিহাদের ক্ষেত্রে এই ফর্‌দ কাজটির প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক গুনে বেড়ে যায়। দ্বীন এবং পবিত্র বিষয়গুলো আগ্রাসী শত্রুদের হতে রক্ষা করা হলো ফর্‌দ- এক্ষেত্রে সবাই একমত।

[কিতাব আল-ইখতিয়ারাত আল-ইলমিয়্যাহ-ইবনে তাইমিয়্যাহ– আল-ফাতওয়া কুব্‌রা-৪/৬০৮]

❖ প্রশ্ন-৩। অন্তরে তাওহীদের ভিত্তি মজবুত হওয়ার জন্য করনীয় কি? তাওহীদ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে?

উত্তরঃ শাইখ বলেন, যখন ময়দানে ছিলাম তখন আমি ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ করা ব্যতীত একজন মানুষের অন্তরে তাওহীদের ভিত্তি মজবুত হতে পারে না।

এই হচ্ছে সেই তাওহীদ যার সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলে গিয়েছেনঃ "আমাকে পাঠানো হয়েছে কেয়ামতের পূর্বে তলোয়ার সহ..." কেন? "...যাতে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করা হয় শরীক বিহীন অবস্থায়।" (ইবন উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ও মুসনাদে আহমদ কর্তক সংগৃহীত। তিনি বলেছেন সহীহ। আলবানী বলেছেন সহীহ "ইরওয়া আল-ঘালীল" (১২৬৯)

সুতরাং, দুনিয়ার বুকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে তলোয়ার এর মাধ্যমে... । শুধু আক্বীদা অথবা আমলের বই পড়ার মাধ্যমে নয় ।
প্রকৃতপক্ষে, রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে সেই তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ-র (সকল ইবাদতে আল্লাহ্‌র একত্ব অক্ষুণ্ন রাখার) শিক্ষা দিয়েছেন যার কারণে তিনি প্রেরিত হয়েছেন; যাতে এই তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত হয় । তিনিই শিখিয়েছেন যে, কোন বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে এটি তওহীদ প্রতিষ্ঠিত হবার নয় ।
বরং এটি প্রতিষ্ঠিত হবে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে,জিহাদের ময়দানে কাফিরদের মোকাবেলার মাধ্যমে; তাগুতের মুখোমুখি হয়ে অত্যাচার সহ্য করার মাধ্যমে ও সর্বোপরী নফ্‌সের কুরবানী করার মাধ্যমে । যখনই কোন ব্যক্তি এই দ্বীনের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে তখনই এই দ্বীন তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য এবং নিগুঢ় তত্ত্ব সেই ব্যক্তির জন্য প্রকাশ করে দেয় । যে প্রতিদিন মৃত্যুর সামনে উপস্থিত হয় সে কি কোন কিছুকে ভয় পেতে পারে আল্লাহ ছাড়া ।
সুতরাং তাওহীদ অন্তরে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, সম্পূর্ণভাবে শিকড় গাড়তে পারে না - জিহাদ করা ব্যতীত । [তাওহীদ আল আমালী, শাইখ আঃ আযযম রহ.]

❖ প্রশ্ন-৪ । শাসক যদি কুফরী করে এবং এতে অনড় থাকে, তার বিরুদ্ধে কি করনীয় ঈমানদারদের?
উত্তরঃ- শাসক যদি কুফরী করে এবং এতে অনড় থাকে, তাহলে তার সাথে যুদ্ধ করা আবশ্যক, এটি ফরযে আইন । আর অন্য সকল বিষয়ের উপর এটি প্রাধান্য পাবে । তার বিরূদ্ধে করনীয় গুলো হচেছ-

১) এই হুকুমটি ঐসব শাসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে শারীয়াহ ব্যতীত অন্য আইন প্রয়োগ করে ।
২) আর এই মূরতাদ শাসকের পক্ষে যদি কোন ব্যাখ্যা না থাকে; তাহলে তাকে সত্ত্বর অপসারণ করা অত্যাবশ্যক । আর
তাকে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে, এতে যদি সে তাওবা করে তাহলে ছেড়ে দেয়া হবে অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে ।

৩) আর যদি মূরতাদ শাসক একটি বাহিনীকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে; তাহলে তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যক এবং তার পক্ষে যে যুদ্ধ করবে সেও তার মতই একজন কাফির ।
৫) আর মুসলিমরা যদি এটি করতে অক্ষম হয় তাহলে অন্তত এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যক ।

৬) আর এসব মূরতাদ শাসক ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারদুল আইন, শুধুমাত্র তারাই অব্যাহতি পাবে যাদের পক্ষে শারীয়াহ সম্মত ওযর আছে ।

৭) স্বভাবজাত অন্যান্য কাফিরদের সাথে যুদ্ধের চেয়ে, এসকল মূরতাদ শাসকদের সাথে যুদ্ধ করা অগ্রাধিকার পাবে ।

৮) আর এক্ষেত্রে এমন কোন শর্ত নেই যে, মুসলিম মুজাহিদদের একটি ভিন্ন রাষ্ট্র থাকতে হবে ।

৯) অনেকে বলে থাকেন যে, কাফেরদের বাহিনীর মধ্যে নানা কারণে অনেক মুসলিম মিশে আছে; তাদেরকে পৃথক করতে হবে । [জিহাদের মৌলিক নীতিমালা-আঃ ক্বাদির ইবনে আঃ আযিয]

সমাপ্ত

“আপনি মারকাজের জন্য,
মারকাজ সকলের জন্য ।”

শীঘ্রই বের হতে যাচ্ছে

“দ্বীন ক্বায়েমের সঠিক পথ”

ও আত্মশুদ্ধি মূলক কিতাব

“কিতাবুত তাযকিয়া”

সহ আরো কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ ।

সূচীপত্র

সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও কর্তব্য পৃ: ১১-১৪

ইসলাম পৃ: ১৪-১৯

ঈমান পৃ: ১৯-২৩

দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত দু'টি বিষয়ঃ ইছবাত ও নাফি পৃঃ ২৩-৩৩

১. দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত দু'টি বিষয় কি কি?
২. দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো দালীল প্রমানসহ আলোচনা করুন?
৩. দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্গত এই বিষয়গুলো কিভাবে জানা গেল?

তাওহীদ পৃঃ ৩৩-৩৮

১. তাওহীদ কি?
২. তাওহীদ শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে?
৩. কালিমাতুত তাওহীদ তথা' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর গুরুত্ব ও মর্যাদা কি?
৪. তাওহীদের উপকারিতা কি?
৫. তাওহীদ তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ফাযীলাত কি?

তাওহীদের প্রকারভেদ পৃঃ ৩৮-৪৭

১. তাওহীদ কয় প্রকার ও কি কি?
২. 'রব' মানে কি?
৩. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বলতে কি বোঝায়?
৪. তাওহীদ আল আছমা ওয়াস সিফাত বলতে কি বোঝায়?
৫. আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় নিষিদ্ধ?
৬. তাওহীদ আল উলুহিয়্যাত বলতে কি বোঝায়?
৭. কেন শুধু আল্লাহকেই একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ হিসেবে গ্রহন করতে হবে?
৮. শুধুমাত্র তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাত ও আসমা ওয়াস সিফাতের স্বীকৃতি যথেষ্ট নয় তার প্রমান কি?
৯. নাবী রাসুলরা কোন তাওহীদের দিকে নিজ নিজ জাতিকে আহ্বান করেছিলেন?

তাওহীদের শর্তাবলী পৃঃ ৪৭-৫২

১. শর্ত কাকে বলে?
২. তাওহীদের শর্তাবলী পূরন করা কেন জরূরী?
৩. তাওহীদের শর্ত কয়টি ও কি কি?
৪. তাওহীদ সম্পর্কে কেন জানতে হবে? এ ব্যাপারে বর্তমানে অধিকাংশ লোকের কি অবস্থা?

তাওহীদের রুকন পৃঃ ৫২-৬১

১. রুকন কাকে বলে? তাওহীদের রুকনের গুরুত্ব কি?
২. তাওহীদের রুকন কয়টি ও কি কি?
৩. তাগুত কি? তাগুতের সংজ্ঞা কি?
৪. প্রধান প্রধান ত্বাগুত কারা?
৫. আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালেম শাসকরা কিভাবে ত্বাগুতের অন্তর্ভূক্ত?

৬. কিভাবে 'কুফর বিত ত্বাগুত' তথা ত্বাগুতকে বর্জন করতে হবে?
৭. ত্বাগুতকে অস্বীকার করা কেন অপরিহার্য?
৮. তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন 'ঈমান বিল্লাহ' বলতে কি বোঝায়?

ইবাদাহ পৃঃ ৬১-৬৯

১. ইবাদাতের সংজ্ঞা কি?
২. কিভাবে একটি কাজ ইবাদতে পরিণত হয়?
৩. ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত কি?
৪. ইবাদতে ইহসান কি?
৫. ইবাদত সমূহ কি কি যা আল্লাহ নির্দেশ করেছেন দলীলসহ উল্লেখ করুন?

আশ্ শিরক পৃঃ ৬৯-৮২

১. শিরক্ কি?
২. শিরকের ভয়াবহতা কি?
৩. শিরকের ক্ষতিকর দিক ও বিপদসমূহ কি কি?
৪. শিরক্ না করতে আমাদের প্রতি নির্দেশ কি?
৫. শির্ক না করার ফযীলত কি?
৬. শিরকের কারনগুলো কি কি?
৭. সাধারন ও বিস্তৃত অর্থে শিরক্ কয় প্রকার ও কি কি?
৮. নির্দিষ্ট বা খাছ অর্থে শিরক্ কয় প্রকার ও কি কি?
৯. শিরক আল আকবার বা বড় শিরক কয় প্রকার ও কি কি? এ ব্যাপারে প্রচলিত শিরকগুলো কি কি?
১০. শিরক্ আল আসগার বা ছোট শিরক কয় প্রকার ও কি কি? এ ব্যাপারে প্রচলিত শিরকগুলো কি কি?
১১. আশ্-শিরক্ আল খফী বা গোপন শিরক্ বলতে কি বোঝায়?

আর-রিয়াঃ গোপন শিরক্ পৃঃ ৮২-৮৯

১. রিয়া কি?
২. আমলের ক্ষেত্রে নিয়্যাতের গুরুত্ব কি?
৩. রিয়ার ভয়াবহতার ব্যাপারে রাসুল (সঃ) আমাদেরকে কেমনভাবে সতর্ক করেছন?
৪. রিয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো কি কি?
৫. রিয়ার কারণ কি?
৬. রিয়ার ধরনগুলো কি কি?
৭. রিয়া থেকে বাঁচার উপায় কি?

আরবাব, আলিহা, আনদাদ পৃঃ ৮৯-৯৩

১. আরবাব কি?
২. আলিহা কি?
৩. আনদাদ কি?

প্রচলিত কতিপয় শিরক্ পৃঃ ৯৩-১১৬

১. গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাংসদদেরকে মানা, নির্বাচনে ভোট দেয়া শিরক কেন?
২. যাদুবিদ্যা শিরক এবং কুফরীর অন্তর্ভূক্ত কিভাবে?
৩. তাবিজ-কবজ ব্যবহার শিরকের অন্তর্ভূক্ত কিভাবে?
৪. বালা মুসীবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, তাগা [সূতা] ইত্যাদি পরিধান করা শিরক তার প্রমান কি?
৫. শূভ অশুভ সংকেত গ্রহন শিরক কিভাবে?
৬. 'আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন' বলা শিরক কিভাবে?
৭. বাক্যের মধ্যে 'যদি' ব্যবহার শিরকের দরজা খুলে দেয় কিভাবে?
৮. মিলাদে কি ধরনের শিরক প্রচলিত?
৯. পীর-দরবেশ, ওলী-আউলিয়া এবং কবরে শায়িতদের নিকট দোয়া করা শিরক্ এ বিষয়টির প্রমান কি?
১০. কবর-মাযার-দযগায় দান বা ভোগ দেয়া শিরক্ তার প্রমান কি?
১১. মাযারে, ওরসে পীর-ফকিরদের উদ্দেশ্যে যবেহ করা, দান করা শিরক তার প্রমান কি?
১২. গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক তার প্রমান কি?
১৩. নেককার ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমা লংঘন গাইরুল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায় প্রমান কি?
১৪. বরকত হাসিলের জন্য গাছের নিকট ভোগ দেয়া শিরক্ এর প্রমান কি?
১৫. আল্লাহ ব্যতীত বাপ-দাদা, মাতা, পীর-দরবেশ কিংবা অন্যকিছুর নামে কসম করা শিরক্ এর প্রমান কি?
১৬. নাবী (সাঃ) কে আল্লাহর নূরের তৈরী মনে করা শিরক্ কেন? তিনি যে মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন তার প্রমান কি?
১৭. ওয়াসীলার নিষিদ্ধ এবং শিরকী দিকগুলো কি কি?
১৮. তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার অর্থ তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করা, এটি শিরক এবং কুফরী এর প্রমান কি?
১৯. নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন আমাল করা শিরক তার প্রমান কি?
২০. "আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান" এ ধারনাটি বাতিল এবং শিরক্ বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন?
২১. ভাগ্য গননা শিরক্ কিভাবে?
২২. রাশিচক্র সম্বন্ধে ইসলামের রায় কি?

গনতন্ত্রঃ একটি বাতিল দ্বীন
এবং এ ব্যাপারে সংশয় সমূহের জবাব পৃঃ ১১৬-১৩৪

১. গনতন্ত্রের অর্থ এবং সংজ্ঞা কি?
২. গনতন্ত্র শিরকী এবং কুফরী দিকসমূহ কি ?
৩. গনতন্ত্র ইসলামিক শূরার মত এই যুক্তিতে যারা এতে অংশগ্রহণ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?

৪. মিশরের তৎকালীন রাজসভায় একজন মন্ত্রী হিসেবে ইফসুফ (আঃ) এর যোগদানকে যারা অপব্যাখ্যা করে গনতন্ত্রে যোগদানের দলীল হিসেবে গ্রহণ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?
৫. দুই প্রকারের খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপের পক্ষ অবলম্বন করার নীতিতে যারা গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের দলীল গ্রহণ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?
৬. ‘‘ক্ষতি অবজ্ঞা করে সুবিধা গ্রহণ করা’’ এই নীতি গনতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ভূল কিভাবে?
৭. “আমলসমূহ সর্বোপরী নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল” এই ভিত্তিতে যারা বলে আমরা ভাল নিয়্যাতে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ করি তাদের এ কথা বাতিল কিভাবে?
৮. ‘‘ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করার’’ নামে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ বাতিল কিভাবে?
৯. ‘‘নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণ করার অনুমতি’’ এই যুক্তিতে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ ভ্রান্ত কিভাবে?
১০. “জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফরী ক্ষমার যোগ্য” মানুষ কিভাবে এর অপপ্রয়োগ করে গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের ব্যাপারে?
১১. গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে রায় কি? অজ্ঞতার ভিত্তিতে ভাল নিয়্যাতে যে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে তাকফীর করার পূর্বে করনীয় কি?
১২. ইসলাম ও গনতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্যগুলো কি কি?

মিল্লাতে ইবরাহীম পৃঃ ১৩৪-১৫৯

১. মিল্লাতে ইবরাহীম কি? মিল্লাতে ইবিরাহীমের মূলকথা কি?
২. যারা বলে, “আমাদের পথ ও মিল্লাত হলো মুহাম্মাদ (সঃ) এর পথ। আর ইব্রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত বা শরীয়া তো এর পূর্বের শরীয়া। আর যারা পূর্বে এসেছে তাদের শরীয়া তো আমাদের জন্য নয়।” তাদের এ অভিযোগকে কিভাবে খন্ডন করা হবে?
৩. যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে শত্রুতা, ঘৃণা করল না এবং তাদের থেকে দূরে থাকল না, তাদের সাথে বন্ধুত্ব পরিহার করল না তার ইসলাম ঠিক থাকবে কি?
৪. মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরনে দ্বীন প্রকাশের স্বরূপ কি? এর হুকুম কি আমাদের প্রতি?
৫. নাবী মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাহাবারা মক্কায় দূর্বল অবস্থাতেও মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরন করেছেন এর দৃষ্টান্ত কি?
৬. ত্বাগুতদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে দাওয়াতী কাজে হিকমাত বা নম্রতার নামে কালক্ষেপন জায়েজ কি?
৭. মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষনা দেয়ার পূর্বে আমরা কি করব? ঐ অবস্থায় তাদের প্রতি ভালবাসা রাখা জায়েজ কি?
৮. মুসা (আ) কিভাবে ফিরাউন ও তার গোত্রকে দাওয়াহ দিয়েছিলেন?
৯. কোন পর্যায়ে মুশরিকদের সাথে এমনকি যদিও তারা আত্মীয় হয় তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষনা দেয়া হবে?
১০. আবু তালিবের শ্রেণীর মুশরিকদের সাথে কিরূপ আচরন হবে? এই শ্রেণীর মুশরিকদের কাছে কি নিজে থেকে সাহায্য চাওয়া যাবে?
১১. মিল্লাতে ইবরাহীমের পথে কি ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়?

১২. আল্লাহর রীতি মুতাবিক কারা এই যমীনে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষিত হন?
১৩. এই পথের অনুসরন যদিও অনেক কঠিন কিন্তু এর শেষ ফলাফল কি?
১৪. মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরনে সবচেয়ে উত্তম ঈমানদারের দৃষ্টান্ত কি? সে কিভাবে বাতিলের সাথে মোকাবিলা করবে?
১৫. এ পথে কম প্রভাবশালী ঈমানদার কি করবে, যে দূর্বলতার কারনে মুশরিকদের সাথে শত্রুতার প্রকাশ করতে পারছে না?
১৬. পরিবার-পরিজনের দ্বীন ঠিক রাখার কাজ যাকে আটকে রেখেছে আবার সে দ্বীনের ও প্রকাশ করতে পারছে না ঐ স্থানে, ঐ কমপ্রভাবশালী ঈমানদারের করনীয় কি তার দ্বীনকে ঠিক রাখার জন্য?
১৭. মিল্লাতে ইববরাহীম এবং সিক্রেসী গ্রহণ এই দু'য়ের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা? প্রকৃতপক্ষে গোপনীয়তা কোথায় প্রযোজ্য?
১৮. যে সমস্ত মূর্খরা বলেঃ "নিশ্চয় মিল্লাতে ইবরাহীমের এ পথ দাওয়াতকে ধ্বংস করে ও দ্রুত করুণ পরিণতি ডেকে আনে।" তাদের এ কথার জবাব কি?
১৯. যে ব্যক্তি সতর্কতার নামে গোপনে বিরোধিতা সত্বেও প্রকাশ্যে কাফেরদের সমর্থন করে ইসলামে তার অবস্থান কোথায়?
২০. বিল ইক্বরাহ বা জবরদস্তি পরিস্থিতি কি যে অবস্থায় অন্তর ঠিক রেখে বাহ্যিক কুফরী কথা বলার রুখসাত রয়েছে? কোন কোন শর্ত পূরন না করলে বিল ইক্বরাহ বলে ঐ পরিস্থিতিকে গন্য করা হবে না?
২১. জবরদস্তি পরিস্থিতিতেও কোন ভূমিকা নেয়া উত্তম? জবরদস্তি পরিস্থিতিতেও যারা নতি স্বীকার করেন নি এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত বর্ননা করুন?
২২. হাতিব ইবনে বালতাআ' (রা) এর মক্কায় কাফিরদের চিঠি লিখে সতর্ক করা কি কারনে কুফরী বলে গন্য হয় নি? আমাদের সময়ে এরূপ কাজ কেউ করলে তার সাথে আমাদের কি আচরন হবে?
২৩. মিল্লাতে ইবরাহীমের পথ থেকে দায়ীদের কে সরিয়ে নিতে ত্বাগুত কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়?

আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ পৃঃ ১৫৯-১৭০

১. আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ কি?
২. আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় অংশ তার প্রমান কি?
৩. আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ বারা'য় বিশ্বাসের মর্যাদা কি?
৪. 'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ'র দাবী সমূহ কি কি?

কাফেরদের শত্রুতার ধরন পৃঃ ১৭০-১৭৫

১. কাফিরদের শত্রুতার ধরন কি কি বিস্তারিত জানতে চাই?

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের বিধান পৃঃ ১৭৫-১৯৭

১. কফিরদের সাথে ভয়ের ওজর দেখিয়ে বন্ধুত্বের ব্যাপারে বিধান কি?
২. মুক্বরাহ কে?

৩. ভয়ে বা দুনিয়ার স্বার্থে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে দালীল প্রমান কি?
৪. বিল ইক্বরার পরিস্থিতিতেও অন্য মুসলিমের ক্ষতি করা জায়েয কিনা?
৫. মুওয়ালাত এবং তাওয়াল্লী কি?
৬. মুওয়ালাত এবং তাওয়াল্লী এর মধ্যে পার্থক্য কি? এই দু'টি জিনিসকে কিভাবে আলাদা করা হবে?
৭. কাফেরদের সাথে মুয়ামেলাত বা আচার-ব্যবহার কয় প্রকার?
৮. কাফেরদের সাথে ব্যবসা ও ভ্রমন করার ব্যাপারে বিধান কি?
৯. তাগুতের ইবাদতকারী কাফির-মুশরিকদের সাথে আমাদের আচরণনীতি কি?
১০. কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন প্রমাণ করে এমন নিদর্শনগুলো কি কি, যা থেকে অবশ্যই দূরে থাকা কর্তব্য?

কাফেরদের অনুকরণ পৃ: ১৯৭-২০২

১. কতক্ষন একজন ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলতে পারে না?
২. কাফেরদের অনুকরন এর ব্যাপারে আমাদের প্রতি কিরূপ সতর্কতা রয়েছে?
৩. কাফেরদের অনুকরনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মুসলিমদের বাস্তব অবস্থা কি আজকাল?
৪. কাফেরদের অনুকরন কয় প্রকার এবং কি কি?

দ্বীন ধ্বংসকারী বিষয় সমূহ পৃ: ২০২-২০৮

১. দ্বীন ধ্বংসকারী বিষয় বলতে কি বোঝায়?
২. দ্বীন বিধ্বংসী বিষয়গুলো কি কি?

তাওহীদের সংশয় নিরসন পৃ: ২০৮-২১৩

১. যারা বলে لا إله إلا الله মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট, বাস্তবে তার বিপরীত কিছু করলে ক্ষতি নেই - তাদের এ সংশয়ের জবাব কি?
২. 'যে ব্যক্তি দ্বীনের কতিপয় ফরয ওয়াজেব পালন করে, সে তাওহীদ বিরোধী কোন কাজ করে ফেললেও কাফের হয়ে যায় না' যারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাদের ভ্রান্তির জবাব কি?

কুফর দুনা কুফর পৃ: ২১৩-২১৮

১. কুফর দুনা কুফর কি?
২. কুফর-দুনা কুফর এর ব্যাপারে ইবনে আব্বাস থেকে বর্নিত আছরগুলোর সানাদ কি? প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে তাঁর থেকে বর্নিত সাহীহ বর্ননা কি?

আরকানুল ঈমান

১ম রুকনঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান পৃঃ ২১৮-২২৯

১. ঈমানের প্রথম রুক্ন বা স্তম্ভঃ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে কি বোঝায়? আল্লাহর প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?
২. মানুষ আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা নিরুপনে অক্ষম বিষয়টির প্রমান কি?
৩. আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীর মধ্যে পার্থক্য কি?
৪. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ বর্ননা করুণ?
৫. আল্লাহ কোথায়?
৬. কুরআন-সুন্নাহতে যে এসেছে 'আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' তার মানে কি?
৭. আল্লাহর ইসতিওয়া বা আরশে সমাসীন হওয়া গুনের প্রতি আমরা কিভাবে ঈমান আনব?
৮. আল্লাহ নিরাকার নন এই বিষয়টির প্রমান কি?

২য় রুকনঃ ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান পৃঃ ২২৯-২৩৩

১. ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনার বিধান কি?
২. সংক্ষিপ্ত ভাবে ফিরিশতাদের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?
৩. ফিরিশতাগন কিসের তৈরী?
৪. ফিরিশতাদের সংখ্যা কত?
৫. বিশেষ কিছু ফিরিশতার নাম উল্লেখ করুন?
৬. ফিরিশতাদের সিফাত বা গুন বৈশিষ্ট্য কি কি?
৭. ফিরিশতাদের কর্মসমূহ কি কি?
৮. আমাদের প্রতি ফিরিশতাদের কি অধিকার রয়েছে?
৯. ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান আনার সুফল কি?

৩য় রুকনঃ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান পৃঃ ২৩৩-২৩৮

১. কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার বিধান কি?
২. কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার মূল কথা কি?
৩. এসব কিতাবের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা এবং তা অবতীর্ণ করার পিছনে হিক্মাত বা রহস্য কি?
৪. কিতাব সমূহের প্রতি কিভাবে ঈমান আনয়ন করতে হবে?
৫. আল কুরআনের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?
৬. পূর্ববর্তী কিতাব সমূহ থেকে কিভাবে সংবাদ গ্রহণ করতে হবে?
৭. কুরআন ও হাদীসে যে সকল আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ হয়েছে তা কি কি?

৪র্থ রুকনঃ রাসুলগনের প্রতি ঈমান পৃঃ ২৩৮-২৫৪

১. রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার বিধান কি?
২. নাবী-রাসুলদের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?
৩. নবুওয়াতের হাকীকাত কি?

৪. নাবী-রাসূলদের কেন পাঠানো হয়েছে?
৫. রাসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) দায়িত্ব সমূহ কি কি?
৬. ইসলাম সকল নাবীদের দ্বীন ছিল তার প্রমান কি?
৭. রাসূলগণ মানুষ তাঁরা "গাঈব" জানেন না তার প্রমান কি?
৮. রাসূলগণ মা'সূম বা নিস্পাপ ছিলেন তার প্রমান কি?
৯. নাবী ও রাসূলগণের সংখ্যা কত এবং তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারা?
১০. নাবীদের (আলাইহিমুস্ সালাম) মু'জিযাহ্ কি?
১১. নাবী মুহাম্মাদ (সা:) এর নবুওয়াতের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?
১২. আমাদের নবী (সাঃ) কি মানুষ ছিলেন?
১৩. আমাদের নবী (সাঃ) কিসের তৈরী ছিলেন? নূরের না মাটির তৈরী?
১৪. আমাদের রাসুল (সাঃ) কি আলেমূল গায়েব ছিলেন?
১৫. আমাদের রাসূল (সাঃ) কি সব জায়গায় হাজির নাজির? আমাদের দেশে অনেকেই এই আক্বীদা পোষণ করতঃ মীলাদের এক পর্যায়ে নবী (সাঃ) এর সম্মানার্থে দাড়িয়ে যায়। বিষয়টি কতটুকু সহীহ?

৫ম রুকনঃ আখিরাতের প্রতি ঈমান পৃঃ ২৫৪-২৬৬

১. শেষ দিবসের প্রতি ঈমান বলতে কি বোঝায়?
২. কিয়ামতের আলামত কয় প্রকার? আলামতগুলো কি কি?
৩. কিয়ামত দ্বারা কি বুঝায়?
৪. ফিৎনাতুল কবর বা কবরের পরিক্ষা, শান্তি বা শাস্তি কি?
৫. শিঙ্গায় ফুৎকার কি?
৬. পুনরুত্থান কি?
৭. হাশর, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও প্রতিফল কি?
৮. হাউজে কাউসার কি?
৯. শাফায়াত কি? শাফায়াতের শর্ত কি?
১০. মিযান বা মানদন্ড কি?
১১. আস্ সিরাত বা পুল সিরাত কি?
১২. আল-কানত্বারাহ্ কি?
১৩. জান্নাত ও জাহান্নাম এর ব্যাপারে আমাদের ঈমান কি?
১৪. শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার সুফল কি?

৬ষ্ঠ রুকনঃ তাকদীরের প্রতি ঈমান পৃঃ ২৬৬-২৭৮

১. কদরের (ভাগ্যের) সংজ্ঞা ও তার প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব কি?
২. ভাগ্যের স্তর কয়টি ও কি কি?
৩. ভাগ্যের প্রকারভেদ কি কি?
৪. ভাগ্যের ব্যাপারে সালাফদের আকিদাহ বা বিশ্বাস কি?
৫. কাজ কয় প্রকার? বান্দাদের কর্ম সমূহ কি?
৬. আল্লাহর সৃষ্টি ও বান্দার কর্মের মাঝে সমঝতা কি?

৭. ভাগ্যের ব্যাপারে বান্দার করণীয় কি?
৮. ভাগ্য ও ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য কেন?
৯. হিদায়াত কয় প্রকার?
১০. কুরআনে বর্ণিত (আল্লাহর) ইরাদা কয় প্রকার ও কি কি?
১১. ভাগ্যের সাথে আসবাব এর প্রভাব কি এবং ভাগ্যের রহস্য কি?
১২. ভাগ্যের দ্বারা দলীল দেওয়ার মাস'আলা কি?
১৩. আসবাব বা (মাধ্যম সমূহ) গ্রহণ করার ব্যাপারটি কিরূপ?
১৪. ভাগ্যকে অস্বীকার কারীর বিধান কি?
১৫. ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনার ফলাফল কি?

কুফর ও তার প্রকারভেদ পৃঃ ২৭৮-২৮১

১. কুফর কি?
২. কুফর কয় ধরনের ও কি কি?
৩. বড় কুফর কয় প্রকার ও কি কি?
৪. ছোট কুফর কি?

তাকফীর পৃঃ ২৮১-২৯২

১. তাকফীর কি?
২. তাকফীরের ব্যাপারে আমাদের মূলনীতি কি?
৩. তাকফীর কিসের উপর ভিত্তি করে করা হয়?
৪. বড় কুফরী এবং ছোট কুফরী কিভাবে সাব্যস্ত করতে হবে?
৫. তাকফীরের শর্তগুলো কি কি?
৬. তাকফীরের জন্য তিন প্রকারের শর্তাবলী কি কি?
৭. কি কি কারণ তাকফীর থেকে বাধা দেয় বা নিবারন করে?
৮. কুফরীর ক্ষেত্রে ইচ্ছা শর্ত কিনা? মানুষ ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও কুফরীতে লিপ্ত হয়ে ইসলাম থেকে কিভাবে বের হয়ে যায়?
৯. যারা কুফরী সরকারী সিষ্টেমে কাজ করে তারা সবাই কি কুফরীর মধ্যে আছে?
১০. মুরতাদ কাকে বলে? মুরতাদের হুকুম কি?

নিফাক্ব ও মুনাফিক্ব পৃঃ ২৯২-২৯৬

১. নিফাক্ব ও মুনাফিক্ব বলতে কি বোঝায়
২. নিফাক্বের কারণ এবং ধরনসমূহ কি কি?
৩. নিফাক্বের প্রকারভেদগুলো কি কি?
৪. মুনাফিক বনাম গুনাহগার এর পার্থক্য কি?

আরকানুল ইসলাম

১ম রুকনঃ শাহাদাতাইন পৃঃ ২৯৬-৩০৩

১. শাহাদাতাইন কাকে বলে?

২. ইসলামে শাহাদাতাইনের অবস্থান কি?
৩. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ কথার স্বাক্ষ্যদানের অর্থ কি?
৪. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর স্বাক্ষ্য দানের দাবী কি?
৫. 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এ কথার স্বাক্ষ্যদানের অর্থ কি?
৬. 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এ কথার স্বাক্ষ্যদান কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে?

দ্বিতীয় রুক্নঃ আস্-সালাত (নামায) পৃঃ ৩০৩-৩০৭

১. সালাত কাকে বলে? কয় ওয়াক্ত সালাত ফরয?
২. সালাত ফরযের দালীল কি?
৩. কাদের উপর সলাত ফরয?
৪. সালাত ত্যাগ কারীর বিধান কি?
৫. সালাতের শর্ত সমূহ কি কি?
৬. সালাতের সময় কি কি?
৭. সালাতের নিষিদ্ধ সময় সমূহ কখন?
৮. ফরয নামাযের রাকা'আতের সংখ্যা কত ও কি কি?
৯. জামা'আতে সলাত আদায় করার বিধান কি?
১০. বিদ'আতী ইমাম হলে তার পিছনে সালাত পড়ার ব্যাপারে বিধান কি?

তৃতীয় রুক্নঃ যাকাত পৃঃ ৩০৭-৩১৪

১. যাকাতের সংজ্ঞা কি?
২. ইসলামে যাকাতের স্থান কি?
৩. যাকাতের বিধান কি?
৪. যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি?
৫. যাকাত ওয়াজিব যোগ্য সম্পদ কি কি? তার নিসাব ও যাকাতের পরিমান ইত্যাদি বর্ণনা করুন?
৬. যাকাত বন্টনের খাত সমূহ কি কি?
৭. যাকাতুল ফিত্বর এর ব্যাপারে আলাচনা করুন?

চতুর্থ রুক্নঃ রামাযানের সিয়াম সাধনা পৃঃ ৩১৪-৩১৬

১. সিয়ামের সংজ্ঞা কি?
২. রামাযান মাসের সিয়াম সাধনের বিধান কি?
৩. সিয়াম ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ কি কি?
৪. সিয়াম সাধনের আদাব সমূহ কি কি?
৫. সিয়াম বিনষ্ট কারী বিষয় সমূহ কি কি?
৬. সিয়ামের সাধারণ বিধান সমূহ কি কি?

পঞ্চম রুক্নঃ হাজ্জ পৃঃ ৩১৬-৩১৮

১. হাজ্জের সংজ্ঞা কি?
২. হাজ্জের হুকুম কি?

৩. হাজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ কি কি?
৪. হাজ্জের আর্‌কান বা রুক্‌ন সমূহ কি কি?
৫. হাজ্জের ওয়াজিব সমূহ কি কি?

সুন্নাত ও বিদআত পৃ: ৩১৮-৩২৬

১. সুন্নাত কি?
২. বিদআত কি?
৩. দ্বীনের ভিতর বেদআতে হাসানাহ বলে কিছু আছে কি ?
৪. বিদ্‌আ'ত থেকে সতর্ক থাকার অপরিহার্যতা কি?
৫. বিদয়াত সনাক্ত করার উপায় কি?
৬. প্রচলিত কিছু বিদআতের উদাহরন কি কি?
৭. সংশয় নিরসন।

কবিরা গুনাহ পৃ: ৩২৬-৩২৯

১. কবিরাহ গুনাহ কাকে বলে?
২. কবিরাহ গুনাহগুলো কি কি?
৩. কবিরাহ গুনাহ থেকে কিভাবে পরিত্রান লাভ করা যায়? কবিরাহ গুনাহ মুক্ত জীবনের সুফল কি?

ইসলামী আক্বীদার কতিপয় গুরুত্বপূর্ন দিক পৃ: ৩২৯-৩৪০

১. আক্বীদাহ কি?
২. সালফে সালেহীন কাকে বলে?
৩. আহ্‌লুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত কারা? আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়ার পরিচয় এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
৪. তাইফাহ আল মানসুরাহ কারা ? তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি?
৫. মুসলিম হিসেবে আমাদের আক্বীদাহ কি?

বাতিল ফিরকাসমূহ পৃ: ৩৪০-৩৪৬

১. শীয়া সম্প্রদায় এবং উহাদের মূল উৎসের স্বরূপ কি?
২. খারেজী কারা, এই সম্প্রদায়ের স্বরূপ কি?
৩. মুর্জিয়া কারা, এই সম্প্রদায়ের স্বরূপ কি? জাহমিয়াদের সাথে এদের মিল কোন দিক থেকে?
৪. মুতাযিলা কারা, এই সম্প্রদায়ের স্বরূপ কি?

ইসলাম আমাদের জাতীয়তা! পৃ: ৩৪৬-৩৬০

১. আমাদের পরিচয় এবং জাতীয়তা কি?
২. শত্রু এবং মিত্রতার মানদণ্ড কি?
৩. একজন থেকে আরেকজন কিসের ভিত্তিতে উত্তম হতে পারে জাতীয়তা নাকি অন্য কিছু?
৪. মুসলিম জাতীয়তার বিপরীত কিরূপ কুফরী চিত্র দুনিয়ায় দেখা যাচ্ছে?

৫. জাতীয়তাবাদের ধারণাকে মুসলিমদের মধ্যে প্রবেশ করানোর জন্য কাফেররা কিরূপ তৎপর? জাতীয়তাবাদের কুফলগুলো কি কি?
৬. দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর/ দারুল হারব কি?
৭. দারুল কুফর থেকে হিজরতের হুকুম কি?
৮. যে হিজরত করতে পারবে না তার করনীয় কি?

দ্বীনের শীর্ষচুড়া পৃ: ৩৬০-৩৬৫

১. দ্বীনের শীর্ষ চুড়া কি? এর হুকুম কি?
২. ঈমান আনার পর সর্ব প্রথম ফারদ কি?
৩. অন্তরে তাওহীদের ভিত্তি মজবুত হওয়ার জন্য করনীয় কি? তাওহীদ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে?
৪. শাসক যদি কুফরী করে এবং এতে অনড় থাকে, তার বিরুদ্ধে কি করনীয় ঈমানদারদের?

যেসব কিতাব থেকে সংকলিত-

- ❖ আল-কুরআনুল কারীম।
- ❖ কুতুবুল আহাদীস।
- ❖ কুতুবুত্ তাফাসীর।
- ❖ আক্বীদাতুত তাহাবিয়্যাহ - ইমাম আবু জাফর তাহাবী রহ.
- ❖ আক্বীদাতুল ওয়াসেতিয়্যাহ- শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহ.
- ❖ কিতাবুত তাওহীদ- শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ.
- ❖ আদ্ দালাইল ফি মুওয়ালাত আহলি আল ইশরাক- ইমাম সুলাইমান ইবন্ আবদিল্লাহ রহ.
- ❖ মিল্লাতি ইবরাহীম- শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল মাক্বদিসী (হাফিযাহুল্লাহ)
- ❖ This is our Aqeedah- শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল মাক্বদিসী (হাফিযাহুল্লাহ)
- ❖ Statement of Ibn Abbas (RA)- শাইখ আলী আত্ তামিমি (হাফিযাহুল্লাহ)
- ❖ আত তিবয়ান ফি কুফরি মিন আ'নাল আমরিকা- শাইখ নাসির বিন হামাদ আল ফাহাদ (হাফি.)
- ❖ The Doubts Regarding the Ruling of Democracy In Islam –আত্ তিবয়ান পাবলিকেশন্স
- ❖ Democracy: A Religion- শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল মাক্বদিসী (হাফিযাহুল্লাহ)
- ❖ আরকানুল ঈমান ওয়াল ইসলাম- রিসার্স, মাদীনা ইউনিভার্সিটি
- ❖ সালাসাতুল উসুল ওয়া আদিল্লাতুহা- শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ.
- ❖ What Every Muslim Must Know- মুহাম্মদ বিন সুলায়মান আত তামিমী রহ.
- ❖ Ar Riyaa: The Hidden Shirk- আবু আম্মার ইয়াসার আল কাযী
- ❖ এছাড়াও আত্ তিবয়ান পাবলিকেশন্স এবং অন্যান্য অনেক কিতাব থেকে